প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

মুদ্রাকর
শ্রীসন্তোষকুমার ধর
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক ও মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রিট,
কলিকাতা

॥ ভূমিকা ॥

রম্যাঁ রলাঁর "আমি থামিব না" (*I Will Not Rest*) গ্রন্থ বাংলায় পরিচিত হয়েছে শিল্পীর নবজন্ম নামে। নামকরণ সার্থক। সংগীত-রসিক রলাঁ, কথাশিল্পী রলাঁ "বিশুদ্ধ" আর্টের রুদ্ধদ্বার মন্দির থেকে নেমে এসেছেন মাটিতে,—যে-মাটির সঙ্গে আকাশের বিরোধ নাই। "আমি থামিব না" গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে শিল্পী রলাঁর নবজন্মের স্বাক্ষর। রলাঁর আত্ম-পরিশুদ্ধি ও প্রসারণের কাহিনী কিন্তু তাঁর একলার কথা নয়, গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগের কাহিনী শিল্পী রলাঁর নবজন্ম। এই গ্রন্থে যে ঘটনাপ্রবাহের আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে এই শতাব্দীর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের যুগ সংকটের, সংশয়ের, সংগ্রামের যুগ। সেই রাজকীয় শান্তি ও সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের দিন আর নাই, যখন কি না শিল্পী, সাহিত্যিক, সুরকার ভাবতে পারতো, আমরা আছি সব কোলাহল ও কুশ্রীতার ঊর্ধ্বে, জগতের ভালোমন্দ ব্যাপারে নিরাসক্ত। শিল্পীর স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টিলোক আজ বিগতদিনের কাহিনী মাত্র। কবি এলিয়ট অবশ্য এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের যুগেও স্পেণ্ডরকে উপদেশ দিয়েছেন, যুদ্ধের কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও পারিপার্শ্বিকের কথা। নিজের মত আর্ট সৃষ্টি করে যাও। তবুও শিল্পীর গজদন্ত মিনারের চূড়াতে আজ আর নিরঙ্কুশ শান্তির আশ্বাস নাই। তাই অমন যে আর্টের স্বাতন্ত্র্যবাদী মনস্বিনী ভার্জিনিয়া উলফ, তাঁকেও শেষজীবনে মান্‌তে হ'ল, গজদন্ত মিনার বেঁকে পড়ছে (Leaning Tower), ভেঙে পড়ছে। সভ্যতার সংকটমুহূর্তে শিল্পীরও আর নির্লিপ্ত থাক্‌বার সুযোগ নাই। আমাদের দেশেও কি তার

আভাস পাচ্ছি না শিল্পী-গোষ্ঠীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে ? কংগ্রেস সাহিত্যিক, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক, সাম্যবাদী সাহিত্যিক— শিল্পীদের এই বিভিন্ন ভূমিকার মূলে একটিমাত্র সর্বজনসম্মত সত্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে শিল্পীরা সমাজসচেতন হচ্ছেন।

রলাঁর নবজন্ম সেই সত্যকেই প্রতিফলিত করেছে। আমার জন্যই আর্ট, আমার শিল্পলোক জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন, এই রকম বৈদান্তিক আর্টের গণ্ডী পেরিয়ে এসেছেন রলাঁ তাঁর "আমি থামিব না' গ্রন্থে। জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টা হিসাবেই রলাঁর প্রথম পরিচয়, কিন্তু ক্রিস্তফের জীবনদর্শনে এই "আমি" প্রবলভাবে উচ্চারিত ছিল, যদিও ক্রিস্তফও আদর্শের জন্য লড়াই করতে ভয় পায়নি। জাঁ ক্রিস্তফের কাহিনীতে সমাজমানসের উপরে, প্রতিদিনের জটিলতার উপর শিল্পীমনের অবজ্ঞার সীমা নাই। ক্রিস্তফ বারবার চেষ্টা করেছে নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে ; প্রতিভা ও পরিবেশের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ক্রিস্তফ আশ্রয় নিয়েছে কল্পনার শান্তিনিকেতনে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশে কোথায় যে গলদ তার সন্ধান নেবার মত ধৈর্য ও স্থির বুদ্ধি ক্রিস্তফের ছিল না।

রলাঁর প্রতিভা কিন্তু জাঁ ক্রিস্তফের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়নি। বড় প্রতিভার এইটাই বিস্ময়কর দিক যে কোনো বিশেষ সৃষ্টির মধ্যেই তা' সমাপ্ত নয়, প্রতিমুহূর্তেই তার চেষ্টা এগিয়ে চলা, নিজেকে অতিক্রম করা। রেনে আর্কো তাই লিখেছেন, রম্যাঁ রলাঁ সম্বন্ধে বলতে পারা যায় সেই কথা যা তিনি নিজে লিখেছেন গ্যেটে সম্বন্ধে—"একটা ছবির ফ্রেমে তাঁকে আটকে রাখবার চেষ্টা করা বৃথা। কেউ তা কখনো পারেনি।" জাঁ ক্রিস্তফ রলাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। ক্রিস্তফ লেখা শেষ হয়েছিল ১৯১২ সনে। শক্তিমান কথাশিল্পী হিসাবে রলাঁর খ্যাতি তখন সারা য়ুরোপে। তবুও রলাঁ ত কেবল শিল্পী হবেন না। তিনি যে হবেন

শিল্পী-যোদ্ধা। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে গত বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল পর্যন্ত রলাঁ হয়েছিলেন শিল্পী-যোদ্ধা। জঁা ক্রিস্তফ থেকে "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে," "বিমুগ্ধ আত্মায়" (*The Soul Enchanted*), "আমি থামিব না" গ্রন্থে, অসংখ্য পুস্তিকায় ও প্রবন্ধে রলাঁর শিল্প-প্রতিভার যে অপূর্ব বিবর্তন দেখা যায় তা' আমাদের যুগের আদর্শ-সংঘাতেরই কাহিনী। "বিমুগ্ধ আত্মায়" আনেৎ ও মার্ক এই আদর্শ-সংঘাতের মূল খুঁজে বার করেছে, ক্রিস্তফ যা পারেনি। আনেৎ ও মার্ক দেখেছে আমাদের আত্মিক দুর্গতির মূলে রয়েছে ধনতন্ত্রের বীভৎস লোলুপতা; তারা জেনেছে গণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি-জীবীর কল্পিত স্বাধীনতা কত অসহায়, দিশাহীন; শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী কী নির্লজ্জভাবেই না বাজারের পণ্যে পরিণত হচ্ছে। আনেৎ ও মার্কের চোখে তাই ভাবীসমাজের স্বপ্ন; নতুন জীবনাদর্শ সফল করবার দৃঢ় সংকল্প মনে। "আমি থামিব না" গ্রন্থের মূল সুরটিও এই।

সভ্যতার শেষ সংগ্রামে পিছিয়ে থাকলে চলবে না, শিল্পীকেও যোদ্ধার বেশে নেমে আসতে হবে গণ-সংগঠনের সাহায্যে।

"বিমুগ্ধ আত্মায়", "আমি থামিব না" গ্রন্থে, রলাঁপ্রতিভার যে পরিচয় পাই, শিল্পীর মানবতা-বোধের সেইটিই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কম্যুনের রক্তরঞ্জিত ফ্রান্সে রলাঁর জন্ম, ভলতেয়র-হুগোর তিনি মানসশিষ্য। রলাঁ ভুলতে পারেননি ভলতেয়রের বজ্রগর্ভ বিদ্রোহের বাণী।

"গোনা কয়েকটি দিনমাত্র আমাদের আয়ু। সেই দিনগুলি যেন আমরা নীচ দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় গুঁড়ি মেরে না কাটাই।" রলাঁ ভুলতে পারেননি হুগোর কথা।

"কেবলমাত্র নিজেরই জন্য জীবন যাপন, এই সুখভোগ করার অধিকার আমাদের নাই।" আর একজন শিল্পী যোদ্ধাও অমনিভাবে বলেছিলেন, বড় কবি যে হতে চায় তার জীবনকেও একটা মহৎ কবিতার

মত করে তুলতে হবে। মিণ্টনের এই উক্তি "আমি থামিব না" গ্রন্থের লেখক, ক্রিস্তফের স্রষ্টার জীবনে ব্যর্থ হয়নি। সংকটকে এড়িয়ে যাব না। সুন্দর স্বপ্নচারী আত্মসর্বস্বতাকে আত্মহত্যা বলে মনে করব, মানবতার মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে চলব—এই-ই আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীযোদ্ধার জীবনবেদ।

রলাঁর মৃত্যুর পরে লণ্ডনের এক বেতার বক্তৃতায় বসজ্ঞ সাহিত্যিক ই. এম. ফর্স্টার বলেছেন, পঁচিশ বছর পূর্বে রলাঁকে মনে হয়েছিল টলস্টয়ের সমকক্ষ, লোকে আশা করেছিল তিনি হবেন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। সে আশা পূর্ণ হয়নি। ফর্স্টারের মতে রলাঁর শেষজীবনে লোকে তাঁকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ফর্স্টার বনিয়াদী সাহিত্য-সমালোচক। সম্ভবত লোক বল্‌তে তিনি বনিয়াদী সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকেই বোঝাচ্ছেন। "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের আসরে রলাঁ বিস্মৃতপ্রায় হতে পারেন তার কারণও পাঠকেরা খুঁজে পাবেন "আমি থামিব না" গ্রন্থে। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে রলাঁর মতামত যেমন সুস্পষ্ট, তাঁর নিজের শিল্পী জীবনের অভিজ্ঞতাও তেমনি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী একদিকে রলাঁর সংগ্রামপ্রবণতা ও তাঁর সাম্যবাদে বিশ্বাস, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বনিয়াদী বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতারণা ও আত্মসমর্পণ প্রতিক্রিয়ার কাছে এই সবই "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের সদর দপ্তরে রলাঁর খ্যাতিকে মলিন করেছিল। আমাদের দেশেও তার জের চলেছে দেখতে পাই। ভারতবর্ষে রলাঁর প্রধান পরিচয় গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চরিতকার হিসাবে; রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ রূপেও রলাঁ কোনো কোনো ভারতীয় সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর কাছে সমাদর পেয়েছেন। এইই রলাঁ-প্রতিভার অবশ্য সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনেও রলাঁ অধ্যাত্ম-বিলাসের সন্ধান করেননি। রলাঁর "হিরো" হ'ল তাঁরাই যাঁরা মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, যাঁরা জনগণের

উপরওয়ালা নন, তাদের স্বাধিকার প্রচেষ্টার সহযাত্রী "হিরো" এবং "পিপল" (people) মানব-মুক্তির পথ-সন্ধানে এরাই হ'ল রলাঁর ধ্রুবতারা।

"আমি থামিব না" সেই মানব-মুক্তির পথ-সন্ধানীর ডায়েরী। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে রলাঁ বলেছেন, "আমাদের যুগ যেপথে চলেছে, তার উদ্যম, তার যন্ত্রণা, তার বিভ্রম, তার অন্ধতা, তার পুনরাবিষ্কৃত আলোক, আমার বিশ্বাস এর অনেক অংশ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।" ১৯১৯ সন থেকে পনের বৎসরের ভাব-দ্বন্দ্বের ইতিহাস রয়েছে এই গ্রন্থে। রলাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা এই পনের বৎসরের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে যে-সত্য আবিষ্কার করেছে তা ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। "আমি থামিব না" গ্রন্থ সভ্যতার যুগসন্ধিক্ষণে এই সত্যকেই পৃথিবীর মুক্তি-কামীদের সামনে তুলে ধরেছে; "কমিউনিজম হচ্ছে বর্তমান সামাজিক কর্মপন্থার একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী পার্টি, যা' কোনো রফা না করে ও কিছুই গোপন না করে পতাকা বহন করছে।" রলাঁ সাম্যবাদী। বুদ্ধির কাল্পনিক আভিজাত্যকে আশ্রয় করে তিনি গণমুক্তির সংগ্রামকে এড়িয়ে থাকাকে ঘৃণা করেছেন।

আমাদের দেশের রলাঁ-ভক্ত বুদ্ধিজীবী অনেকেরই এই কথাটি জানবার দরকার আছে। রলাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্যবাদী আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টাকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল এদেশে। আমাদেরই কোনো খ্যাতনামা সাহিত্যিক বলেছিলেন, "রলাঁ ছিলেন দলগত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে, যাঁরা স্বয়ং মহৎ এবং যাঁদের সকল মোহ অপগত হয়েছে।" এর উত্তর রলাঁ নিজেই দিয়ে গেছেন শিল্পীর নবজন্মে। রলাঁ বলেছেন, "সামাজিক, নৈতিক ও জাতিগত কুসংস্কারের বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ পুরানো ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী জগতকে ধ্বংস করে যাঁরা নতুন জগত সৃষ্টি করার চেষ্টায় আছেন তাদের সকল কর্মে, সকল আশায়, সকল দুঃখবেদনার

মধ্যে আমি আছি।" বনিয়াদী বুদ্ধিজীবীর ছদ্ম নিরপেক্ষতার ("দলগত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে") বিরুদ্ধেও রলাঁ বারবার বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। "বুদ্ধি-জীবিগণ সুবিধাভোগী শ্রেণী। শোষণকারীরা যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা তাদের দেয় তাতেই কৃতার্থ হয়ে তারা জনসাধারণের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।" রলাঁর "আমি থামিব না" কেবলমাত্র শিল্পীর নবজন্মের স্বাক্ষর নয়, কোটি কোটি নির্যাতিত জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রামে হাত মিলানোর জন্য বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর কাছে আবেদনও এইটি।

আমাদের দেশের বনিয়াদী সাহিত্যের সমাজপতিরা দাবী করেছেন, রলাঁ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-গান্ধী-বিবেকানন্দের চরিতকার, যুদ্ধ-বিরোধী এই মাত্র, আর কিছু নন। সাম্যবাদী নন, সোবিয়েৎ সমর্থক নন, শিল্পী সাহিত্যিকের উপর নবজীবনের দাবীতে বিশ্বাসী নন। কথাটি মিথ্যা অবশ্যই। রলাঁপ্রতিভার বিচিত্র বলিষ্ঠ পরিণতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশই রলাঁ রেখে যাননি। শিল্পীর নবজন্মে তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। "কার জন্য লিখি" প্রবন্ধে পাওয়া যাবে শিল্পীযোদ্ধার গণসংগ্রাম সমর্থনের আমরণ সংকল্প। ১৯১৪-১৯১৯ সনে যিনি ছিলেন "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" সেই রলাঁই হয়েছেন গণমুক্তির শেষযুদ্ধের নির্ভীক যোদ্ধা। মুসোলিনীর ফাশিস্টবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি রলাঁর সতর্কবাণী, বারবুসের সহযোগিতায় ফাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, জর্মানী ও স্পেনে শ্রেণীস্বার্থের পাশবিক প্রভুত্বের উচ্ছেদে রলাঁর দৃঢ়পণ, এই সবই রলাঁপ্রতিভার বিস্ময়কর পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই সবেরই মূল প্রেরণা হচ্ছে, "আমি থামিব না", আমরা থামিব না যতদিন না ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে দৃঢ়ভিত্তির উপরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-কথা মোটেই সত্য নয় যে "রলাঁর লেখা থেকে কোনো বিশেষ মতবাদের পোষকতা করার চেষ্টা আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্য-কিরণকে

বিকৃত করে আগুন ধরানোর সঙ্গে তুলনা করা চলে।" একটি বিশেষ মতবাদের পোষকতা রলাঁ করেছিলেন, এবং সেই মতবাদ হচ্ছে সাম্যবাদ, সাম্যবাদী কর্মাদর্শ। করেছিলেন বলেই ফর্স্টার কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, রলাঁকে লোকে প্রায় ভুলে গেছে অর্থাৎ "ভদ্র-লোকদের" আসরে রলাঁর জাতিচ্যুতি হয়েছে। রলাঁ বিশেষ মতবাদের সমর্থক শিল্পীযোদ্ধা যে। এই জন্যই "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের আসরে রলাঁ হয়ত বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের আত্মার সঙ্গে যিনি আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছেন আদর্শে ও কর্মে, এ যুগের সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী-যোদ্ধাকে আমরা ভুলিনি। গণসংগ্রামের যোদ্ধারাও ভুলতে পারেনি।

আমাদের সাহিত্যিক-সমাজপতিরা বলেছেন, রলাঁর "জীবনের দর্শন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে তাঁর "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" ও "মনের স্বাধীনত" ঘোষণাটির মধ্যে। এঁরা ইচ্ছা করেই "আমি থামিব না" গ্রন্থে শিল্পী রলাঁর নবজন্মের নিদর্শন এড়িয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আসরে আজ প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ প্রবল, সমারোহেরও অভাব নাই। আমাদের অতিসাবধানী বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। সেইজন্যই হয়ত "আমি থামিব না" গ্রন্থে রলাঁর সাম্যবাদী, ফাশিস্ট-বিরোধী ও সোবিয়েৎ সমর্থকের ভূমিকা এঁদের মনোমত নয়। তা' হলে অবশ্য এঁদের মুখে রলাঁর "মনের স্বাধীনতা" ঘোষণাটির প্রশংসও বেমানান। কারণ রলার আদর্শ যে-মনের স্বাধীনতা তার মধ্যে জাতি-গৌরব বা কায়েমী স্বার্থের গোপন দাসত্বের স্থান নাই। এঁদের মত বনিয়াদী বুদ্ধি-জীবীদের লক্ষ্য করেই রলাঁ বলেছেন, এঁরা "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" গ্রন্থের শিরোনামা ছাড়া আর কিছু পড়েননি। আর এঁরা স্বীকারই করেন না যে "গত ১৫ বৎসর আমি যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি।"

এই সংগ্রাম ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম সাম্যবাদী কর্মাদর্শের স্বপক্ষে, গণমুক্তির সংগ্রাম। ১৯৩৩ সনে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত সাম্যবাদীদের কাছে রলাঁ যে বাণী পাঠিয়েছিলেন সে-ও এই সংগ্রামের সমর্থনে। এই সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ১৯২৭ সনে রলাঁ ঘোষণা করেছিলেন :

য়ুরোপের সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে রাশিয়া আজ বিপন্ন এবং সে যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শিকলে বাঁধা পড়বে না—কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত সবরকমের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জগত কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে।……রুশবিপ্লবের মতো এত শক্তিশালী ও এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমান য়ুরোপে আর হয়নি। আসুন এর সাহায্যে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই।”

রলাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। তার পরিচয় আমরা পেয়েছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। আজকের দিনেও তবু এই আবেদনের মূল্য কম নয়। ফাশিজম্-এর দৃঢ় দুর্গগুলি ভেঙ্গে পড়েছে বটে ; রলাঁ যে ফাশিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করেছিলেন জনগণের সহায়তায় তা' সার্থক হয়েছে। এই যুদ্ধে সাম্যবাদী সোবিয়েতের দুর্জয় প্রতিরোধক্ষমতা প্রমাণ করেছে রলাঁর জাগ্রত গণশক্তিতে বিশ্বাস। তবু এখনও শিল্পী-যোদ্ধাদের, মুক্তিকামী জনগণের বিশ্রামের অবকাশ নেই। রলাঁর “আমি থামিব না” মন্ত্র আজও জীবন্ত ; কারণ ফাশিজম্-এর মূল এখনও ছড়িয়ে রয়েছে নানা শাখাপ্রশাখায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দেশে দেশে চলছে প্রতি-বিপ্লবীশক্তির গোপন ষড়যন্ত্র। সোবিয়েতের সাফল্য এবং সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের বিপ্লবী জাগরণ কায়েমী-স্বার্থবাদীদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এরা থেমে নেই ; এরা ছড়িয়ে দিচ্ছে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা, গণ-

আন্দোলনকে আঘাত করতে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে বামে। দক্ষিণ-পন্থী চার্চিল-কৃপালনি-পট্টভীরা চীৎকার শুরু করেছেন, শান্তি যায় যায়, সভ্যতা রসাতলে গেল সোবিয়েৎ এবং সাম্যবাদের ধাক্কায়। বামপন্থী কোয়েজ্‌লার-মাসানি—এঁরা প্রগতির মুখোশ পরে প্রচার করছেন সাম্যবাদ ভাল হলেও হতে পারে বটে, কিন্তু সাম্যবাদীরা ভাল নয়, সোবিয়েতের সাম্যবাদী প্রচেষ্টা ভাল নয়। দুনিয়া জোড়া প্রতিক্রিয়াচক্রের এই হ'ল বাম ও দক্ষিণ শ্রমবিভাগ, দক্ষিণী দমননীতি ও কুৎসা আর বামপন্থী বুদ্ধিবিকার ও কপটাচার। দুয়েরই লক্ষ্য এক —গণমুক্তির গতিরোধে প্রতি-বিপ্লবী ইউনাইটেড ফ্রন্ট। সেই জন্যই শিল্পীর নবজন্মের কাহিনীতে আজও ফিরে যেতে হয় বার বার। কী উদার মানবতাবোধ, কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে রলাঁ এই সব পোশাকী বাম ও পেশাদার দক্ষিণের ষড়যন্ত্র ও ছলাকলার মোহ মুক্ত হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন সোবিয়েৎ এবং সাম্যবাদের সমর্থনে। কুণ্ঠাহীন আত্মসমালোচনার সুরে রলাঁ বলেছেন ঃ

"আজ আমাদের চোখের আচ্ছাদন খুলে গিয়েছে। যে স্বাধীন শক্তিগুলির মুক্তির জন্য আমরা অন্ধের মত এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছি, এক সমাজতান্ত্রিক সমাজে আজ তার সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ শুরু হয়েছে।" "যে অহংকার নিজেকে চেনে, চেনে না নিজের দীনতাকে, সেই অহংকার বুর্জোয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে।···লেখক হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই অস্পষ্টতার অবসান ঘটানো ; মার্কসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে "অবাস্তব মনুষ্যত্ব" থেকে মানুষকে মুক্ত করে আনা, মানবতার সঙ্গে সাম্যবাদের স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মিলন ঘটানো।"

এই কর্তব্যের দাবীতেই রলাঁর "আমি থামিব না" অঙ্গীকার, শিল্পীর নবজন্মের সূচনা এইখানে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের ইঙ্গিত জাঁ ক্রিস্তফকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল ; সে পালিয়েছিল "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে।"

ক্রিস্তফের স্রষ্টা শিল্পীযোদ্ধা রলাঁ কিন্তু থামেননি, এগিয়ে চলেছেন। তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত কবির বাণীই সত্য হয়েছে।

"ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে।
আলোক যেথা নিভিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে।"
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে।

বুদ্ধিজীবীর কৌলীন্য তিনি বিসর্জন দিয়েছেন সভ্যতার সঙ্কট মুহূর্তে। এউজেন রেলজিসের চিঠিতে তাই রলাঁ ঘোষণা করেছেন, "যে সংগ্রাম আজ নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করছে তাব মহান যোদ্ধা হওয়ার চাইতে বুদ্ধিজীবীর আর বড় কোনো কাজ নাই।" বারবুসের সঙ্গে তিনিই প্রথম আবেদন করেছেন "বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংযুক্ত ফ্রন্ট" গঠনের জন্য।

১৯১৯ সনের "মনের স্বাধীনতা" ঘোষণাটি থেকে ১৯৩৩এর "কার জন্য লিখি" পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রবন্ধ সমষ্টির মধ্যে পাঠকেরা সহজেই একটা সাধারণ ঐক্যের সন্ধান পাবেন। এই ঐক্যের মূলে আছে রলাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অকুণ্ঠ উদারতা, তাঁর আদর্শের সর্বজনীনতা। রলাঁ কোনো দেশ-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের উন্নতি-অবনতির সমস্যা-নিয়ে ব্যস্ত হননি। সারা পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল। এই জন্যই তাঁর "মনের স্বাধীনতা" ঘোষণাটি সকল-দেশের মানবতাবাদী শিল্পীসাহিত্যিকদের সমর্থন পেয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দকুমারস্বামী এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। ফাশিজমের বিরুদ্ধে রলাঁর আমরণ যুদ্ধ সংকল্পও একই কারণে সারা পৃথিবীর প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন পেয়েছিল। এক কথায় রলাঁ সকলদেশের তাঁর সমগোত্রীয় বুদ্ধিজীবীদের বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দুর্গতি। আর

তারই সঙ্গে এনেছেন সাম্যবাদী সমাজে মানব-মুক্তির আশ্বাস। শিল্পীর নবজন্ম গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ এই কারণে এখনও মূল্যবান।

যুদ্ধ ও শান্তি, ফাশিজম্ ও কমিউনিজম্, চিন্তার স্বাধীনতা কার ও কতখানি, বুদ্ধিজীবীর সামাজিক দায়িত্ব, দুনিয়াজোড়া গণবিপ্লবের প্রস্তুতি, —এমনতর অসংখ্য বিষয়ের আলোচনায় শিল্পীর নবজন্ম এই যুগের একখানি মূল্যবান ইতিহাস। এই ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদ এখনও লেখা বাকী আছে। ঠিক সেই কারণেই যে-মানবসত্যের অনুশীলন করে গেছেন রলাঁ, তার আবেদন আজও নষ্ট হয়নি। "আমি থামিব না" এই অঙ্গীকার আজও ধ্বনিত হচ্ছে শিল্পী-যোদ্ধাদের, গণ-বিপ্লবের অগ্রপথিকদের কণ্ঠে।

সরোজ আচার্য

॥ শিল্পীর নবজন্ম ॥

যুদ্ধ শেষ হইয়া শান্তি আসিল বটে, কিন্তু শান্তি আসিল না আমার মনে। সম্মুখে তখনও তীব্রতম সংগ্রাম। যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছে ফ্রান্সে আমাদের সংখ্যালঘু দলটির প্রথম কর্তব্য ছিল যুদ্ধ যে কত বড় অপরাধ, কতবড় নির্বুদ্ধিতা তাহা দেখানো ও এইভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটানো। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যে-শান্তি আসিল তাহা শাশ্বত চিরন্তন যুদ্ধেরই বেদী রচনা করিল মাত্র; কারণ যুদ্ধ যাহারা জিতিল পরাজিতের প্রতি হিংস্র আক্রোশে বিদীর্ণ, বিক্ষত, বিহ্বল পৃথিবীর বুকে যে কৃত্রিম শান্তির গুরুভার তাহারা চাপাইয়া দিল তাহাতে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

স্পষ্ট বুঝা গেল পৃথিবীকে বাঁচিতে হইলে আরও অনেক নূতন যুদ্ধের মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে অথবা এমন বিপ্লব তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে যাহার আঘাতে সমগ্র সমাজের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে; কারণ এ সত্য আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে নির্বিবেক বণিকস্বার্থের ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদ আজ এতখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এই অতিকায় দানবের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কিছুতেই সুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না। যদি তাই পারিত তাহা হইলে যে-সকল রাষ্ট্রনেতার হাজার দোষ সত্ত্বেও দেশপ্রেমের আন্তরিকতায় কেহ সন্দেহ করে না তাহারাই বা কেন ভের্সাই ও ত্রিয়ানঁর মত সন্ধিপত্র রচনা করিয়া ইউরোপকে এমন অবস্থার মধ্যে লইয়া যাইতেছেন যেখানে নূতন দারুণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, শুধু অবশ্যম্ভাবী নহে, যে যুদ্ধের ধ্বংসের হাত

হইতে বিজেতা বা বিজিত কাহারও নিস্তার নাই? জানি পঁয়কার প্রাচীন পাকা উকীলের মত তাহার প্রতিপক্ষকে এতটুকু ক্ষমা দেখাইতে নারাজ, তথাপি এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা তাহার মনেও কি জাগে নাই? ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে ক্লেমাঁসো যখন বলিয়াছিলেন 'আমার পশ্চাতে আসিতেছে মহাপ্লাবন', তখন কি গভীর অন্তর্বেদনায় এই নিদারুণ ভবিতব্যতাকে তিনি দেখিতে পান নাই? মৃত্যুর মধ্য দিয়া ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা কি তিনি করেন নাই? ব্রিয়াঁও এই দলের ব্যতিক্রম নহেন। যদিও বুদ্ধির গভীরতায় তিনি ইহাদের চেয়ে অনেক বড় এবং যাহার বলে তিনি জাতিবিরোধ অবসানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তথাপি এই মিলন ঘটাইতে যে সততা, কর্মশক্তি ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তাহা তাহার কোনোদিনই ছিল না। তাই ফ্রান্সের নামে এই সন্ধিনামাগুলির পরিবর্তন করিবার কালে তিনি নির্ভীকভাবে উদ্যোগী হইতে পারেন নাই। ইহারা সকলেই গণপরিষদের নেতা অথচ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেদের মনের আবরণ উন্মোচন করিয়া ইহাদের কেহই দেখেন নাই, দূষিত ক্ষত পরীক্ষার ও অবিলম্বে উপযুক্ত প্রতিশোধক প্রয়োগের কর্তব্য এড়াইয়া তাহারা সকলেই পলাইয়া আসিয়াছেন। একথা কে না বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এমন একটি সমাজব্যবস্থার শোচনীয় অধোগতি তাহাদের পঙ্গু ও আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যাহার সর্বদেহে মৃত্যুব্যাধির বিষাক্ত বীজাণু অথচ যাহার কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিবার সাহস ও শক্তি তাহাদের ছিল না।

এই সমাজব্যবস্থার সহিত আমাদের বন্ধন আমরা ছিন্ন করিয়াছি। ১৯১৯ সালের ঠিক পূর্বাহ্ণেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, সমাজবিপ্লব আমাদের প্রয়োজন কিন্তু এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য সাংঘাতিক মূল্য আমাদের দিতে হইবে। দুঃখের মধ্য দিয়া, রক্তের

মধ্য দিয়া রাশিয়ায় এই বিপ্লব আসিয়াছে। যে-সকল বুদ্ধিজীবী যুদ্ধবিরতির জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন, যুদ্ধ ও হানাহানির মধ্যেই তাহারা এমন একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানুষের জীবনকে ও ব্যক্তিগত বিবেককে সম্মান করাই যে ধর্মবিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান বাণী। ভবিষ্যতকে বাঁচাইবার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া রাশিয়ায় যে নূতন প্রাণশক্তির অভ্যুদয় হইল তাহার সম্মুখে এই বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় অসহায় বোধ করিলেন। যে-দেবতাদের আশ্রয় করিয়া আমি এতদিন বাঁচিয়া ছিলাম সেই মানবতার দেবতা ও স্বাধীনতার দেবতাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া একমাত্র বিপ্লবের দেবতাকে আমি বরণ করিতে পারিলাম না। কোলা ব্রুঞয়ঁ বলিয়াছিলেন, "মাত্র এক দেবতার পূজা লইয়া আমি থাকিতে পারিব না।" জাতির সহিত জাতির আত্মঘাতী যুদ্ধের মধ্য হইতে বাঁচাইয়া রক্তাক্ত বিক্ষত দেহ এই মহান শাশ্বত দুই দেবমূর্তিকে আমি বিপ্লবের শিবিরে আনিতে চাহিয়াছিলাম। সেদিন আমি ভুল করি নাই! সেদিনের মন আজও আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি, শ্রেণী-সংঘর্ষের আবর্ত হইতে যে নূতন শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাব হইতেছে সেই সমাজই অতীত জগতের বিরাট নৈতিক ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; ভাঙ্গনের পথে পা বাড়াইয়া বুর্জোয়া সমাজ এই উত্তরাধিকার হইতে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু সেদিন বড় সঙ্কটের দিন। প্রাচীন ও নবীন দুই সমাজের মধ্যে তখন নিষ্ঠুর সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। "আগে যে-কোনোভাবেই হোক বাঁচিতে হইবে, বাঁচিবার কারণ অনুসন্ধান হইবে পরে"—এই প্রবঞ্চনার কোনো স্বার্থকতাই যখন কোনোকালেই থাকিতে পারে না, তখন সংগ্রামও ছিল না। "যুদ্ধের উর্ধ্বে" পুস্তকে এই প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধরত জাতিগুলির প্রতি আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম।

অক্টোবর-বিপ্লবের যোদ্ধারা যে পথভুল করেন নাই, তাহারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ভুল আমিও করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম সংগ্রাম ও পুনর্গঠনের কার্যে বিভিন্ন কর্মীদলের বিভিন্ন কাজ; বুদ্ধিজীবীদের কাজ মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা, যাহাতে এই সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মন লইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে দূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপক দৃষ্টি-পাতের ফলে সৈন্য-পরিচালনা অভ্রান্ত হইতে পারে। আমার মতো বিপ্লবের আদর্শকে সত্য বলিয়া যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন ভুল আমি করি নাই। বিপ্লবের আদর্শে যিনি বিশ্বাসী একথা তিনি মানিবেনই যে মনের মুক্তি যাহাতে আসে তাহাই সত্যোপলব্ধির সহায়তা করে।

কিন্তু যাহারা চিন্তার স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করিয়া থাকেন তাহাদের কয়জনের এই বিশ্বাস এবং সর্বোপরি এই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপান্তরিত দেখিবার আন্তরিক উৎকণ্ঠা আছে? ইহাদের মধ্যে কয়জন সত্যের সত্যকার উপাসক? সর্বস্বপণ করিয়া সংকল্পে অটল থাকিয়া সত্যের শেষ পর্যন্ত যাইতে ইহাদের মধ্যে কয়জন প্রস্তুত? বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যে কর্তব্যপালন করেন নাই, দায়িত্বকে অবহেলা করিয়াছেন, স্বাধীনতার নামে স্বাধীন চিন্তাকে জনমতের কর্ণধারগণের দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, তাহাদের দেওয়া সম্মান ও অন্নকে পরমোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ত' আমি যৌবনকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। যুদ্ধ ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। ইহারা যে কতখানি নিষ্ঠাহীন, চরিত্রহীন, যূথবদ্ধ পশুপালের মত কতখানি স্বাতন্ত্র্যহীন, যুদ্ধের কল্যাণে তাহা আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া বুদ্ধিজীবীদের আরেকটি দলকেও লোকে চিনিতে পারিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা অল্প, কিন্তু যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় ইহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের দেখিয়া লোকের মনে আশা জাগিয়াছিল যে, যুদ্ধের পরে এই দলটিকে

কেন্দ্র করিয়া এমন একটি সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠিবে যাহারা সত্যের দাবীকে ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার আঘাতের হাত হইতে রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে। সত্যের দাবীই ত' সামাজিক সুবিচারের দাবী, আর কর্মের মধ্য দিয়া সত্যের বিকাশই ত' সামাজিক সুবিচার।

'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী'র (Declaration of Independence of Thought) মধ্য দিয়া আমি এই সৈনিকগণকে সম্মিলিত হইবার আহ্বান জানাই। ১৯১৯ সালের ১৬ই মার্চ এই ঘোষণাবাণী রচিত হয়, ২৬শে জুন 'ল্যুমানিতে' পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। একবৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা কয়েকশত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই ঘোষণাবাণীর মারফতই বুঝা গেল আমাদের এই সেনাবাহিনী কত শূন্য, কত ব্যর্থ, কত আত্মপ্রবঞ্চিত। এই আমার স্বপ্নভঙ্গের, আশাভঙ্গের প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রথম হইলেও তীব্রতা ইহার কম নহে। যুদ্ধবিরতির পর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম এইধরনের অভিজ্ঞতা আরও আমার ভাগ্যে আছে।

॥ দুই ॥

স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম নিরপরাধকে দণ্ডদানের দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করাই স্বাধীনতা নহে। সংঘর্ষের তপ্ত আবহাওয়া হইতে দূরে ধীর শান্তভাবে, সমগ্রভাবে বিচার করিয়া স্বচ্ছ যুক্তিবলে সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞাত উৎপীড়িত ন্যায়ধর্মের সেবায় নিয়োগ করাই প্রকৃত চিন্তার স্বাধীনতা। আমি লা ফন্টেনের সেই জ্যোতিষীর মত নই। যখনই কোনো মজ্জমান ব্যক্তির আর্তনাদ আমার কানে আসে তখনই আমি বিপন্ন মানুষের সাহায্যে ছুটিয়া যাই; এবং যখনই দেখি (যেমন আজ দেখিতেছি) অন্য কেহ তাহাকে ডুবাইয়া মারিতেছে, বিপন্নকে বাঁচাইবার

জন্য হত্যাকারীর সহিত সংগ্রাম করিতে আমি প্রস্তুত হই। এই কয়বৎসর আমি নির্জন পাঠকক্ষ হইতে বারম্বার ছুটিয়া সংঘর্ষের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছি; যে-চিন্তাকে ভাবিতাম 'সংগ্রামের ঊর্ধ্বে' তাহার সহিত যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোগদানের প্রয়োজনের আপাতবিরোধের সমাধান করিয়াছি!

১৯১৯ সালের প্রথম কয়মাস জার্মানীতে কয়েকটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়া গেল,—লীবনেকৃট্ ও রোজা লুক্সেমবুর্গ নিহত হইলেন; বিজয়ী বুর্জোয়া শাসকগণের উদ্যোগে এবং জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল ও সমরলিপ্সু অভিজাতশ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্পার্টাসিস্ট বিপ্লব দমন করা হইল। আমি সংগ্রামের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়া দাঁড়াইলাম।

৩১শে জানুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 'বার্লিনে রক্তাক্ত জানুয়ারী' শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিলাম। প্রবন্ধগুলি ল্যুমানিতে পত্রিকায় (১৬ই, ১৭ই, ১৮ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়) ও লাভনির অঁ্যাতেরনাসিয়নাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে জার্মানীর হত্যাকাণ্ডের আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। যদিও কোনও রাজনৈতিক দলের বাঁধাবুলি আমার ছিল না, তথাপি সত্যঘটনার নির্মম সাক্ষ্য আমাকে স্থির থাকিতে দিল না; আমি তীব্র নিষ্ঠুর ভাষায় সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের কলঙ্কময় ভূমিকাকে আক্রমণ করিলাম। পরে কমিউনিস্ট কাগজগুলিতে এইধরনের আক্রমণ চোখে পড়িয়াছিল এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে আমার এই আক্রমণের সার্থকতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া জার্মান বিপ্লবিগণকে বিপ্লবের শত্রুদের হাতে সমর্পণের অন্ধ পৈশাচিক নীতি ফ্রান্স অনুসরণ করিতেছিল, সে-ইঙ্গিতও আমি ঐ সঙ্গে দিয়াছিলাম।

ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ ও প্রতিহিংসায় উন্মাদ যে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীকে

আজ আমরা চোখের উপর দেখিতেছি, ফ্রান্সের সেদিনের সেই নীতিই ত' তাহার পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

রুশ-বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার জন্য খাদ্যপ্রেরণে বাধা দিয়া তাহাকে মারিবার জন্য মিত্রশক্তিপুঞ্জ, মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গুলির অর্থাৎ এককথায় ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্মিলিত চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া ১৯১৯ সালের ২৬শে অক্টোবরের ল্যুমানিতে পত্রিকায় আমি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

তথাপি, এই সংগ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকিয়াও আমি স্বাধীন চিন্তার দুর্গটিকে রক্ষার চেষ্টা করিতে থাকি। এই স্বাধীনতাকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের 'গজদন্ত মিনার' ভাবিবার কারণ নাই। পরন্তু ইহাকে আমি বিপ্লবেরই একটি ঘাঁটি হিসাবেই দেখি। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শ্রম-জীবী জগতের মধ্যে পরস্পরের বুঝিবার ভুল হইতে যে মারাত্মক সঙ্কটের আবির্ভাব হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে আমার সমস্ত মন তখন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল; কারণ এই ভুল বুঝা উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুর সামিল। যুদ্ধ ইতিমধ্যেই দুইয়ের মধ্যে বিভেদের গভীর পরিখা খনন করিয়াছে, যুদ্ধ-পরবর্তী কয়েক বৎসরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে এই পরিখা রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের মত এতবড় সক্রিয় বান্ধব আর নাই!

১৯১৯ সালের অগাস্ট মাসে ই. ডি. মরেলের মারফত ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশে আমি "চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীর ব্যাখ্যা" পাঠাই। উহাতে লিখিয়াছিলাম "জনগণের মধ্য হইতেই বুদ্ধিজীবীদের জন্ম, অতএব জনগণের স্বাভাবিক নেতা হইবার কথা তাহাদেরই, অথচ তাহাদের সম্পর্কে জনগণের মোহ আজ একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিছুকাল রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার কারণও

ইহাই। এই নিপীড়ন থামিয়া গেলেও অবিশ্বাস দীর্ঘকাল যাইবে না। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীতেও এই ব্যাপার চলিতেছে, যদিও তীব্রতা কিছু কম।" মসিজীবীদের সহিত শ্রমজীবীদের এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে আমি তাহার উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছিলাম। একদলের ছিল 'শোষকশ্রেণীর হাতে নির্যাতনের উপকরণ' হইবার সম্ভাবনা (হইয়াছেও তাহাই), অপরদলের ছিল 'পথ দেখিবার আলো হইতে বঞ্চিত হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল সংগ্রামে আত্মবিনাশের পথ প্রস্তুত করা, সর্বপ্রকার স্থায়ী পুনর্গঠনের আয়োজন ব্যর্থ করা।

তাই আমি চাহিয়াছিলাম পরস্পরকে ভুল বুঝিবার এই সাংঘাতিক সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে। আমার সমস্যা ছিল স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সহিত সর্বহারা শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সংযোগসাধন। ফরেন এফেয়াবস্ পত্রিকার ১৯১৯ সালের অগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত "আমার ঘোষণাবাণীর ব্যাখ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে কাহার কি কাজ হইবে তাহার একটা মোটামুটি খসড়া দিয়াছিলাম। এই খসড়াটি ছিল এত সাধারণভাবের যে, ইহার বাস্তব মূল্য কিছুই ছিল না ; কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের উল্লেখ ছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-পন্থীরা যে বিষাক্ত ভাবধারা প্রচার করিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে এবং জাতীয়তাবাদরূপী মরীচিকা ও সর্বপ্রকারের নির্যাতনমূলক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরলস নিঠুর সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই ছিল আমার মতে বুদ্ধি-জীবীদের প্রথম ও প্রধান কথা। সর্বহারা শ্রমজীবী যে পথ প্রস্তুত করিবে তাহাকে আলোকিত করাই বুদ্ধিজীবীদের কাজ।

ই. ডি. মরেলের নিকট লিখিত আরেকখানি চিঠিতে আমি (১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ) আমার তখনকার চিন্তা ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করি। চিঠিখানি ছিল অস্বচ্ছ, অস্পষ্টধরনের। বাস্তব সংগ্রামের অভিজ্ঞতাহীন ভাববাদী বুদ্ধিজীবীদের বাক্যে ও কর্মে এই অস্পষ্টতা আসিবেই। কিন্তু

মূল বক্তব্যে কোনো আপসের স্থান ছিল না। শ্রমিকবিপ্লবের পথে যে "পরিপূর্ণ আন্তরিকতা" আসিবে আমি তাহার কথাই বলিয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম, "আমার বিশ্বাস মনুষ্যসমাজের বিবর্তনের জন্য শ্রমিক-শাসনের অভিমুখেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে।"

অপরপক্ষে এই চিঠিতে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষধরনের কর্তব্যের দাবী ছিল, যাহা মিটাইতে গেলে প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতার, কারণ এই স্বাধীনতা ছাড়া সত্যের সন্ধান অসম্ভব। সর্বদেশের স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের লইয়া গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কল্পনা তখন আমার মনে ছিল। ইচ্ছা ছিল "যে-সকল বুদ্ধিজীবী যুদ্ধপন্থী জাতীয়তাবাদীদের খাতায় নাম লিখাইয়া তাহাদের সর্বপ্রকারের অপকর্মে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, এই সঙ্ঘ তাহাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়া 'মননজীবী-দের বিশ্বসঙ্ঘের' মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিবে।" আমি চাহিয়া-ছিলাম "এই সঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সমালোচনাকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক ছাত্রসমিতি ইত্যাদি, অর্থাৎ এককথায় বিশ্বব্যাপী এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যাহা ভবিষ্যৎ সমাজের মস্তিষ্কের কাজ করিবে।"

এইসব পরিকল্পনার কি পরিণতি হইয়াছে তাহা আজ জানা কথা। কতকগুলি চতুর প্রতিক্রিয়াশীল দল ইহা আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ বিশ্বসঙ্ঘের অভাব নাই! ব্যবসায় ও বুর্জোয়া আদর্শে পরিচালিত গভর্নমেণ্টগুলির আশ্রয়ে এইগুলি পরিপুষ্ট। (দুই আদর্শের একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না)। যে সকল স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে স্পষ্টভাষণের জন্য সকলে ভয় করে এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে কৌশলে তাহাদের বাহিরে রাখা হইল। ভিতরে রহিলেন তাহারা বুদ্ধিজীবী-জগতে প্রতিক্রিয়াশীলতার যাহারা প্রতিনিধি ; সঙ্গে রহিলেন লেখাপড়া

লইয়া ব্যস্ত-থাকা নিরপেক্ষের দল, আর এমন কতকগুলি দেশ যাহারা সব ব্যাপারেই সগৌরবে নীরব থাকেন। অতএব যুদ্ধের মধ্যে মহৎ আদর্শগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে সংগ্রাম আমরা করিয়াছিলাম, তাহার ফলটুকু যুদ্ধের পরে আমাদের চরমতম শত্রুরাই হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই সকল আদর্শের সাংঘাতিক শক্তি বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাহারা একমুহূর্ত সময় নষ্ট করে নাই।

আইনকানুন স্বাধীনতা ও সভ্যতাকে যুদ্ধের মধ্যেই ত' তাহারা চুরি করিয়া লইয়াছে। গণতান্ত্রিক ভাবধারা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদর্শগত প্রবঞ্চনার বৃদ্ধি ত' কখনও থামে নাই।

এই পাশকাটানো আক্রমণকে প্রথম হইতেই প্রবলভাবে বাধা দিবার প্রয়োজন হইল। লিলুলি (Liluli) নামক পুস্তকে আমার সাধ্যমত বাধা আমি দিলাম। বইখানি যুদ্ধের মধ্যেই জেনেভায় বসিয়া লিখি এবং সেখান হইতেই উহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই-টুকুই যথেষ্ট নহে। সূক্ষ্ম বিদ্রূপ খুব কম লোককেই বেঁধে! যুদ্ধের জন্য চাই আরও মোটা হাতিয়ার। আমাদের প্রয়োজন ছিল ভারি কামানের; কিন্তু ঘাঁটি-রক্ষার উপযোগী শক্তি আমাদের ছিল না। যুদ্ধের কয়েক বৎসরের অগ্নিপরীক্ষা হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের অনেকে ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলে পতিত হন। যুদ্ধবিরতি এবং শান্তির সন্ধিস্বাক্ষরের মাঝামাঝি সময়টাতে আমাদের শ্রেষ্ঠ সহকর্মী অনেকেরই জীবন তেল-ফুরাইয়া-যাওয়া প্রদীপের মত নিভিয়া গেল।

চারিদিকে শোকের ছায়া, নিজে বিয়োগবেদনায় কাতর, এই ভাবে দুইটি বৎসর আমি মৃত্যুর সাথে কাটাইলাম। আমাদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল তাহারা নৈতিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মানুষ যে কতখানি হীন, কতখানি নির্বোধ, কতখানি পশু এবং কতখানি উদাসীন হইতে পারে, তাহা এবার তাহারা চোখের উপর

দেখিয়াছিলেন। মানবতায় তাহাদের আর বিশ্বাস ছিল না। তাহারা মানুষের সংস্পর্শ হইতে পলাইয়া গেলেন, পলাইয়া গেলেন সেই আন্দোলনের মধ্য হইতে যে আন্দোলন তাহাদিগকে মানুষের সাথে মিলাইতে পারিত। যে-কপটতাকে তাহাদের আঘাত করা, আক্রমণ করা উচিত ছিল সেই কপটতার প্রতি নিবিড় ঘৃণাই তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে দূরে সরাইয়া দিল, বাকি যাহারা রহিল তাহাদের এত-খানি তীব্র অনুভূতি না থাকার ফলে বিরুদ্ধদলের আমন্ত্রণে তাহাদের সহিত একটা আপস-নিষ্পত্তি করিয়া নিল। মনকে বুঝাইল যে আদর্শকে তাহারা রক্ষা করিতে চাহিতেছে "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের" মধ্যে তাহার প্রচার করাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ।

অবশ্য ইহাকে পুরাপুরি আত্মপ্রবঞ্চনা বলা চলে না, এবং প্রাণপণে এই আদর্শকে সত্যই যদি তাহারা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন তবে তাহাদের কাজের একটা সার্থকতা থাকিত। (অবশ্য বেশিদিন ইহা চলিত না, অতি শীঘ্র নূতন বন্ধুদের বন্ধন ছিঁড়িয়া আসিতে তাহারা বাধ্য হইতেন)। কিন্তু তাহারা অতি সাবধানীর সতর্ক পন্থা অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। বুদ্ধিমানের মতো চুপ করিয়া যাওয়া বেশ লাভের ব্যবসা, অতএব শীঘ্রই তাহারা দল ছাড়িয়া দিলেন। যে সামান্য কয়জন বিরোধীদলে যোগ দিল না, অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একনিষ্ঠ সৈনিকের মত যাহারা প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে বিরত হইল না, তাহাদেরও মানসিক জীবনে এমন একটি গভীর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যাহার ফলে তাহাদের সমস্ত কর্মোদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। কম্পাসের কাঁটা উত্তরমুখীন হইবার প্রয়াসে একমুহূর্তে বাম হইতে একেবারে দক্ষিণে চলিয়া গেল। ক্লার্তে-দলের মধ্যে যে দ্বিধা ও অসঙ্গতি দেখা দিল তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। এই দলটি অবশ্য তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত অক্লান্ত

নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত বিপ্লবীবাহিনীর পুরোভাগে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ১৯১৯ সালের সেই পথ খোঁজাখুঁজির প্রথম কয়েক মাস ক্লার্তে-দলও সংশয়দোলায় দুলিয়াছিল, এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের নাগপাশ হইতে সবলে আপনাকে ছিন্ন করিয়া স্থির ও সুস্থ থাকিতে পারে নাই, একেবারে অসহিষ্ণু চরমপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল। বারবুস ও মার্সেল মার্তিনে প্রমুখ তাহাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ কর্মিগণ চিন্তার স্বাধীনতাকে তুচ্ছ করিয়া বিপ্লবের পায়ে এই স্বাধীনতার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়াছিলেন। এই আত্মসমর্পণ ইতিপূর্বে তাহারা নিজেরাই করিয়াছিলেন।

বিপ্লব ও চিন্তার স্বাধীনতা ইহাদের কোনোটিকেই আমি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না, এই দুইটিকেই একসঙ্গে রক্ষা করিতে করিতে আমার সর্বশক্তি ব্যয় হইয়াছে। তখনকার দিনে কোনো দলে না থাকাটা ছিল সবচেয়ে নিরানন্দ কাজ, যে-কাজে কোনো পুরস্কার ছিল না, বাহবা ছিল না, স্বীকৃতি পর্যন্ত ছিল না। বিপ্লবীদের অন্ধ আপস-হীন মনোবৃত্তির সহিত চিন্তার স্বাধীনতার তখন সংঘর্ষ শুরু হইয়া গেল। সোবিয়েৎ রাশিয়ার বিপ্লব যখন আত্মরক্ষার জীবনমরণ সংগ্রামে রত সেই চরম সঙ্কটসঙ্কুল কয়েক বৎসর বিপ্লবীদের এই অন্ধ অনমনীয় মনোভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে। বিপ্লবের এই অতিরিক্ত দাবীর ফলে স্বাধীনতার আদর্শবাদীদিগের বিরোধিতা না কমিয়া বরং এতখানি বাড়িয়া গেল যে, তাহারা সংগ্রাম হইতেই একেবারে দূরে সরিয়া যাওয়ার কথা পর্যন্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

পৃথিবী ব্যাপিয়া তখন হিংসার তাণ্ডব চলিয়াছে; ইহার নিকট যাহারা তাহাদের সত্তাকে বলি দিতে অস্বীকার করিলেন—জাতিগত বা শ্রেণীগত সর্বপ্রকার দেশপ্রেমের এবং জাতীয় অথবা সামাজিক সর্বপ্রকার একনায়কত্বকে যাহারা বিনাদ্বিধায় বর্জন করিলেন তাহাদের

নিকট আমার ক্লেরাঁবোল (Clerambault) মহাপুরুষ ও শহিদ হইয়া গেল। "সবার বিরুদ্ধে একাকী" (ইহাই বইখানির প্রথম নামকরণ করিয়াছিলাম)—অর্থাৎ স্বাধীন বিবেক, স্বাধীনতার পায়ে যাহা আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। বারবুসের পত্রিকা মঁদ-এ (Monde) তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া (১৯২০ ডিসেম্বর ও ১৯২১ জানুয়ারী) তৎক্ষণাৎ বেরনিয়ে উহাকে শেষ করিয়া দিলেন। বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধী (conscientious objectors) সকল ফরাসীই এই বইখানিকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তখনও ইহাদের সংশয় ও দ্বিধা ছিল।

ইহার অল্পকালের মধ্যেই আমার চিন্তাগগনের দিগন্তে গান্ধীর সুদূর তারকা দেখা দিল। এই তারকার আলোককেই আমি পরে সমস্ত ইউরোপে প্রতিফলিত করি।

॥ তিন ॥

১৯২০ সালে ডিসেম্বরে তুর (Tours) কংগ্রেসে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হইল। লঁগে (Longuet) ছিলেন আমার বন্ধু। ব্লুম্ (Blum) ও রেনোদেলের (Renaudel) সহিত যোগদান না করিতে অনুরোধ করিয়া তাহাকে আমি পত্র লিখিলাম। এমন কি তাহাকে আমি জনজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পর্যন্ত অনুরোধ করিলাম। সকলেই জানেন সে-অনুরোধ তিনি রাখেন নাই। তিনি আমাকে পপুলেয়র (Populaire) পত্রিকায় টানিবার চেষ্টা করিলেন। তখন জ্যমানিতে পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিলাম

(১৯শে মার্চ ১৯২১), জানাইলাম তাহার পত্রিকা যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আমার সম্মতি নাই। "যে পাপ বিরোধের ফলে সমাজতন্ত্রের দুইটি অংশ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে" তাহার মধ্যে আমি থাকিতে চাহিলাম না।

সে কয় বৎসর আমার প্রধান কাজ হইল ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবী, বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ফ্রান্সের বাহিরে সমস্ত জাতির স্বাধীন চিন্তাবীরদের লইয়া একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করা।

আমার এই দ্বিমুখী অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল রাজনৈতিক দলগুলির পরম অসহিষ্ণুতার জন্য। হিংসার নিকট মনের এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে আমি সে-সময় (১৯২১-১৯২২) অবিশ্রাম অভিযান চালাইয়াছিলাম। তখনকার দিনের সে-উন্মত্ততার মধ্যে এই হিংসাকে শুধুমাত্র অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত না, উহাকে পতাকার সম্মান দেওয়া হইত। বোলশেভিকদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে অ-দলীয় বিপ্লবীদের আকুল আবেদন, রাশিয়া হইতে প্রত্যাগত আমার বিশ্বাসভাজন বন্ধুদের নিকট শোনা অত্যাচারের কাহিনী এবং সর্বোপরি গর্কির চিঠিগুলি আমার বিদ্রোহকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। গর্কি তখন সদ্য সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ছাড়িয়া আসিয়াছেন এবং তিক্ত বিষণ্ণ নৈরাশ্যে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। মনের স্বাধীনতা আরও বেশি করিয়া আমার রণপতাকা হইয়া উঠিল। তথাপি ইহা যাহাতে আমার সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অজুহাত হইয়া উঠিতে না পারে, সে-বিষয়ে আমি সতর্ক থাকিলাম। শুধু সতর্ক থাকিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম না, সর্বহারার সংগ্রামের আকাশেই সে-পতাকাকে আমি উড্ডীন দেখিতে চাহিলাম।

তিন বৎসর আগে ই. ডি. মরেলের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে বিপ্লবীদের শিবিরে স্থান লইবার জন্য বুদ্ধিজীবীদের আমি আহ্বান

জানাইয়াছিলাম। ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং এই আলোচনা চরমে পৌঁছায় বারবুসের সহিত বিতর্কে। এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছিলাম যে, সাহায্যের ইচ্ছা লইয়া যে সকল শ্রেষ্ঠ মনীষী বিপ্লবের দিকে আসিতেছিলেন, তাহাদের মুখের উপর বিপ্লবের দ্বার এইভাবে রুদ্ধ করিলে বিপ্লবেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে। আজ আমি আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতে চাই। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্লার্তে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বারবুস যে বিরাট বিতর্কের সূত্রপাত করেন তাহাকে আবার ধীর শান্তভাবে বিচার করিতে চাই। ১৯২২ সালের ব্রুসেলসের লা'র লিব্‌র্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খোলা চিঠিতে তীব্র ভাষায় এই চিঠির আমি জবাব দিই। তখন সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া বাদ-প্রতিবাদের সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল। উভয় পক্ষই সমধর্মী লেখকদের নিকট হইতে সাহায্য ও সমর্থন পাইতে লাগিলেন। সংগ্রাম সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, মুক্তির পথ পাইয়া যে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল তাহা বহু বৎসর ধরিয়া আমাকে ও বারবুসকে আঘাত করিয়া চলিল। কিন্তু ইহাতে আমাদের কাহারও ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। সেদিন হইতে আজ বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই বার বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ মনে হয়, এই বিতর্ক হইতে আমরা উভয়েই লাভবান হইয়াছি। অন্তত আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে পারি, এই লাভ স্বীকারে আমি ভীত বা কুণ্ঠিত নই। আমাদের দুই মতবাদ ছিল যেন একই মুদ্রার দুইটি বিপরীত পিঠ, প্রত্যেক পিঠেই বিপ্লবের ছাপ।

পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া মতবাদ দুইটি পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল। বারবুসের পূর্বোক্ত যে-প্রবন্ধে ("কর্তব্যের অপরার্ধ। রলাঁবাদ সম্পর্কে") বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাহাতে তিনি চিন্তার স্বাধীনতার ধ্বজাধারিগণের রাজনীতির প্রতি ঔদাসীন্যকে আক্রমণ করিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন।

"কর্তব্যের অপরার্ধের" কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াও তিনি সত্যপথের ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন বর্তমানে সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না, নূতন সমাজব্যবস্থার গঠনের কাজেও বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য করিতে হইবে। অগ্নিপরীক্ষার চরম মুহূর্ত যখন আসে তখন মানুষের এবং রাজনৈতিক মতবাদের আদর্শচ্যুতি ও ব্যর্থতাকে ভুলিয়া যাইবার অথবা ক্ষমা করিবার যে-অক্ষমতা আমার মনকে পঙ্গু করিয়াছিল তাহার বিরোধিতা করিয়া বারবুস হয় ত' ঠিকই করিয়াছিলেন! সমাজতন্ত্র ১৯১৪ সালের সংকটে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল বলিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতি আমার বিশ্বাসের অভাবকেও সমালোচনা করিয়া বারবুস হয় ত' ভুল করেন নাই। কারণ যাহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে এবং প্রবঞ্চিত হওয়ার সত্যটিকে আন্তরিক-ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাদের ফিরিয়া আসিবার জন্য দ্বার আমাদের সবসময় খুলিয়া রাখিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু কোন সে এক "সামাজিক জ্যামিতির" "মৌলিক নিয়মাবলীর নির্ভুলতাকে" মানুষের মনের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। মার্কস-লেনিনপন্থী বিপ্লবটি ত' একটি সামাজিক পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং যদিও ইহার সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না তথাপি এ কথা বলা যায় যে, সামাজিক মুক্তি আনিবার বাস্তব সুযোগ ও সম্ভাবনা একমাত্র এই পথেই আছে। (মানুষের ভাগ্য প্রতিমুহূর্তে উলট্‌পালট্ হইতেছে; নিয়তি মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তরিত হইতেছে; মানুষের জীবনে ইহাই ট্র্যাজেডি, আবার ইহাই তাহার মহিমা।) বারবুস ভুল করিয়া-ছিলেন যে, ভুল করিবে বিপ্লব স্বয়ং যদি সে লক্ষ্যলাভের উপায়কে ছোট করিয়া দেখে। আজ আমি ক্লেরাঁবোল-এর সেই নীতি সমর্থন করি। এই নীতির কথাই বারবুসকে লিখিয়াছিলাম ঃ

"লক্ষ্য খাঁটি হইলেই যে যে-কোনো উপায়ে লক্ষ্যলাভ করা নীতিসংগত ইহা সত্য নহে। সত্যকার প্রগতির পক্ষে লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা লক্ষ্যবস্তু লাভের উপায়ই মূল্যবান বেশি। কারণ, লক্ষ্যবস্তু (যাহা কখনও লাভ করা যায় না, এবং লাভ করা গেলেও সম্পূর্ণভাবে যায় না) কেবলমাত্র মানুষের বাহিরের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। কিন্তু ন্যায় অথবা হিংসার ছন্দে ছন্দিত করিয়া মানুষের মনকে গড়িয়া তোলে লক্ষ্যলাভের উপায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যদি হিংসার পথই বাছিয়া লওয়া হয় তবে যে-প্রকৃতির গভর্নমেণ্টই হউক না কেন প্রবলের উৎপীড়ন হইতে সে দুর্বলকে কখনও রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই নৈতিক নীতিগুলিকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি; এবং আমার মনে হয়, সাধারণ সময় হইতে বিপ্লবের সময় এই প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। কারণ, বিপ্লবের যুগে সবই গলিত অবস্থায় থাকে, তাই জাতির মনের যে-কোনো রূপ পরিবর্তনের ছাঁচ সহজেই অঙ্কিত হইয়া যায়।"

জবাবে বারবুস যাহা লিখিলেন তাহার ভাষা কিছুটা দুর্বোধ্য, তাহার ভাব তাহাতে ভাল প্রকাশিত হয় নাই। তিনি বলিতে পারিতেন—ইতিহাসের কোনো কোনো কালে হিংসা বড় বেদনাদায়ক প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, যখন স্পষ্ট কর্মের আহ্বান আসে, লক্ষ্যলাভের উপায় তখন আর মানসিক বিলাস থাকে না, খুশিমত উহা বাছিয়া লইবার অবসরও থাকে না। গলার কাছে কেহ ছুরি ধরিলে দৃঢ়মুঠিতে সেই ছুরি ধরিয়া হত্যাকারীর দিকে তাহার ফলাটা জোর করিয়া আগাইয়া ধরা যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন—খুন হইতে না চাহিলে ইহা না করিয়া যেমন উপায় নাই, ঐতিহাসিক মুহূর্তে হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করাও এইরূপ। বাঁচিতে হইলে প্রত্যেক জীবের পক্ষে হিংসা অপরিহার্য, এই হিংসা আমার পক্ষে অসহ্য; কিন্তু ইহার চেয়েও অসহ্য হিংসার পক্ষে ওকালতী। যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসা উন্মাদেরা তখনকার দিনে এই ওকালতী করিত

এবং ইহার কথাই বারবুসের নিকট তৃতীয়পত্রে (এপ্রিল ১৯২২) আমি লিখিয়াছিলাম। এই উন্মাদেরা যুদ্ধের নিকৃষ্টতম শিক্ষাকে বিপ্লবের কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিল অথচ বিপ্লবের লক্ষ্য যুদ্ধের নিকৃষ্টতম শিক্ষা হইতে আমাদের মুক্ত করা।

কোনো হিংসাই গর্ব করিবার মত গুণ হইতে পারে না। হইতে পারে বড়জোর একটি কঠোর কর্তব্য, যে-কর্তব্য নির্ভীকভাবে সাধন করিতে হইবে অথচ যাহা লইয়া দম্ভ করা করা চলিবে না। হিংসা যে সংহার-শক্তিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহার সম্পর্কে কোনো দায়িত্বশীল বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনেতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আজ রোমের ড্যুচে মেশিনগানের প্রশংসা করিয়া উহা শিশুদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন। কতবড় নির্বোধ, কতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন তিনি। ভীষণ নিয়তিকে লইয়া উল্লাসে খেলায় মাতা পৌরুষের পরিচয় নহে। প্রয়োজন হইলে উহাকে বিনাবাক্যে, বিনাদম্ভে তুলিয়া লওয়াই সত্যিকারের পৌরুষ।

আমি একথাও বলি, হিংসা শুধু শরীরের প্রতি নহে, মনের প্রতি হিংসা বলিয়াও একটা জিনিস আছে যাহা আমাদের একটুও কম বিচলিত করে না। ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে বারবুসের জবাবে লিখিত আমার প্রথম খোলা চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই এখানে আবার বলি ঃ "জয়লাভের জন্য জীবনের সর্বোচ্চ নীতিকে বারম্বার তাহারা বলি দিয়াছে, বলি দিয়াছে মানবতাকে, স্বাধীনতাকে এবং সকলের চেয়ে বড়, সত্যকে। মানবতার স্বার্থে বিপ্লবেরই স্বার্থ—এই নীতিকে সর্বদা রক্ষা করিতে হইবে। যে-বিপ্লব এইসবকে উপেক্ষা করে, আজ হোক কাল হোক তাহার পরাজয় হইবেই ; এবং এ পরাজয় বাস্তবক্ষেত্রের পরাজয় হইতে আরও সাংঘাতিক, এ-পরাজয়ের অর্থ—নৈতিক অধঃপতন।'

স্বাধীন বুদ্ধিজীবী হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই নৈতিক শক্তিগুলিকে রক্ষা করা ; প্রয়োজন হইলে এমন কি বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও রক্ষা করা। কারণ বিপ্লবের জন্যই ইহাদের প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ক্লেরাঁবোল পুস্তকে আমি বলিয়াছি, "সবার বিরুদ্ধে একের অর্থই সবার জন্য এক। এই একের কর্তব্য সংগ্রামের উন্মাদনার মধ্যে ধ্বংসের হাত হইতে সর্বমানুষের সম্পদকে রক্ষা করা।"

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার জবাবে আমি খানিকটা উল্লাসের সঙ্গেই বিপ্লবের শিবিরে আমার স্থান করিয়া লই। এই বিপ্লবের শিবিরে আমার প্রবেশ তাহারা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল। আমি বলিলাম ঃ "তোমার সহিত যাহার চিন্তার ও মতের মিল নাই বিপ্লবের মধ্যে তাহার স্থান নাই, তোমাকে এ-বিধান দিবার অধিকার কে দিল ? বিপ্লব কোনো বিশেষ দলের সম্পত্তি নহে। যে-মানুষই বৃহত্তর ও মহত্তর ভবিষ্যতকে কামনা করে বিপ্লবের শিবিরে সে স্থান পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বিপ্লবের মধ্যে থাকিতে চাহেন স্বাধীন-ভাবে।" এইখানে আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রমঁ্যা রলাঁ এখন আর নিজের জন্য কথা বলিতেছিলেন না। তাচ্ছিল্য করিয়া যাহাদের রলাঁপন্থী বলা হইত তাহাদের সকলের হইয়াই তিনি কথা কহিলেন। চিন্তার স্বাধীনতাকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকার এবং শুধু অধিকার নহে, কর্তব্য বলিয়া যাহারা দাবী করেন, তাহাদের সকলের পক্ষ লইয়াই তিনি দাঁড়াইলেন। কারণ, "যে-চিন্তাধারা কোন দলের পায়ে আত্মবিক্রয় করিয়া নিজের স্থান পরিত্যাগ করে তাহার কি মূল্য আছে।"

কেবলমাত্র রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপ সম্পর্কেই আমার চিঠির শেষাংশে গভীর হতাশার অভিব্যক্তি ছিল। ঐ কয়েকমাস আমার ডায়েরীতে এই হতাশা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঐ

সময়টাতে আমি যেন ভবিষ্যদ্‌দর্শনের একটা মর্মান্তিক ক্ষমতা লাভ করিলাম। অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম মুষ্টিমেয় পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের যুগ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেখিলাম স্বার্থপর ঔদাসীন্যের ফলে ফ্রান্সে আসিতেছে চরম সংকটের দিন। ভীষণ ভবিষ্যৎকে এত স্পষ্টভাবে দেখা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে বিশ্বাস আমার শিথিল হইল না; বর্তমানের গণ্ডী ছাড়াইয়া আমাদের কর্মক্ষেত্র আমি প্রসারিত করিয়া চলিলাম। আমাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী প্রকাশ করিতে বারবুস্ আমাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, উত্তরে দুইটি মূল বিষয় তাহাকে জানাইলাম:

(১) ইউনিয়ন অব্ ডেমোক্রেটিক কণ্ট্রোল সঙ্ঘের বীর বন্ধুগণের মত শাসকশ্রেণীর কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা করা ও নির্ভীক অভিমত ব্যক্ত করা; ভল্‌তেয়ার ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের তিক্ত বিদ্রূপ ও নিষ্ঠুর সমালোচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রকারের কলঙ্ক রটনাকে নির্মমভাবে আঘাত ও আক্রমণ করা। এই দুই ব্যাপারে নিরলসভাবে সমস্ত আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংগ্রাম চালানো।

(২) অহিংস প্রতিরোধ। (ইহা নূতন, আমার বিশ্বাস ফ্রান্সে সাধারণ আলোচনায় গান্ধীর নাম এই সর্বপ্রথম, আমি তখন গান্ধীর জীবনী লিখিতেছি) অহিংস প্রতিরোধ বলিতে আমি "প্রতিরোধহীনতা" বুঝাইতে চাহি নাই! পরন্তু বলিতে চাহিয়াছিলাম ইহাই চরম প্রতি-রোধ, পাপাসক্ত রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতে, তাহার ইচ্ছা পূরণ করিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি। কেবলমাত্র আত্মিক বল ও বিবেক-নিষ্ঠার সাহায্যে এই অস্ত্র কার্যকরী হইতে পারে, সমাজসংগ্রামে এই অস্ত্রের যথোপযুক্ত মূল্য স্বীকার না করিবার জন্য বারবুস ও তাহার বন্ধুদের আমি তিরস্কার করি। আমি লিখি, "সমষ্টিগত শক্তি লইয়া তোমরা এতদূর মাতিয়া আছ যে, ব্যক্তিগত বিবেকের উপযুক্ত মূল্য দিতে চাহ

না। অবশ্য সমষ্টিগত শক্তির যে ভীষণ আকর্ষণ আছে তাহা কাহারও অপেক্ষা আমি কম জানি না।

• আমার মতে যেসকল শক্তি পৃথিবীর রূপান্তর আনে—বিবেকের শক্তি তাহাদের অন্যতম। অতএব, এই শক্তি প্রয়োগের কৌশল বিপ্লবকে শিখিতে হইবে। বিপ্লবের উদ্দেশে আমি এই কথা বলি যে, তোমার শিবিরে আমাদের স্থান দাও, তোমার সংগ্রামে ও সংকটে আমাদের অংশ দাও, কিন্তু তোমার শিবিরে আমরা স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিয়া বন্ধুর মত থাকিব, যাহা ন্যায় বলিয়া বুঝিব তাহার পক্ষে এবং যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিব তাহার বিপক্ষে স্বাধীনভাবে সংগ্রাম করিবার অধিকার যেন আমাদের থাকে।

জনসাধারণের যাহারা আমার কথা শুনিত তাহাদিগকে এবং লেখক বন্ধুদের যাহারা অন্তত প্রগতিচিন্তার পুরোভাগে আছেন বলিয়া নিজেদের প্রকাশ করিতেন তাহাদের উদ্দেশে আমি এই প্রশ্ন করিলাম :

তাহারা কি বিশ্বাস করেন বর্তমানে প্রত্যেক মননশীল মানুষের কর্তব্য সমগ্র দেহমন লইয়া বিপ্লবের বাহিনীতে যোগদান করা, কিম্বা বিপ্লব যদি ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রয়োজন বুঝিতে না চাহে তবে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও মনের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বিপ্লবের আদর্শের, সমগ্র মানব সমাজের আদর্শের সেবা করিয়া যাওয়া? বিপ্লব যদি এই স্বাধীনতার মূল্য না বোঝে, তবে বুঝিতে হইবে নবজাগরণের প্রেরণার উৎস তাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সে এখন নূতন ধরনের এক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

বুদ্ধিজীবীদের সকলেই জবাব দিলেন। ব্রুসেল্‌স-এর লা'র লিব্‌র্ পত্রিকার ১৯২২ সালের মার্চ সংখ্যায় তাহাদের বিবৃতিগুলি প্রকাশিত হইল; এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকজন জার্মানলেখকের উত্তর বাহির হইল। বেলজিয়মের ডাক বিভাগেব কর্তৃপক্ষ জার্মান লেখকদের চিঠিগুলি আটকাইয়াছিলেন।

ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়মের ২৬ জন বিখ্যাত লেখক ও চিত্রকরের জবাব প্রকাশিত হইল। রেনে আর্কস, জর্জ ব্রাঁদ, লিয়ঁ বাজালজেৎ, জর্জ শেনভিয়ের, পল কর্লঁয়্যা, জর্জ দ্যুআমেল, এদুয়ার দ্যুজার্দ্যাঁ, ল্যুক দুর্তাঁ, গুস্তাভ দ্যুপঁয়্যা, জঁা দেব্রি, ক্যজিমির এদ্‌শ্মিদ, ফের্না গুৎনোয়ার দ্য তুরি, পিয়ের জঁা জুভ, আনেৎ কল্‌ব্‌, আন্দ্রেয়াস লাৎস্‌কো, ফ্রানজ মাসেরেল, হাইনরিখ মান, মার্শেল মার্তিনে, জাক মেনিল, জ্যুল রমঁ্যা, রেনে শিকেলে, ফ্রিৎস্ ফন উনরুশ, শার্ল ভিলদ্রাক, হেন্‌রি ভান ডের ভেল্ডে, লেয়ন ভের্ত, স্তেফান ৎসাইগ, ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন নরম্যান এঞ্জেল, ফ্রেডেরিক ভ্যান এডেন, ডগলাস্ গোল্ডরিং, ই. ডি. মরেল ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল। চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শে ইহারা আস্থা জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন, হান্‌স রিনের একই মত ব্যক্ত করিলেন কিন্তু আলাদাভাবে ১৯২২ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের জুর্নাল দ্যু পেপ্‌ল পত্রিকায়।

এই বিতর্কে অধিকাংশই বিনাশর্তে চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন—চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি যাহাদের অতিরিক্ত আসক্তি ছিল তাহারা পর্যন্ত করিলেন। নিম্নে ঐ বিতর্কের একটি সংক্ষিপ্তসার দিতেছি :

মনের স্বাধীনতার ও স্বতন্ত্রতা রক্ষার পক্ষে যাহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে জর্জ দ্যুআমেল ও স্তেফান ৎসাইগই সর্বাগ্রগণ্য, দ্যুআমেলের মতে মননসর্বস্ব মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মযোগীর প্রতি তাহার ছিল নিবিড় তাচ্ছিল্য।

তিনি বলিলেন, "বিপ্লব চিন্তাজগতের ব্যাপার (গ্যালিলিও, নিউটন, বিটোফেন)...রাজনৈতিক বিপ্লব তুচ্ছ ব্যাপার, ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। সমাজবিপ্লব শুরু হইয়াছে হাজার হাজার বছর আগে এবং ইহার কখনও শেষ হইবে না। বারম্বার ইহার বিকাশ হয় মানুষের

মনে—রাস্তায় নহে। লা বোয়েসি, ভোবাঁ, রুসো, ভিটারো—ইহারা সকলেই বিপ্লবী ছিলেন। সেণ্ট জাস্ট ছিলেন একজন আন্দোলনকারী মাত্র।"

কর্মের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে কোনো উপলব্ধি নাই। এই বিপ্লব মানসলোকের বিপ্লব, নিজের সময়মত ইহা আসিবে এবং এক বিপ্লবের পর আর এক বিপ্লব আসিতে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবে। ৎসাইগেরও বিশ্বাস ছিল কোনো দল বা পৃথিবীর স্বাধীনতা অপেক্ষা মনের স্বাধীনতা অনেক বড়, অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, দ্যুআমেল অপেক্ষা ৎসাইগ আরও একটু বেশি দূর গিয়াছেন, কেমন একটা পরাজয়ের হতাশা লইয়া তিনি স্বীকার করিতেন যে, যে-আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন দৃশ্যমান জগতে তাহা সফলতা লাভ করিবে না। দ্যুআমেলের কিন্তু এ-নৈরাশ্য ছিল না, সমাজসংগ্রামে লেখকের যোগদানের সম্ভাবনাকে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বহির্জগত ও চিন্তাজগতের মধ্যে ৎসাইগের কাছে কোনো সংযোগ ছিল না।

চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শে পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন জ্যুল রমাঁ্যা, ফ্রানজ্ মাসেরেল, হাইনরিখ মান, জর্জ শেনভিয়ের, হান্স রিনের, রেনে শিকেলে ও ফ্রিৎস ফন উন্রুশ। কেবলমাত্র শেষোক্ত ব্যক্তি গান্ধীর কথা বলিয়াছিলেন, "মিথ্যা দেবতার পদতলে মন উৎসর্গ করিতে অস্বীকার করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে তিনি যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন" তাহার উল্লেখও তিনি করেন।

বিরোধী দলে ছিলেন মার্শেল মার্তিনে। তিনি চাহিয়াছিলেন বিপ্লবের আগুনে পরিপূর্ণ আত্মাহুতি; বিপ্লবের দুঃখের, বিপ্লবের ভুলের অংশ গ্রহণ। তাহার এই আহ্বানের মধ্যে ছিল তাহার স্বাভাবিক আবেগউদ্বেল হৃদয়ের নিবিড় কারুণ্য। অন্যদিক হইতে, আরও নিরাশক্ত দিক হইতে দ্যুআমেলের মতই অনেকটা মানসলোকের দিক হইতেই বিচার করিয়া

এদুয়ার দ্যুজারদ্যাঁ সাদা চেক সই করিয়া বিপ্লবের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিলেন। তাহার মননশীলতায় গভীরতা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল বলিয়াই ক্যাথলিক স্বৈরতন্ত্রের বিলাসকে (এই স্বৈরতন্ত্র ও বিপ্লব তাহার নিকট একই বস্তু) গ্রহণ করিতে তাহার বাধে নাই; যদিও ধর্মানুশাসনের প্রতি এই অন্ধ আনুগত্যের উপর তিনি বিদ্রোহী অবিশ্বাসীর আভিজাত্যের একটা ছাপ দিয়া লইয়াছিলেন। "জনসাধারণের জন্য নির্মম সমষ্টিগত শৃঙ্খলনিষ্ঠা; আর মুষ্টিমেয়র জন্য স্বাধীনতা—মৃত্যুপথের স্বাধীনতা।"

সমষ্টিজীবনের নীতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি এই দুইটিকেই যাহারা রক্ষা করিতে চাহিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন লিয়ঁ বাজালজেৎ; ইহার ছিল ওয়াল্ট হুইটম্যানের বাণীর প্রেরণা। আর ছিলেন ল্যুক দুর্ত্যাঁ, স্বাধীন চিন্তাজীবীদের স্থান তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন সাধারণ সৈনিকদিগের পুরোভাগে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মধ্যে নহে। আর ছিলেন কাজিমির এদ্‌শ্মিদ। বিপ্লবের প্রয়োজনের দিক হইতেই চিন্তার স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া তিনি বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ হইতেই বিশেষ অধিকার দাবী করেন যে, বিপ্লব যদি তাহার কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয় তবে বুদ্ধিজীবীরা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে। পল কল্যাঁ চাহিলেন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে স্বাধীন ব্যক্তিদের সামাজিক কার্যের কর্মসূচী জুড়িয়া দিতে। এই কর্মসূচীর প্রধান দুইটি বিষয় হইবে: শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকার করা এবং চিন্তাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করা।

মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতাকে বহির্জগতের কর্মের মধ্যে রূপদান করিবার যে-পদ্ধতি গ্যুস্তাভ্ দুপ্যাঁ উত্থাপন করেন প্রায় সকলেই তাহা সমর্থন করেন। আন্দ্রেয়াস লাৎস্‌কো, জাক মেনিল, রেনে আর্কস এই সমর্থনে যোগ দেন। চিন্তার স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক ভিলদ্রাক

কিন্তু চিন্তাকে কর্ম হইতে পৃথকের বিরোধী ছিলেন, আজও সেই মতই পোষণ করেন। তিনি সর্বদাই পুরোভাগে রহিয়া গিয়াছেন। কাজ করিতে হইবে, কিন্তু কাজ করিতে হইবে স্বাধীনভাবে! একমাত্র পিয়ের জ্যঁা জুভই "আর্টের বিশেষ উদ্দেশ্যের" কথা তোলেন, এ-ব্যাপারে তিনি স্তেফান ৎসাইগের খুব কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু তাহার আবেগময় প্রকৃতির জন্যই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি আবেগের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করেন।

মোটের উপর বুদ্ধিজীবীদের এই সমাবেশ বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জ্ঞাপনেরই পরিচায়ক, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার দিকে যাহাদের সবচেয়ে বেশি ঝোঁক তাহারাও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। তার উপর আলোচনা চলে একটা প্রশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে, প্রত্যেকেই বিপক্ষের প্রতি মৈত্রী ও সহনশীলতার ভাব লইয়া বিতর্ক চালান, কেবলমাত্র একজন বিতর্ককালে বারবুসের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন নাই। দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই বিতর্ক যখন সভাস্থল হইতে পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিস্তৃতিলাভ করিল তখন ভাষার আর সংযম রহিল না। বারবুসের অসাধারণ আত্মসংযমের প্রশংসা আমি চিরদিনই করিয়া আসিয়াছি। সংঘর্ষের একেবারে মধ্যে দাঁড়াইয়া শত্রুর বহু আঘাত গ্রহণ করিয়াও কখনও তিনি তাহার স্থৈর্য হারান নাই। কিন্তু মার্সেল মার্তিনের এতখানি ধৈর্য ছিল না। অধীর আবেগে তিনি রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৯২২ সালের ৮ই মার্চ লা আঁতেরনাসিয়নাল পত্রিকায় এবং ২৫শে মার্চের ল্যুমানিতে পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধে (দি রিভলিউসন এণ্ড লিবার্টি; ইণ্টলেক্চুয়াল্‌স্‌ এণ্ড দি রিভলিউসন) তিনি সংগ্রাম শুরু করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিপ্লব উভয়ের জন্যই একসঙ্গে এতখানি উৎকণ্ঠা বোধ করি আর কাহারও ছিল না, এবং এই দুইয়ের মধ্যে শোচনীয় সংগ্রামের শুরু হইল তাহাতে তাহার মত এতখানি ব্যথাও বোধকরি কেহ

অনুভব করে নাই! কিন্তু যে জ্বরের আগুন তাহার মনে ও মস্তিষ্কে তখন জ্বলিতেছিল তাহার ফলে তিনি বাক্যের সংযম হারাইয়া বসিলেন। লিখিলেন ঃ

"নৈতিক সুচিতা বাঁচাইয়া আমাদের কতটুকু লাভ হইবে! (সোবিয়েৎ রাশিয়ায়) যখন এত লোক আমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ও মরিতেছে তখন তুচ্ছ সম্মানের সুচিতাকে বর্জন করিয়া বিপ্লবী দলের সঙ্গে নিজেদের মিশাইয়া দিতে আমাদের কিসের বাধা!..."

বিরুদ্ধবাদীর প্রতি (জুভ, কল্যাঁ, আর্কস, দুর্তাঁ) তাহার আঘাত অনেক সময় সম্মান ও শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া গেল; বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যকে তিনি "শিশুর আহার" বলিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত উড়াইয়া দিলেন, স্বাতন্ত্র্যরক্ষাকে বলিলেন, "প্রবঞ্চকের আত্মগোপন।" আদর্শনিষ্ঠ আন্তরিক মহাপ্রাণকে নিজের চারিপাশে টানিয়া আনিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ ভৎর্সনায় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অথচ এই সকল ব্যক্তিরই বিপ্লবের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। তিনি লিখিলেন, "বুদ্ধিজীবীরা সর্বত্র সর্বদা যাহা করিয়া আসিয়াছে আজও তাহাই করিতেছে—তাহারা আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছে। পরে আসার থেকে এখন আসাই ভাল, নচেৎ তাহারা ধ্বংস হইয়া যাক।" এই বিতর্কের সূচনা করিয়াছিলেন বারবুস্; এবং ক্লার্তে পত্রিকায় আমাকে যে আক্রমণ করা হয় তাহাতে বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এই বিতর্কে যোগদান করি। বিতর্কের সূত্রপাত হইতেই আমার ভয় ছিল বিপ্লবের পক্ষে ইহার সুফল হইবে না, (পরে মার্তিনে নিজে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন) কিন্তু মার্তিনে দুঃখ-প্রকাশ করিলেন না। তিনি যেন এই আক্রমণের মধ্যে আনন্দ পাইতে লাগিলেন। আক্রান্তদের মধ্যে আবার কেহ কেহ তাহার বিদ্রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ক্লা'র লিব্র্ (১৯২২ সালের এপ্রিল) পত্রিকায় একটি শেষ প্রবন্ধে আমি জবাব দিলাম; জবাবটি তাহার অপেক্ষা বারবুসকেই বেশি লক্ষ্য করিয়া। জবাবটির নাম 'বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবিগণ: কমিউস্ট বন্ধুদের প্রতি চিঠি।' বারবুসের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমি জানাইলাম, মার্তিনে নিজে যাহাদের নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান বলিয়া জানেন মার্তিনেই যে তাহাদের বক্তব্যকে ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিবেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। "রুশ বিপ্লবের পুরুষসিংহ-গণের" উদ্দেশে আমি বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিলাম। প্রতিক্রিয়ার অপরিমেয় শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য সম্বল লইয়া তাহারা যে ভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তাহা পরম বিস্ময়ের বস্তু। আমাদের মধ্যে এমন কে ছিল যে সহিষ্ণুতার অভাব, ভুল ও হিংসাত্মক কার্যের জন্য তাহাদের তিরস্কার করিতে পারে? "আমরা শুধু এইটুকু বলি যে, ভুলকে ভিত্তি করিয়া কোনো ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে না, দুর্ঘটনা গর্বের বস্তু হইতে পারে না, আত্মরক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে যাহার মধ্য দিয়া হিংসাত্মক নীতি উদ্ভূত হইয়া আসিবে।" চিন্তার স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার উত্থাপন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, এই আদিম প্রবৃত্তির সহিত, মনুষ্যপ্রকৃতির এই মৌলিক-শক্তির সহিত সংগ্রামে মত্ত হওয়া বিপ্লবের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হইবে। "সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের ন্যায্য দাবীর সহিত আত্মার স্বাধীনতার সমান ন্যায্য দাবীর সমন্বয় সাধনই আমাদের বর্তমান সমস্যা।" অর্থনৈতিক বস্তুবাদ যে একদল বিপ্লবীর মনের পরিধিকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাকে আমি আক্রমণ করিলাম। "মন প্রকৃতির একটি শক্তি। ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগত। ইহা ইহার নিজের নিয়ম মানিয়া চলে। একই লক্ষ্যগামী বিভিন্ন শক্তির বাধাহীন স্ফুরণের মধ্য দিয়াই বিপ্লবে ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারিত হইবে।"

কর্মরত বিপ্লবিগণের অসহিষ্ণু সংকীর্ণতাকে আক্রমণ করিয়া আমি যদি ভুল না করিয়া থাকি তবে তাহাদের কর্মের দিক হইতে দেখিয়া আমার এই অস্পষ্ট পথনির্দেশকে তাহারা যদি মূল্যহীন বলিয়া ধিকৃত করিত তবে তাহারাও ভুল করিত না। ভাবসর্বস্ব আদর্শবাদের ইহাই দোষ। কর্মক্ষেত্রের সীমান্তরেখাটির উপর যুগ যুগ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অভ্যস্ত অথচ বাস্তবের সহিত মুখোমুখি হয় নাই এমন যে আদর্শবাদ তাহা ত' অস্পষ্ট ও অবাস্তব হইবেই। নীতিজ্ঞানহীন জুয়াড়ীর হাতে পড়িয়া যখন ইহা ভাববাদের বড় বড় কয়েকটি কথার জালে জড়াইয়া পড়ে তখন তাহা যে কোনো কাজে লাগে একমাত্র ভগবানই তাহা বলিতে পারেন। 'মন' অথবা 'চিন্তা' এই দুইটি কথা হইতে যে কত বিপদের সৃষ্টি হইতে পাবে তাহা আমি পরে বুঝিয়াছি। কারণ, নিম্নমধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কপট স্বার্থপরতা অতি সহজে এই দুইটি কথাকে কাজে লাগাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন সম্পত্তি রক্ষা হয়, অপর দিকে তেমনি প্রতিক্রিয়ার সহায়তায় ও সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থহানি করিয়া নিজেদের সুযোগ সুবিধাও বাড়াইয়া লওয়া যায়।

মন যে প্রকৃতির শক্তি এ-কথা ঠিক। কিন্তু অন্যান্য শক্তির মধ্যে ইহার স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে! এই সকল শক্তির প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ অনুসারে বিপ্লব তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে নূতন জগত সৃষ্টির জন্য কর্তব্যে ও অধিকারে। সেদিন হইতে আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি যে সর্বহারা বিপ্লবের সহিত সামাজিক কর্মের একাত্মতা সৃষ্টি মনের কর্তব্য। কারণ, ইহা নিজের অগ্রগতির এমন পথ সৃষ্টি করিতে করিতে যায় যাহা কানাগলির মধ্যে হঠাৎ শেষ হইয়া যায় না। তাই যদি হয় তবে আমি বলিব গৃহযুদ্ধের যন্ত্রণাজঠর হইতে বিজয়ী হইয়া বাহিরে আসিয়া স্টালিনের দৃঢ় অথচ কমনীয় হস্তের পরিচালনায় বিপ্লব স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে।

'এক' ও 'সমস্ত'—এই দুই বিরোধী নীতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন ম্যাক্সিম গর্কি। সোবিয়েৎভূমির সাহিত্যিক গণতন্ত্রের সমস্ত বিরোধ বিতর্কের মহান বিচারক ইনি, কোনো সরকারী খেতাব ইহার নাই, কেবল নিজের প্রতিভাবলে এবং সর্বস্বীকৃত অনুশাসনের ক্ষমতা বলে ইনি সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মনন জগতকে প্রেরণা দেন, ধিক্কার দেন, শাসন করেন, পরিচালনা করেন। আজ রাশিয়ায় তাহারই চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিতেছে বৃহত্তর, ব্যাপকতর, বলিষ্ঠতর এমন একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাহা সমষ্টিজীবনের সহিত সহজেই মিশিয়া যায়, মিশিয়া গিয়া তাহাকে উন্নত করে ও নিজে উন্নত হয়, পৃথিবীতে কোন যুগে দেশে কে কবে দেখিয়াছে সমাজের মহান সেবক হিসাবে ব্যক্তিবিশেষের মহিমা এতখানি সমারোহে সমাদৃত হয়। চিন্তার ও কর্মের জন্য সমগ্র মনুষ্যসমাজের যাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাহাদের নামে নগরের নামকরণ কবে কোন রাষ্ট্র করিয়াছে? কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি (১৯২২ সাল) তখন অসহিষ্ণুতা ছিল সকলেরই মনে, যুদ্ধ অবসান হইবার সময় যে-ভয় আমি করিয়াছিলাম অর্থাৎ বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গভীর ভেদরেখা সৃষ্টি হইবে, সে ভয় আমার সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। বিপ্লবের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, স্বাধীন চিন্তার অধিকার দাবী আমরা একা করি নাই, যে বলি বিপ্লব আমাদের নিকট চাহিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমরা একা জানাই নাই; বিপ্লবের মধ্য হইতেই অর্থাৎ একনায়কত্বের আদর্শে উন্মাদ বিপ্লবীদের মধ্য হইতে বিজ্ঞতর বিপ্লবের নিকট আবেদন আমরা একা করি নাই। বিজ্ঞতর বিপ্লব বলিতে সেই বিপ্লবকেই বুঝি যে-বিপ্লব ইহার বিভিন্ন বিভাগকে সাজাইতে জানে, আর জানে কেমন করিয়া সমগ্রের সহিত স্বাধীন স্বতন্ত্র নানা বৈচিত্র্যের অংশগুলিকে সংযোগ করিতে হয়।

বারবুসের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যকে স্বয়ং গর্কি সমর্থন করিয়াছিলেন, আমাদের দুইজনেই তখন গভীর নৈরাশ্যভারে আচ্ছন্ন, অবশ্য তারপর দুইজনই চেষ্টা করিয়া এই নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিয়াছি। নিজ নিজ দেশে সংগ্রামের ব্যর্থতা হইতে আমাদের মনে এই নৈরাশ্যের জন্ম হয়। শুধু নিজের উপর নহে, রাশিয়ার উপরও যাহাতে আরও বেশি নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, রাশিয়ার ভাগ্যকে যাহাতে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন এবং নিজের ভাগ্যকে উহার সহিত মিশাইয়া দিতে পারেন সেই জন্য যখন কিছুদিনের মত গর্কি রাশিয়া হইতে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিলেন ঠিক তখন আমিও ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলাম। আমি দেখিলাম অন্ধ অবাধ্য ফ্রান্স নূতন যুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়ার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; সংঘাত সমাসন্ন, অথচ তাহার গতিরোধ করিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। ১৯২২ সালের ৩০শে এপ্রিল আমি চিরদিনের মত পারী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম।

॥ চার ॥

পর্বতমালার গভীরে অরণ্যপ্রান্তরের কোলে নিবিড় নির্জনতার মধ্যে মনকে বিভ্রান্ত করিবার মত কিছু ছিল না। আমার অশ্রান্ত আত্মার জন্য কর্তব্যপথের অনুসন্ধানে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম। আমার এ-আত্মা ইউরোপের আত্মা, পৃথিবীর আত্মা; মনুষ্যসমাজের একটি সমগ্র যুগের সাংঘাতিক আলোড়নে সে তখন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। সবই ত' আপেক্ষিক, তাই পারী হইতে বিচ্ছেদ আমাকে বহির্জগতের আরও কাছে আনিয়া দিল। 'ভিলেনেভ'এর সাধনাভবনে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখান হইতে কয়েক মিনিট গেলে সিমপ্লন গিরিবর্ত্মের উপর দিয়া সেই বিরাট আন্তর্জাতিক রাস্তা

গিয়াছে, যে-রাস্তা বহিয়া একদিন অবিশ্রাম গতিতে ইউরোপের রক্ত বহিয়া চলিয়াছিল। লণ্ডন-পারী হইতে ব্রিন্দিসি, ব্রিন্দিসি হইতে ওরিয়েণ্ট; এবং ঐ পথেই ঐ রক্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। এখানে বসিয়া কেবলমাত্র ইউরোপ নহে, ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার ছাড়াইয়া এশিয়ার সহিতও সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলাম। তখন আমার দৃষ্টির পরিধি ও বন্ধুত্বের সীমানা বাড়িয়া গিয়াছে বিপুলভাবে। একদিকে আসিয়াছে ভারতবর্ষ ও জাপান, অন্যদিকে ইবারো—লাতিন আমেরিকা। (অপর আমেরিকার সহিত আমার পরিচয় বহু পূর্ব হইতেই ছিল।)

লেমাস হ্রদের তীরে আসিয়া বাস আরম্ভ করিবার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধী, লাজপত রায়, জওহরলাল নেহরু, ডাঃ আন্‌সারী, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলাম। সুদূর প্রাচ্য এবং বিশেষত জাপানের কয়েকজন তরুণ নেতার সহিতও আমার সহযোগ হইল। কিন্তু এইখানেই আমি থামিলাম না; মেক্সিকো, আর্জেণ্টাইন ও পেরুর জনজীবনও আমার মনকে অধিকার করিল। মেক্সিকোর জনশিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জোসে ভাসকখেলস, লা প্লাটা (আর্জেণ্টাইন) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও আইনবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আলফ্রেডো এল প্যালাসিয়স্‌, পেরুর অত্যাচারী শাসক লেগুইয়া কর্তৃক নির্বাসিত ভিক্তর আর হায়া দেল্লা তোরে—এই সকল আদর্শবাদী কর্মযোগীদের সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। অবিশ্রাম পত্রবিনিময় ত' চলিতে লাগিলই, অধিকন্তু মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা ও জাপানের পত্রিকাগুলিতে আমার বহু প্রবন্ধও প্রকাশিত হইল।

আমার পক্ষে ইহার ফল হইল এই যে প্যান-ইউরোপবাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমার একেবারেই চলিয়া গেল। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যুদ্ধের মধ্যে আমার

মানসিক বিবর্তনের একটি স্তর, এ-স্তর এখন আমি স্পষ্টই ছাড়াইয়া আসিলাম। ঠিক এই সময়ে আমার এই পরিত্যক্ত স্তরে স্বভাবত অনুন্নত সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ কাউন্ট কাওেনহোভে কালের্গি—তাহার 'প্যান-ইউরোপা' প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে যোগ দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি জবাব দিলাম : "না, সময় সরিয়া গিয়াছে···ইউরোপীয় অতি-জাতীয়তাবাদের দিন আর নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সম্মিলিত করিবার জন্য আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এমন কতকগুলি অশুভ লক্ষণ তখন আমার চোখে পড়িতে শুরু করিয়াছিল যাহার ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে একটা সাংঘাতিক বিরোধের সম্ভাবনায় আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। এতখানি আশঙ্কার কারণ হয় ত' তখনও ছিল না, তথাপি আমার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। এবং এই সম্ভাবনা যাহাতে বাস্তবে পরিণত হইতে না পারে সেইজন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছিলাম। সাধারণ শত্রু বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে আমি প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি বিশ্বসঙ্ঘ গঠনের চেষ্টায় ছিলাম (মার্কিন সাংবাদিক হাবমান বার্ণস্টিন-এর চিঠির জবাব, ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৫ সাল এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব, ২০শে মে, ১৯২৫ সাল)।

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে অবশ্য আমি আমার স্বদেশের সংকটের কথা বিস্মৃত হই নাই। রুর অধিকারকে আমি তীব্রভাষায় নিন্দা করিলাম (জুলাই, ১৯২৩), এবং ফরাসী ও জার্মানীর মিলন সাধনের জন্য ও জয়ী জাতিগণ কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ফ্রান্সে আমি একটি আন্দোলন চালাইতে লাগিলাম। এই ব্যাপারে সহৃদয়তা, মানবতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি—সবদিক দিয়াই আমার এই আন্দোলন পরিপূর্ণ সমর্থনের যোগ্য। তখন একথা অতি সহজেই বোঝা যাইতেছিল

যে যুদ্ধ থামিয়া যাইবার এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত শক্তির সমন্বয় অব্যাহত থাকিতে থাকিতেই ফ্রান্স যদি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়া অগ্রসর না হইয়া আসে তবে জার্মানীকে সেই হতাশা ও উন্মাদ হিংসার পথে ঠেলিয়া দিবে। হিটলার আজ এইপথেই তাহাকে আনিয়াছে।

স্পেন, জার্মানী ও অন্যান্য দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে-সকল বুদ্ধিজীবীদের তখন নির্যাতিত, কারারুদ্ধ কিংবা নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের উদ্ধারের আন্দোলনেও আমি যোগ দিলাম।

কিন্তু শ্রমিক জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধিজীবী কুলীন সম্প্রদায়ের উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ আমি করিলাম না, অথচ আমার লেখকবন্ধুদের অনেকেই মসি-কৌলীন্যের অভিমানে সর্বাগ্রে সেবা ও মনোযোগ দাবী করিতে লাগিলেন। লুই রুজিয়েরের সহিত ইহা লইয়া আমার বিতর্ক হয়; এই বিতর্ক প্রসঙ্গে স্পষ্ট ও তীব্রভাষায় আমি একথা জানাই যে, বুদ্ধিজীবীর জন্য বিশেষ সম্মান ও সেবা দাবী করার ফলে বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের মধ্যকার যে ব্যবধানপ্রাচীর আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা আবার খাড়া করা হইবে; দুইটি শ্রেণী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ নিজেদের মধ্যে পুঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল তাহা দূর করিয়া পরস্পরকে সহযোগিতায় সম্মিলিত করিতে চাহিতেছিলাম। ঠিক এমনিভাবেই চাহিতেছিলাম বহির্জগত হইতে ইউরোপের বিপুল বিচ্ছেদকে অর্থাৎ প্যান-ইউরোপকে বিলুপ্ত করিয়া জগতের সমস্ত জাতির শাশ্বত সক্রিয় সহযোগিতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে। (সেদিনের এই বাস্তব সংস্পর্শহীন চমৎকার ভাবাবেগগুলি আজ কত ব্যর্থ ও ভ্রান্তই না মনে হইতেছে।) লুই রুজিয়েরের সহিত আমার যে পত্র বিনিময় হয় তাহা হইতে কতকগুলি অংশ তুলিয়া দিলেই আমার তখনকার দিনের চিন্তা-ধারা স্পষ্ট হইবে। দার্শনিক লুই রুজিয়ের ছিলেন একজন স্বাধীন ও

নির্ভীক চিন্তাবীর। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাহার বিশিষ্ট মতবাদ ছিল। তিনি তখন এমন একটি সঙ্ঘ গঠন করিবার কথা ভাবিতেছিলেন যাহার উদ্দেশ্য হইবে লাতিন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন; কারণ তিনি বলিতে চাহিতেছিলেন লাতিন সংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। তাহার উপর এই সঙ্ঘ সংগ্রাম চালাইবে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য; কারণ রুজিয়েব মতে "জনসাধারণের সমস্যা অপেক্ষা তাহাদের সমস্যাই আগে বিবেচিত হওয়া উচিত।"

আমার নিকট রুজিয়ের লিখিলেন: "সমস্ত বিষয়টির মূল অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলাম সামাজিক সমস্যাকে নৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করিবার কোনো কারণ নাই, অর্থাৎ সামাজিক সমস্যার সমাধান যে সর্বদাই নীতির দিক দিয়া সন্তোষজনক হইবে তাহার অর্থ নাই। জীবনের মত সমাজও 'ভাল মন্দের ঊর্ধ্বে'; কিন্তু আমার বিশ্বাস সামাজিক সমস্যা একটি সাংস্কৃতিক সমস্যা। অর্থাৎ এমন সমাজব্যবস্থা থাকিতে পারে নৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে হয়ত' তাহা পুরাপুরি সন্তোষজনক হইবে না, অথচ সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের প্রসাদের পক্ষে যাহা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে—কলা, বিজ্ঞান ও মানবতা—যাহাদের বাদ দিয়া জীবনের কোনো অর্থই হয় না তাহাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিবে।" সমাজের এই বাছা কয়েকজনকে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য রুজিয়ের আমাকে তাহার পবিত্র সেনাদলে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন।

তাহার এই বিশ্বাসের মধ্যে যে একটা মহত্ত্ব ও মহিমা না ছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে আভিজাত্যের যে অপরিমেয় দম্ভ ছিল নিজেদের গোষ্ঠীর বাহিরের জীবন সম্পর্কে যে বিপুল উপেক্ষা ছিল তাহা আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই আমি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলাম (১৪ই নভেম্বর, ১৯২৪):

"আপনার আন্দোলনের মূল নীতির সহিত আমি একমত হইতে পারি না, ইহার পশ্চাতে এমন একটি সংস্কৃতিগত আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় যাহা সমর্থন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আপনার সমস্ত চিন্তাধারার পশ্চাতে আমি এমন একজন রোমানকে দেখিতেছি যে রোমের ধ্বংস আসন্ন মনে করিয়া এই ধ্বংসের হাত হইতে রোমকে বাঁচানো ছাড়া আর কোনো কথাই চিন্তা করিতেছে না। আমার নামের মধ্যে রোমান কথাটা থাকিলেও আমি রোমান নহি। লাতিন সভ্যতার সহিত আমার আদর্শকে এক করিয়া দেখিতে আমি রাজি নহি। এমন কি ফ্রান্সেও এই সভ্যতা বহু জাতির মধ্যে একটি মাত্র জাতির নিজস্ব জিনিস।

"একাধিক বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে ফ্রান্স গঠিত। লাতিন জাতি এই সম্মিলিত সংগীতের একটি বিশিষ্ট সুর ছাড়া আর কিছুই নহে। ফ্রান্স যদি আজ রোমান কিম্বা এমন কি ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতায় পরিণত হয় তবে উহার প্রতি কলানুসন্ধিৎসুর কৌতূহল ছাড়া আমার আর কোনো মনোভাব থাকিবে না। আমি এ-কথাও বলিতে চাহি যে ফ্রান্সের দলত্যাগ সত্ত্বেও ইউরোপ যদি জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা না করে তবে ইউরোপের কোনো ব্যাপারে আমি আর নিজেকে জড়িত করিব না। ইউরোপ তখন হইবে আদর্শভ্রষ্ট। ইউরোপ হইতে আরও বৃহৎ আরও জীবন্ত কেহ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করুক ও তাহার আদর্শ গ্রহণ করুক। গ্রীক লাতিন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। কেবলমাত্র গ্রীক-লাতিনরাই এই শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। জাতির আভিজাত্যকে আমি স্বীকার করি না, আমি জাত মানি না।

"মননজীবী কুলীন সম্প্রদায়ের অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান ও মানবতার কারবার যাহারা করেন তাহাদের বিকাশলাভের সুযোগ না থাকিলে

জীবনধারণের কোনো অর্থই থাকে না”—একথা মানিয়া লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রথম কারণ, বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার 'কষ্ট' আজও আমার পক্ষে আনন্দের বস্তু, এবং দ্বিতীয়ত, আমি পূর্বোক্ত কুলীন সম্প্রদায়ের একজন বলিয়াই আমার সম্প্রদায়কে এই স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে আমি নারাজ, যাহা আমাদের অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় তাহা ছাড়া জীবনধারণের কোনো মূল্যই নাই—ইহা মিথ্যা কথা। জীবনধারণের মূল্য হয়ত' আমাদের কাছে নাই, কিন্তু আমরাই ত' সমগ্র মানবসমাজ নহি ; যদি আমরা বাঁচিয়া না থাকি তথাপি আমাদের ছাড়াও যাহারা বাঁচিয়া রহে তাহাদের এই বাঁচিবার কারণ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

“আপনি আমাকে সেই যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যখন বর্বরদের আক্রমণের হাত হইতে 'নিজেদের পবিত্র পৈতৃক সভ্যতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন কেয়েতিউস, সিমাকুস্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন!' আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ঠিক ঐ যুগেই, ঐ সময়েই স্যাল্‌ভিয়েন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'আমাদের অপেক্ষা বর্বরদের অবস্থা ভাল কেন?' আরও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বহু সম্ভ্রান্ত রোমক পরিবারের বংশধরেরা বর্বরদের জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এ-কথাও আপনাকে স্মরণ করিতে বলি যে, যে-সকল রোমকগণ বর্বরদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন থিয়ডোসিয়ার আইনে তাহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিবার বিধান ছিল, তাহা সত্ত্বেও দলে দলে রোমকগণ বর্বরদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

“পাশ্চাত্যের মননজীবিগণ আজ সেই স্মরণীয় দৃষ্টান্তের কথা ভাবিয়া দেখুন। সভ্যতা ও মনস্বীশ্রেণীকে বাঁচাইতে হইলে অবজ্ঞাত জনসাধারণের মনোযোগ তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। আজও মনস্বীশ্রেণীর বিকাশলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা জনসাধারণের বিকাশ লাভ; জনসাধারণের ভাগ্যের উপর বুদ্ধিজীবীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে!

"বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের মধ্যকার ভেদরেখা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই দুই দলের মিলনের জন্য আমি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছি, লাভ হইয়াছে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর শত্রুতা। যুদ্ধের পর ফ্রান্সে বুদ্ধিজীবীরা যে-ভাবে কৌলীন্যের দম্ভে জনজীবন হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। সংকট আজ সমাসন্ন…'

আমার মনে হয় এই সতর্কবাণী ও বিশ্বাসের ঘোষণা এখানে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে। আমার তখনকার দিনের মনের অবস্থা এই চিঠিতে যেমন ব্যক্ত হইয়াছে অন্য কোনো রচনায় তাহা হয় নাই। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আদর্শ ও সামাজিক শক্তি বিচার করিয়া যতদিন না পর্যন্ত আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া 'বর্বরদের' দলে যোগ দিই, ততদিন পর্যন্ত এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আমার দিন কাটে। কারণ, আমি বুঝিয়াছিলাম ইহারাই ভবিষ্যতের সত্যকার অগ্রদূত এবং মানুষের মুক্তি ও পুনরুজ্জীবনের আশা একমাত্র ইহাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

যখনকার কথা লিখিতেছি (১৯২২—১৯২৭) তখনও আমার মন সন্দেহের অন্ধকারে ব্যাকুল, প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বুঝিতেছিলাম 'ইউরোপের বুকে ঝড়' আসন্ন। বাতাসে সে-ঝড়ের গন্ধ যেন আমি দুই নাসারন্ধ্র ভরিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলাম। আর এই ঝড়ের হাত হইতে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম, আমরা নিজের জন্য ততটা নহে যতটা আমার প্রিয়তমদের জন্য আমার ইউরোপের জন্য। ষাট বৎসর বয়সে তখন আমি আমার জীবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, নিজের জন্য ভয় আমার খুব বেশি ছিল না।

এই সময় আমার চোখে পড়িল ভারতের বুক আলোড়িত করিয়া শীর্ণ অথচ অনমনীয় এক মহাত্মা আত্মিক বলের ঝড় তুলিয়াছেন।

ইউরোপের বুকে এই আলোড়ন তুলিবার জন্ম আমি সংগ্রাম শুরু করিলাম। মহাত্মা গান্ধী যে 'নীরব ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরের' শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছিলেন আমার ক্লেরাঁবোল পুস্তকে আমিও সেই শক্তির কথা লিখিয়াছি। নিজের জীবনের মধ্য দিয়া তিনি এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া সমগ্র জাতিকে নিজের অনুগামী করিয়াছিলেন।

গান্ধীর আদর্শ তখন আমার মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তার সম্বন্ধে যে ছোট বইখানি লিখি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই মে মাসে লণ্ডনে সি. এফ. এণ্ডরুজের সহিত আমার পরিচয় হয়; এবং ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে ডব্লিউ-ডব্লিউ পিয়ার্সনের সহিতও আমার পরিচয় হয়। সাউথ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ঐতিহাসিক সংগ্রামে ইহারা ছিলেন তার দুইজন সহকর্মী। আমার সহিত দেখা হইবার কিছুদিন পরেই শোচনীয়ভাবে পিয়ার্সনের জীবনাবসান হয়। ইহাদের দেখিয়া আমার যীশু খ্রীস্টের প্রথম প্রচারকদের কথা মনে পড়ে। সেই বলিষ্ঠ সহজ প্রশান্তি ইহাদের মধ্যে আমি দেখিতে পাই। এই সময় একজন মহিলা আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, ইহার নাম মিস্ ম্যাডেলা ইন্‌স্লেড, ইনি একজন ইংরেজ এডমিরালের কন্যা। না জানিয়া যে গুরুকে তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহার সন্ধান আমি তাহাকে বলিয়া দিই। ইনিই পরবর্তীকালে গান্ধীজীর মার্থা ও মেরী হন।"

রবীন্দ্রনাথ ও স্যার জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব, কালীদাস নাগ ও লাজপত রায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, ভারতবর্ষের সহিত প্রচুর পত্রবিনিময় এবং বাংলা দেশের পত্রিকাগুলি পাঠ করিবার ফলে আমি ভারতীয় মনে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করিলাম। সে-মনের সহিত আমার মনের কোনো কোনো বিষয়ে গভীর সাদৃশ্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আমার ভাবজগতের এমন অনেক রহস্যলোক ছিল যাহাদের এতদিন ভাবিয়া আসিয়াছি কেবলমাত্র ফরাসী চিন্তাজগতেরই জিনিস; সেদিন দেখিলাম ভারতবর্ষেও উহার দোসর মেলে। পরে আমার রামকৃষ্ণের জীবন চরিতের ভূমিকায় আমি এই আবিষ্ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি। অবশেষে জেল হইতে বাহিরে আসিয়া ১৯২৪ সালের ২২শে মার্চ তারিখে গান্ধী আমার নিকট যে প্রথম পত্র লেখেন তাহাই আমাদের বন্ধুত্বের পূর্বসূচনা। মারাত্মক ব্যাধি হইতে উঠিয়া তিনি তখন আরোগ্যের পথে। তখন হইতে কয়েক বৎসর আমি ইউরোপে গান্ধীর ভাবাদর্শের মুখপাত্র হইলাম। গান্ধীর প্রবন্ধ সংকলন ইয়ং ইণ্ডিয়ার (জুলাই, ১৯২৪) ফরাসী সংস্করণের যে ভূমিকা আমি লিখিয়া দিই তাহার মধ্য দিয়া ইউরোপের সমাজসংগ্রামের সহিত গান্ধীজীর ভাবাদর্শকে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যেও রুশ বিপ্লবের আদর্শকে এবং সংগ্রামে নিমগ্ন থাকিয়াও নূতন জগত সৃষ্টির এই অতিমানবীয় প্রচেষ্টাকে আমি কখনও দ্বিতীয় আসন দিই নাই। ভারতের সহিত মস্কোর, আগুনের সহিত জলের মিলন সাধনের আপাতবিপরীত কাজে আমি আত্মনিয়োগ করিলাম। ইয়ং ইণ্ডিয়ার ভূমিকাতেও আমি লিখিলাম: "আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও বিপ্লবীদের হিংসার মধ্যে দূরত্ব ততটা নহে যতটা বীরের মত অহিংস প্রতিরোধ এবং চিরন্তন যো-হুকুম দারের কৃতদাসসুলভ মনোভাবের মধ্যে। এই মনোভাবই প্রত্যেক অত্যাচারী শাসকের দুর্গস্তম্ভ রচনা করে, সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াকে কায়েমী করিয়া রাখে।"

গান্ধীর আদর্শকে কেহ যে কাপুরুষ ক্লীবের শান্তিবাদিতার সহিত এক করিয়া দেখিবে ইহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না। আমি সর্বদা তাহার 'সংগ্রামশীলতার' উপর জোর দিতাম, জোর দিতাম গান্ধীজী

কর্তৃক বারম্বার 'তরবারি' কথাটি ব্যবহারের উপর। ইহা তাহার মতে ইস্পাতের তরবারি নয়, তরবারির বিরুদ্ধে তরবারির প্রয়োগ নয়। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সত্যের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আত্মদানের মহান অস্ত্র হিসাবেই গান্ধী 'তরবারি' কথাটি ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্বে জঁ। ক্রিস্তফ পুস্তকের শেষে ফ্রান্স ও জার্মানীকে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়া লিখিয়াছিলাম, "তাহারা যেন পাশ্চাত্যের দুইটি ডানা! একটি ভাঙ্গিয়া গেলে আরেকটিও অচল হইয়া পড়িবে।" ঠিক তেমনইভাবে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সংগ্রামশীল সাম্যবাদ এবং গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত অহিংস অবাধ্যতা (আইন অমান্য আন্দোলন) একই বিপ্লবের দুইটি বিরাট ডানা হিসাবেই আমি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। আমি চাহিয়াছিলাম ডানা দুইটি যেন পরস্পরের সহিত সহযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে পারে। এ প্রচেষ্টা আমার ব্যর্থ হইয়াছে এবং এ ব্যর্থতায় আমি বিস্মিত হই নাই। এ ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী, কারণ যে দুইটি মতবাদকে আমি মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারা আপস জানিত না, প্রত্যেকটিই নিজেকে সত্যের একমাত্র ধারক ও বাহক হিসাবে মনে করিত এবং অপর মতবাদের মধ্যকার সত্যকে শত্রু বিবেচনা করিত। আমি কিন্তু একটি বিশেষ মতবাদ দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়াও ছিলাম একজন ইউরোপীয় অবিশ্বাসী। আমাদের অঞ্চলে একটা সাধারণ প্রবচন আছে, "যে সন্দেহ করে সে কখনও মরে না"। কাঁচা ফলের আস্বাদের মত যেমন কষায় তেমনি চমৎকার এই কথাটি। কোনো শক্তিশালী সামাজিক বা ধর্মগত মতবাদকে আমি কোনোদিন অন্ধ বিশ্বাসের অচলায়তন হিসাবে দেখি নাই, দেখিয়াছি মানুষের অগ্রগতির পথনির্দেশকারী মৌলিক বিধান হিসাবে। গান্ধীপন্থী

ভারতবর্ষের ও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দুইটি মতবাদ ছিল আমার কাছে দুইটি পরীক্ষা, দুইটি বৃহত্তম, প্রবলতম পরীক্ষা—যে দুইটি পরীক্ষা, আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে মানুষের পৃথিবীকে টানিয়া আনিতে পারে। গান্ধী নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি ইহাও ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম এই দুই মতবাদের শক্তি ধ্বংসের হাত হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার পক্ষে খুব বেশি হইবে না। অতএব, পরস্পরকে ধ্বংস না করিয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাহারা কি সম্মিলিত হইতে পারিত না ? এই মিলনের চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এই চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত নই।

গান্ধী সম্পর্কিত পুস্তকখানির রচনা যখন আমার কেবল শেষ হইয়াছে তখন লেনিনের মৃত্যু (১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী) গভীর শোক ও সম্ভ্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

তাহার স্মৃতির উদ্দেশে আমি দুইটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাইলাম ইজভেস্তিয়া পত্রিকায়। একটি টেলিগ্রাম করিয়া অপরটি চিঠিতে। বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে সোস্যাল-রিভলিউশনারীদের পক্ষ লইয়া ইতিপূর্বে একাধিকবার আমি লড়িয়াছি (বিশেষত "রুশ বিপ্লবের পিতামহী" ক্যাথারিন ব্রেস্কোভ্স্কায়ার নিকট হইতে একটি আবেদন পাইবার পর), এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের ফল যে কত শোচনীয় হইতে পারে ইতিপূর্বে একাধিকবার তাহাও জনাইয়াছি। তারপর ১৯২৫ সালে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় 'হোয়াইট'দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমি যোগ দিই সেকুর রুজ অ্যাঁতেরনাসিয়নাল-এর সহিত ! এ-প্রতিবাদ 'সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত অত্যাচারিতদের পক্ষ সমর্থন।' ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এস. আর. আই-র সেক্রেটারীর জন্য আমি ঐ শ্লোগানটি লিখিয়া পাঠাই।

চিন্তার ও সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই

ছিল এই অভিযানের মূল কর্তব্য। মস্কোর স্টেট একাডেমী অব সায়েন্স হইতে প্রেরিত একটি ভাষণের দীর্ঘ জবাবে আমি এই কর্তব্যেরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করি ঃ

"সত্যকার বিপ্লবী মনোবৃত্তি বলিতে আমি তাহাকেই বুঝি যাহা জীবনের বিভিন্ন রূপকে জমাট বাঁধিতে দেয় না অথবা এই সব রূপের মধ্যে জীবনের ধারাস্রোতকে রুদ্ধ হইতে দেয় না। সত্যকার বিপ্লবী মনোবৃত্তি কখনও সামাজিক মিথ্যাচারকে সহ্য করে না। যে সমাজ ধ্বংস করিয়া সে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সমাজেরই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সমাজ যে অন্ধ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে তাহার বিরুদ্ধে এই বিপ্লবী মনোবৃত্তির সংগ্রাম চলে চিরদিন। যেমন বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধ তেমনই শ্রমিকবিপ্লবের নূতন সংস্কারের বিরুদ্ধেও সে অস্ত্র ধারণ করে। কোনো কিছুকেই ইহা পরম পবিত্রজ্ঞানে অন্ধভাবে গ্রহণ করে না। প্রত্যেক সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপই ইহার চোখে চিরন্তনের বুকে একটি সাময়িক রেখা মাত্র। এই বিপ্লবী মনোবৃত্তি হইতে যে আর্টের জন্ম তাহার কাজ সর্বপ্রকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। পূর্ণ সত্য···। এই পূর্ণ সত্য লাভ করিবার পথে বহুবার আমাদের শ্রমিক বিপ্লবীদের সাথী হইতে হয়। কিন্তু আমরা স্বাধীন সাথী। আমরা খাতায় নাম লিখাই না। আমরা একটি শ্রেণীর প্রভুত্বলাভের জন্য সংগ্রাম করি না, আমাদের সংগ্রাম সর্বমানবের জন্য। কোনো শ্রেণী শসন করিবে অথবা শাসিত হইবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না···"

বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে কথাগুলি সত্য (বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্য কথা বলা কত সহজ)। কিন্তু বাস্তবের সহিত ইহার মিল নাই। প্রথমত, শ্রমিকবিপ্লব কোনো এক শ্রেণীর প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম করে না, সে সংগ্রাম করে সকলের জন্য। আত্ম-

রক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই সে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রেণীসংগ্রামের এই প্রকৃতি দেখিয়া লোকে ভুলিয়া যায় যে, সমস্ত শ্রেণীবিভেদকে বিলুপ্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য, ন্যায় সাম্যের ভিত্তিতে রচিত মানবসমাজই ইহার লক্ষ্য। এই সংগ্রামে যাহারা তখন উন্মত্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহারা ইউরোপে দূর হইতে যেসকল বিপ্লবী এই সংগ্রাম দেখিতেছিলেন তাহারা আরও বেশি ভুল করিয়া সংঘর্ষের (সাময়িক) হিংসার দিকটার উপর একান্তভাবে জোর দিয়াছেন এবং এই ভ্রান্ত ধারণা গড়িয়া উঠিতে দিয়াছেন যে, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বই বিপ্লবের লক্ষ্য অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি বেদনাদায়ক অথচ অপরিহার্য স্তর মাত্র।

অথচ বিপ্লবের মধ্যে স্বাধীনতার কথা বলিতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু এ-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিবে কে? বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লব ইহা দিতে পারে না। সংগ্রামে নামিয়া ইহার একমাত্র কাজ জয়লাভ করা। একমাত্র কঠোর শৃঙ্খলা দ্বারাই ইহা সম্ভব। এমন কোনো সেনাবাহিনী কে কবে দেখিয়াছে যেখানে প্রত্যেক সৈনিক খুশিমত গুলী ছুড়িতে পারে? যাহারা এই ধরনের যোদ্ধা হইতে চাহে তাহাদের নিজের জীবন সংশয় করিয়া এই কাজে নামিতে হইবে। দুইপক্ষ হইতেই তাহাদের দিকে গুলী আসিবার ভয় আছে অথচ ইহাতে কোনো পক্ষেরই সুবিধা হয় না, মনের স্বাধীনতার আদর্শেরও কোনো সুরাহা হয় না।

স্বাধীনতার আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্যও যদি তাহারা গুলী বুক পাতিয়া লইতে রাজি থাকিত! এই 'স্বাধীন মনস্বী' ও 'স্বাতন্ত্র্যবাদীদের' এই কয়বছর এত বড় করিয়া দেখিয়া যে-ভুল করিয়াছিলাম সে-ভুল আমার এবার ভাঙিল গভীর আশাভঙ্গের মধ্যে। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিতেই এই মনস্বীদের অধিকাংশই অন্ধকারে আত্মগোপন করিলেন এবং

বর্তমান সমাজব্যবস্থার পশ্চাতে আশ্রয় নিলেন। নীরব ও সাবধানী হইয়া থাকিবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া সমাজও তাহাদের ভার গ্রহণ করিল!
যোগং যোগ্যেন যোযয়েৎ। মনের পরিধির মধ্যে মন রহিল স্বাধীন। আবার এই মনের স্বাধীনতার রক্ষাকর্তার বাকি পৃথিবীটাকে শাসন ও শোষণ করিবার স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ রহিল। মনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল বটে কিন্তু মনের বাহিরে বৃহৎ পৃথিবীর জনগণ, জাতিগণ সম্পর্কে তাহাদের কোনো উৎকণ্ঠাই রহিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী ত' তাহারা নহে। জীবনের সহিত কেমন করিয়া আপস করিতে হয় তাহা তাহারা জানে। চাকর হিসাবে তাহারা খুবই চমৎকার।
লা'ম আঁশাঁতে (বিমুগ্ধ আত্মা) পুস্তকের শেষ পর্বের আগের পর্বে আমি আমার তিক্ততা প্রকাশ করিয়াছি। তরুণ মার্কের "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মরুভূমির মধ্যে পথ খুঁজিয়া ফেরার অভিজ্ঞতা" আমার নিজের অভিজ্ঞতা। কিন্তু মার্ক হইতে এক বিষয়ে আমার সুবিধা ছিল বেশি! আমার পশ্চাতে ছিল দুঃখযন্ত্রণাদীর্ণ ষাট বছরের জীবন; আমার চামড়া ছিল শক্ত।

॥ ছয় ॥

মার্ক ও আনেৎ তখনও পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ১৯২৫ সালের অক্টোবর হইতে ১৯২৬ সালের মে মাসের মধ্যে আমার 'মাতা ও পুত্র' পুস্তকের রচনাকাল।
লা'ম আঁশাঁতে পুস্তকের শেষ পর্বকে কার্ল র‍্যাডেক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আগেকার কয়েক পর্বে "আমি আমার নায়িকাকে একটি অন্ধ গলির মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছি।" আর ইহাও লেখেন যে, "কাহিনীটি লইয়া কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা লেখক নিজে জানিতেন না বলিয়াই গল্পের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত

হইয়াছে।" ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, 'মাতা ও পুত্র' পুস্তকে মূল বক্তব্য হইতেছে যুদ্ধকে অস্বীকার। এই অস্বীকৃতি এখনও আজও পর্যন্ত আমার সমস্ত সামাজিক মতবাদের ভিত্তি। এবং শুধু আমার নহে আমার সোবিয়েৎ বন্ধুদেরও বটে।

আজ সর্বপ্রকার সামাজিক অগ্রগতির প্রথম ও প্রধান শর্ত হইতেছে যুদ্ধের বিরোধিতা। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে গত দশবৎসর ধরিয়া যে মৈত্রীবন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে এই যুদ্ধবিরোধিতা। এবং এই মৈত্রীবন্ধনের ফলেই ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমস্টার্ডম আন্দোলনের সহায়তায় সোবিয়েৎ ইউনিয়ন রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করে। অতএব এখানে কোনো কানাগলির প্রশ্ন ছিল না, বরঞ্চ ছিল তাহার বিপরীত। কিন্তু সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হইতে একটি বিরতি তখন আসিয়াছিল। বইএর শেষ কয়পাতার মধ্যে আনেৎ ও মার্ক এ-কথা ভালভাবেই বুঝিয়াছিল যে এই বিরতি সাময়িক বিশ্রাম মাত্র।...আত্মোৎসর্গের পালা তখন শেষ হইয়াছে—মার্ক ও আনেৎ জানিত ইহার জন্য তাহাদিগকে মূল্য দিতে হইবে, ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাস হইতেই 'মাতের দালেইরস' পুত্রের শোক অগ্রিম বহন করিতে শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঘাতকের খড়্গ যে কখন কোথায় নামিবে, শত্রু যে কে—তাহা তাহাদের কেহই তখনও দেখিতে পায় নাই। অবিলম্বে স্পষ্টভাবে শত্রুর রূপ চিনিবার অবস্থা তাহাদের ছিল না। তখনও তাহারা বুঝিতে পারে নাই কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, কাহার সহিত চূড়ান্ত সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইবে। (কারণ, 'মাতা ও পুত্রের' এই পর্যায়ে সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতই শত্রু বলিয়া প্রতিভাত হয়। পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ ভাল লোকেই আজও এই পর্যায়ে

রহিয়াছেন। কিন্তু এই শত্রুর রূপ তাহাদের চোখে অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ, এই শত্রুকে তাহারা সর্বত্র দেখিতে পাইতেছেন; এবং যদিও এই শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য তাহারা নির্ভীকভাবে প্রস্তুত হইতেছেন, তথাপি জানেন না আঘাত ঠিক কোথা হইতে আসিবে এবং শত্রু ঠিক কোন রূপ পরিগ্রহ করিবে)।

তখন (১৯২৫ ও ১৯২৬) ইতালীয় ফাশিজম্-এর কল্যাণে শত্রুর চেহারা আমাদের চোখে পড়িতে শুরু করিয়াছে। ১৯৩৩ সালের ১০ মে পর্যন্ত আমাদের আর দেরি করিতে হইল না, যদিও কার্ল র‍্যাডেক-এর মতে তখন হইতেই 'মানবতা-ধর্মী' লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ঐদিনেই জার্মান ফাশিস্টরা তাহাদের বই পোড়াইয়াছে; এই দাহকার্যে শ্রমিক পার্টির বই ও পূর্বোক্ত লেখকদিগের বইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নাই।

কিন্তু ফ্রান্সে আমরা আমাদের ইতালীয় ভ্রাতৃগণের অপমান ও নির্যাতনকে আরও বেশি অনুভব করিয়াছিলাম, এবং ইহা কার্ল র‍্যাডেক-নির্দিষ্ট তারিখ হইতে প্রায় ৮ বৎসর পূর্বে। আমাদের দুইটি জাতির মধ্যকার বন্ধন এত নিবিড় যে, একের উপর আঘাত আসিলে অবশ্য সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া ওঠে। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে যৌবনে ইতালী আমার মনের অনেকাংশ জুড়িয়া ছিল। আমার মানসজীবনে ও চিন্তা-জগতে, আমার সমস্ত প্রীতিবন্ধনের মধ্যে সে-দেশের আসন এতখানি বিস্তৃত ছিল যে, তাহার ভাগ্যকে নিজের ভাগ্যের সহিত মিশাইয়া না দেখিবার কোনো উপায় আমার ছিল না। ১৯২৬ সালের ১০ই জুন মাত্তেওত্তিকে যখন হত্যা করা হয় আমি যেন তাহাতে আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করিলাম। ১৯২৬ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে গুপ্তঘাতকের আক্রমণে আমেন্দোলা যখন নিহত হন ক্যোতে, ক্রোধে আমি তখন অস্থির হইয়া উঠি। এই আমেন্দোলাই ইহার কয়েকমাস

পূর্বে তাহার 'লিবের আমিকোরুম' পুস্তকে স্বহস্তে নিজের নাম ও আমার প্রশংসাবাণী লিখিয়া আমার ষষ্ঠিতম জন্মতিথিতে আমাকে উপহার পাঠাইয়া ছিলেন! হত্যাকারীকে আন্তরিক অভিশাপ দিয়া, গভীর শোক জানাইয়া ১৯২৬ সালের ২২শে মে আমেন্দোলার পুত্রকে আমি একটি চিঠি পাঠাই; ফাশিস্ট সেন্সরের কবলে পড়িয়া সে-চিঠি সম্ভবত যথাস্থানে পৌছায় নাই। তখন আমি ইতালীর নিপীড়িত যুবক সমাজ ও নির্বাসিতগণের সহিত অনবরত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতাম। শুধু ইতালীয়দের উপর আঘাত হানিয়াই ইতালীয় ফাশিজম্ ক্ষান্ত হইল না, ইউরোপের বিরুদ্ধেও তাহার আঘাত উদ্যত হইল, মুসোলিনী যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া হুঙ্কার দিতে লাগিলেন। হিটলার যেমন যুদ্ধের অভিপ্রায় গোপন রাখিয়াছিলেন, মুসোলিনী তাহা করেন নাই। যুদ্ধ ও ফাশিজম্ দুই সহোদর ভাই। যে "সংগ্রামের উর্ধ্বে" নীতিকে শেষ অজুহাতরূপে ব্যবহার করিয়া তখনও পর্যন্ত আমরা দূরে সরিয়া ছিলাম, এই গুণ্ডার সর্দার তাহাও আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করিতে হয় তবে যুদ্ধের প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। ত্রিপোলীতে মুসোলিনী যুদ্ধের আগুন জ্বালিবার যে প্রয়াস দেখাইলেন তাহার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আমি এই যুদ্ধ শুরু করিলাম। ১৯২৬ সালের ১৯শে এপ্রিল French League of the Rights of Man-এর বাণীতে এবং 'রু দাম্‌রসের' বিচার সম্পর্কে ২৩শে এপ্রিল আঁরি তরেমঁ-র নিকট লিখিত একটি চিঠিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমার শুরু হইল। এই সকল লেখার মারফৎ ইতালীয় ফাশিজমকে আমি আক্রমণ করিলাম, তাহাদের নেতাকে অভিসম্পাত দিলাম, আগামী যুদ্ধের জন্য তাহাকে দায়ী করিলাম। লিখিলাম, "ইউরোপের রক্তের স্রোত যেন ঘুরিয়া তাহার উপরই আসিয়া পড়ে, এবং তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারে।"

এই সময় (১৯২৬ সালের জুন-জুলাই) ইতালী পরিভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিলেনেভে আমার সহিত দেখা করিয়া আসিলেন, তাহার আন্তরিকতা, তাহার বিশ্বস্ততা এবং ইউরোপীয় রাজনীতি ও ইতালীয় ভাষা সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া মুসোলিনী ইতিমধ্যে তাহার কাজ হাসিল করিয়াছে। কারণ, তিনি যখন আমার গৃহে আসিলেন দেখিলেন নানা ভাবে তোষামোদ করিয়া পশু তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই ভারতীয় ঋষি যখন মুসোলিনীকে বলিয়াছিলেন, "হিংসা আমি সহ্য করিতে পারি না; হিংসাকে আমি ঘৃণা করি," বিন্দুমাত্র দ্বিধা সংকোচ না করিয়া পশুও জবাব দিয়াছিল "আমিও করি।" আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম। এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফাশিজমের আসল রূপ আমি তাহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাহার সংযোগসাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন। যে-ফাশিজম্ তখন তাহার নাম ভাঙ্গাইতেছিল তাহার সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইতালীয় বন্ধুগণের নিকট এবং সি. এফ. এণ্ডরুজের নিকট লিখিত চিঠিতে তিনি তাহার মতপরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন। ১৯২৬ সালের ১৫ই অগাস্টের ইউরোপ পত্রিকায় আমি এই চিঠির কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম; পরে ল্যুমানিতে ও অন্যান্য পত্রিকায়ও সেগুলি প্রকাশিত হইল। ব্যাপারটা আমি এইখানেই থামিতে দিলাম না। বোলোঞার শোচনীয় ঘটনার পর ফাশিজম্ সম্পর্কে আমি রবীন্দ্রনাথের নিকট চিঠি লিখিতে থাকিলাম (১৯২৬ সালের নবেম্বর)। একটা সামান্য আক্রমণকে ছুতা করিয়া বোলোঞাতে ড্যুচে পনের বছরের একটি নিরীহ বালককে জনতার হাতে তুলিয়া দেন; আর-ইতালীর সমস্ত শহরগুলি রক্তে লাল হইয়া ওঠে।

যে বৃদ্ধ গুপ্তচর গ্যারিবল্ডির নাম কলংকিত করিয়াছিল তাহার গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদও আমি রবীন্দ্রনাথকে জানাই। আমি তাহাকে লিখিলাম (আমার ধারণা হইয়াছিল এই বিতর্কের মধ্যে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছি বলিয়া তিনি খুশি নন) ঃ

"আপনার ইতালীয় আমন্ত্রণকারীদিগের প্রতি যে আস্থা আপনার জন্মিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার মনের শান্তি নষ্ট করিয়াছি বলিয়া বহুবার আমি নিজেকে ভর্ৎসনা করিয়াছি। কিন্তু আপনার শান্তি অপেক্ষা আপনার মহিমাকেই রক্ষা করিতে আমি বেশি তৎপর। দানবেরা যে ইতিহাসে আপনার নাম কলংকিত করিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার এই হস্তক্ষেপের ফলে আপনার মনে যদিও কখনও কোনো অস্বস্তি আসিয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে আপনার সতর্ক বিশ্বস্ত অভিভাবকের কাজ করিয়াছি ভবিষ্যতই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতেও তখন ইতালীয় ফাশিজমের তৈলাক্ত প্রচারকার্য শুরু হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশেও আমি এক বাণী প্রেরণ করিলাম (১৯২৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী 'ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল'এ প্রকাশিত চিঠি) ; এবং তাহার পর হইতে আমার এশিয়ার বন্ধুগণের নিকট প্রেরিত বাণীতে এবং সম্প্রতি (১৯৩৩ সালের নবেম্বর) কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট লিখিত এক বাণীতে আমি এক কথাই বলিয়াছি। ইহার অত্যল্পকাল পরেই (১৯৩৩ সালের নবেম্বর) বারবুস ও আমি ফাশিজমের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করিলাম। আমাদের দুইজনের নামে একটি আবেদন আমরা বাহির করিলাম ঃ "ফাশিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীন মানুষের আবেদন।" (Committee for the Defence of the Victims of Fascism and the White Terror)

এই ইস্তাহারের, ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা "শহিদ্ জাতিগুলির সাহায্যার্থে" উৎসর্গীকৃত। ১৯২৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পারীর সাল-ব্যুলিয়েতে প্রথম বৃহৎ ফাশিজম্-বিরোধী সভার অধিবেশন হয়। এলবার্ট আইন্‌স্টাইন, আঁরি বারবুস ও রমঁ্যা রলাঁ সভাপতিত্ব করেন। League for the Rights of Man-এর সহসভাপতি পল লাঁজভঁ্যা কার্যকরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যদিও ফাশিজমের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম, তথাপি দলনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার দাবী করিয়া তখন আমি কথার জাল বুনিয়া চলিতেছিলাম। ১৯২৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বারবুসকে লিখিয়াছিলাম, "যে-হেতু আমি শ্রমিক প্রগতির সেনাবাহিনীর একজন ঠিক সেইহেতু আমি এই বাহিনীর নেতাদের নিকট হইতে অনুকরণ যোগ্য নৈতিক শৃঙ্খলানিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা দাবী করি।"

বলিলাম বটে "আমি শ্রমিক প্রগতির সেনাবাহিনীর একজন" কিন্তু মুখ ও চোখ বন্ধ করিয়া যাহাতে এই বাহিনীতে যোগ না দি সেই সম্পর্কে আমি সতর্ক থাকিলাম, ইহার ভুলত্রুটি ও হিংস্রতাকে আক্রমণ করিবার অধিকার আমি ছাড়িতে চাহিলাম না।

আমার তখনকার দিনের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের তিক্ততা ছিল। আমরা নিজেদের 'স্বাধীন' (Independents) নাম দিয়াছিলাম। আজ খোলাখুলিভাবে এই কথা আবার বলিতেছি, কারণ কমিউনিস্ট নেতাগণের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহারা পরে এই ভুল স্বীকার করিয়া শুধরাইয়া লইয়াছিলেন। আমাকে না জানাইয়া বই-এ, প্রতিবাদে অথবা আবেদনে আমার নাম কখন তাহারা কিভাবে ব্যবহার করিতেছিল সে-সম্পর্কে আমি তখন সম্পূর্ণ সতর্ক

থাকিতাম। ঐগুলিতে আমার ভাব প্রায়ই ধিকৃত হইত। তাহারা এতদুর পর্যন্ত গিয়াছিল যে, সুইজারল্যাণ্ডের নিকট আপত্তিজনক একটি প্রবন্ধের (১৯২৭ সালের মার্চ মাস) দায়িত্ব তাহারা আমার উপর আরোপ করিয়াছিল। আমি এই সুইজারল্যাণ্ডেরই অতিথি ছিলাম এবং এই প্রবন্ধের জন্য সেখান হইতে আমি বহিষ্কৃত হইতে পারিতাম।

একান্ত বর্তমানের কথা ছাড়া এই সকল উন্মাদেরা আর কিছুই ভাবিত না। এই বর্তমানের সহিত ভবিষ্যৎ পরিণামের কোনো আর সম্পর্ক ছিল না। আমাদের অনুমতি না লইয়াই তাহারা ইহার মধ্যে আমাদের টানিয়া আনিল। ভাবিল, আমাদের মধ্যে যাহারা তখনও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল এইভাবে বিপন্ন হইলে তাহারাও চলিয়া আসিবে; নির্বোধ তাহারা বোঝে নাই ইহাতে তাহারা কাছে না আসিয়া একেবারেই দুরে সরিয়া যাইবে। কারণ, যে স্বাধীন সে সবই সহ্য করিতে পারে, পারে না কেবল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের সহিত সংযুক্ত হইতে। একদিন যে দলে সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আসিত, জোর করিয়া আনিতে গেলে সে একেবারেই আসিবে না। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের একাধিক ব্যক্তি এইভাবে দুরে সরিয়া গেলেন। প্রত্যেক দলই এই একই পথ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে-দলকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি, যে-দলের হাতে ন্যায়ের পতাকা, মহত্তর জগতসৃষ্টির জন্য যে-দল সংগ্রাম করিতেছে, সেই দলের মধ্যে যদি এমন কিছু দেখি যাহা শত্রুর মধ্যে দেখিব, তখন আর উহা সহ্য করা কঠিন। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইহাকেই আমি ক্রুদ্ধভাবে আক্রমণ করি। কিন্তু সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেও একসঙ্গে সমানে আক্রমণ চালাইয়া যাই। এই সাধারণ শত্রু ছিল সাম্রাজ্যতন্ত্র, বৃহৎশিল্পের পুঁজিতন্ত্র; ফাশিজম্

তখনও ভ্রূণাবস্থায়। ফ্রান্সে ইহা তখন ধীরে ধীরে সামরিক আইনের বেড়াজালে প্রতিষ্ঠিত মানুষকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল ('১৯ সালের বসন্তকাল)।

এই ভুল বুঝাবুঝি আরও দীর্ঘকাল চলিত; কিন্তু ইতিমধ্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের নীতি পরিবর্তিত হইতে শুরু করিয়াছিল ব্যাপকতার দিকে। তাহার উপর, পশ্চিম ইউরোপে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি আনাতোল লুনাচারস্কির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে এই অবাঞ্ছনীয় কলহের অবসান হইল।

"রাশিয়ায় নির্যাতন" সম্পর্কে লিবেরতের পত্রিকায় যে তদন্ত প্রকাশিত হয় তাহারই জবাবে এই প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করি। ফ্রান্সের এনার্কিস্ট কমিউনিস্টদের এই নামকরা কাগজখানি উহার চিরাচরিত নীতি অনুসারে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তখন জনমত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। সংখ্যাল্প এনার্কিস্টদের বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ সাম্যবাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া তাহারা এই অভিযান শুরু করিয়াছিল অথচ তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই যে, সাম্যবাদী আন্দোলন যদি ধ্বংস হইয়া যায় তবে অন্য সমস্ত বৈপ্লবিক দলও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। বিপদ তখন চরমে উঠিয়াছে, ইংলণ্ড সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং সোবিয়েৎ প্রতিনিধিগণকে জঘন্য বর্বরভাবে বিতাড়িত করিয়াছে। তৈল ব্যবসায়ের অধিপতিগণের চক্রান্ত সফল হইয়াছে; মস্কোর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সম্মিলিত হইতে শুরু করিয়াছে। ১৯২৭ সালের ২৮শে মে লিবেরতের কাগজের অভিযানের জবাবে আমি লিখিলাম যে, সোবিয়েৎ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যাহাই বক্তব্য থাক না কেন, "ইউরোপে সমস্ত স্বাধীন মানুষকে

আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রাশিয়া আজ বিপন্ন, এবং সে যদি একবার ধ্বংস হইয়া যায় তবে কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শৃঙ্খলিত হইবে না--কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। জগত কয়েক যুগ পিছাইয়া পড়িবে। এশিয়ার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইউরোপের ধনিকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দানবীয় যুদ্ধের জালে দিনে দিনে ইউরোপের সমস্ত জাতিগুলি জড়াইয়া পড়িবে। অতএব এই ভ্রাতৃঘাতী আলোচনা আপতত স্থগিত থাকুক। রুশ বিপ্লবের মত এত শক্তিশালী ও এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমান ইউরোপে আর হয় নাই। ইহার সাহায্যার্থে আসুন আমরা দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাই; শত্রু দ্বারে সমাগত, সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। ইউরোপের স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।"

আমার এ-কথাগুলি মস্কোর নজর এড়াইল না, সোবিয়েৎ বিপ্লব তখন যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছিল সেই কষ্টিপাথরের বিচার করিয়া কাহার সোবিয়েৎ-প্রীতি কতখানি খাঁটি ধরা পড়িল। ১৯২৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর লুনাচারস্কী আমার নিকট এক পত্র লিখিলেন; যুদ্ধের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। সেখানে তিনিও ছিলেন আমার মতই নির্বাসিত। আমরা তখন পরস্পরকে বুঝিয়াছিলাম ও শ্রদ্ধা করিতে শুরু করিয়াছিলাম। সোবিয়েৎ রাশিয়ার এই শিক্ষামন্ত্রিটি নিষ্ঠাবান সাম্যবাদী ছিলেন এবং উদারতা মনবীয়তার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আর্টিস্টরা তাহার নিকট কতখানি ঋণী তাহা আজ সকলেই জানে; গৃহযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ দুর্দিনে আর্ট ও আর্টিস্টদের তিনি কি-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আজ পুরাতন কাহিনী, কিন্তু, আমার বইগুলি তখন রাশিয়ায় যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তাহার বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন। একবৎসর পূর্বে মস্কোর সংবাদপত্রে তিনি

আমাকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু এবার লিবেরতের পত্রিকার অভিযানের বিরুদ্ধে আমার জবাবের সুযোগ লইয়া তিনি তাহার পার্টির পক্ষ হইতে আমার প্রতি মৈত্রী ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন! "বিপ্লব ও সংস্কৃতি" নামে পার্টির যে কাগজখানি তখন তাহারা বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তাহাতে সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ জানাইলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন আমি যাহা পাঠাইব তাহাই ছাপা হইবে, এমনকি, "আমাদের মূল নীতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও। লিবেরতের পত্রিকার জবাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এক মুহূর্তে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচয়দানকারী যে-সকল বুদ্ধিজীবী এখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রহিয়াছেন তাহাদের চেয়ে আপনার বুদ্ধি ও দৃষ্টি কত ব্যাপক ও নিরাসক্ত। অবশ্য এ-কথায় যেন আপনি মনে না করেন যে, আপনি যাহা যাহা লিখিয়াছেন সব ব্যাপারেই আমাদের মতৈক্য আছে। তবে আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূল সুরটি সত্যই গভীর ও মহান।"

যে প্রশংসাবাণী তিনি আমার প্রতি উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই প্রশংসাবাণী আমিও তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিতাম। এই চিঠির সুরে এমন একটা উদার সহনশীলতা ছিল যাহা সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্-দৃষ্টির পরিচায়ক। সোবিয়েৎ বিপ্লবের নিকট হইতে এতদিন আমি ইহারই আশা করিয়া আসিতেছিলাম। যে-হাত তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন সে-হাত জড়াইয়া ধরিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলাম না; আমি অসং-কোচে ঘোষণা করিলাম: সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যাহার জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাতে আমার পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন রহিয়াছে। "আন্তর্জাতিক বণিকস্বার্থের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির অবিশ্রাম প্ররোচনার ফলে বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে

আজ যখন সমগ্র জগত জুড়িয়া একটা উদ্ধত জনমত সংহত হইয়া উঠিতেছে তখন স্বাধীন ফরাসী হিসাবে আমার কর্তব্য, যে-প্রবঞ্চক প্রতিক্রিয়াশক্তি সারা ইউরোপের সমস্ত জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং রুশ বিপ্লবের অস্বস্তিকর মশালকে নিবাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে আবার আমি আঘাত হানিতে চাই।"

সোবিয়েৎ বিপ্লবের মধ্যে "যে মতের সংকীর্ণতা ও একনায়কত্বের মনোভাব" আমাকে প্রায়ই পীড়া দিত তাহার সমালোচনা হইতে আমি বিরত হইলাম না। সে সমালোচনা আমি পূর্বের মতই করিয়া চলিলাম বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সোবিয়েৎ বিপ্লবের "ঐতিহাসিক প্রয়োজনে" আমার বিশ্বাস আমি পুনরায় ঘোষণা করিলাম এবং "ইহা যে মনুষ্য সমাজের শক্তিশালী অগ্রগামী দল" সে-বিশ্বাসও ঘোষণা করিতে ভুলিলাম না।

এই পত্রবিনিময়, এই স্বীকৃতি ও ঘোষণা ১৯২৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। ঐ সঙ্গে লিবেরতের পত্রিকার জবাবটিও প্রকাশিত হইল। কারণ, এই জবাবটি হইতেই সমস্ত ব্যাপারের সূচনা।

তখন হইতে আমাদের মধ্যকার ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল। রাকোভস্কি তখনও পারীর সোবিয়েৎ দূতাবাসে ছিলেন। অক্টোবর মাসের প্রথমদিকে তৈলব্যবসায়িগণের করতলগত সংবাদপত্রগুলির উন্মাদ চীৎকার অগ্রাহ্য করিয়া সোবিয়েৎ গণতন্ত্রের দশম বার্ষিকীতে উপস্থিত হইবার জন্য মস্কো হইতে আমাকে আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে ইহার উত্তরে আমি একটি বাণী প্রেরণ করিলাম। বাণীটির নাম দিলাম "রাশিয়ার ভ্রাতাভগ্নিগণের প্রতি।" এই বাণীতে আমি জানাইলাম "সংগ্রামের" অর্ধস্ফুট প্রারম্ভকাল হইতে রুশ বিপ্লবের

প্রতি আমি আসক্ত। আজ যখন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ, সমস্ত ফাশিস্টবাদ সমস্ত যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক মতবাদ ও সংবাদপত্রের প্রচারকার্য জনমতকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছে, যখন স্বর্ণস্বার্থের ক্রীড়ণক নিজ নিজদিগের গভর্নমেণ্টগুলিকে এইকার্যে তাহারা ভিড়াইতে পারিয়াছে তখন এই চরম সংকটের দিনে পশ্চিম ইউরোপে আমার যে-সকল লেখক ও মনস্বীদের আমি বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি তাহাদের পক্ষ হইতে এবং আমার নিজের পক্ষ হইতে আমি পুনরায় আপনাদের নিকট ভ্রাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

এই ভীষণ প্রসঙ্গে যে আকাঙ্ক্ষা আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্টালিনের দ্বিধাহীন দূরদর্শী নীতির ফলে তাহা আজ পূর্ণ হইয়াছে।

সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সোবিয়েৎ গণতন্ত্রের "সহযাত্রী" হইতে এবং তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে আমি কোনোদিন বিরত হই নাই।

॥ সাত ॥

ইহার পরের কয়েক বৎসর (১৯২৮-৩৫) আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটিল না, বরঞ্চ যে-নীতি সেদিন আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম সেই নীতির সত্যতা ঐ সময়ের মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল। ঐ নীতির ভিত্তিতে ঐ সময়ের যে-কয়খানি ইস্তাহার লিখিয়াছিলাম তাহাতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। অবশ্য এমন কিছু হইল না যাহাতে শত্রু ক্ষান্ত হইতে পারে। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই আমার মধ্যে "সংগ্রামের ঊর্ধ্বে" পুস্তকের গ্রন্থকারকেই দেখিতে লাগিল (ঐ পুস্তকের শিরোনামা ছাড়া অবশ্য তাহারা কিছু পড়ে নাই) তাহারা স্বীকার করিতে চাহিল না যে, গত ১৫ বৎসর আমি সংগ্রামের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ

করিতেছি। সে-যুদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে জাতির বর্বর প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ নহে। সে-যুদ্ধ শোষণকারী দাসব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত এক অভিশপ্ত হত্যা-প্রবণ সমাজের বিরুদ্ধে সকল জাতিরই এক পবিত্র সংগ্রাম। গত সাত বৎসরে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি সেগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি কথাই এখানে উল্লেখ করিব। পাঠক যেন সেগুলি নিজেরাই দেখিয়া লন। প্রবন্ধ-গুলি পড়িলেই যথেষ্ট হইবে, উহার টিকা-টিপ্পনির প্রয়োজন হইবে না। প্রবন্ধগুলিকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা চলে। একই কাজের উহারা চারিটি বিভিন্ন স্তর মাত্র :

১। সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে রক্ষা;
২। আন্তর্জাতিক শান্তি ও তাহার আনুসঙ্গিকগুলিকে রক্ষা করা;
৩। ইউরোপেই হউক কি উপনিবেশেই হউক ধনতন্ত্রী ও সামরিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা; এবং
৪। ফাশিজমের বিরুদ্ধে গত কয়েক বৎসব যে সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে পরিচালনা করা।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে লিখিত এবং ১৯২৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত "আমার রাশিয়ান ভ্রাতাগণের প্রতি" শীর্ষক আমার অভিভাষণের সমালোচনা করিয়া নির্বাসিত রাশিয়ান লেখক "কনস্টাণ্টাইন বালমণ্ট ও আইভান বুনিন আমাকে যে চিঠি লেখেন তাহার জবাব" (১৯২৮ সালের ২০শে জানুয়ারী)।

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ আপনার গুপ্ত চক্রান্তগুলিকে শান্তির যে মিথ্যা ছদ্ম আবরণে ঢাকিতে চাহিয়াছিল তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি লিখি :

১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর: লিয়ঁ হইতে প্রকাশিত লেফর পত্রিকায় লিখিত চিঠি—"কেলগ চুক্তি ও শান্তির প্রহসন";

১৯১৯ সালের অক্টোবর: "শান্তির জন্য ডাকাতি"। প্রধানত সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হুগেনবুর্গ, আর্নল্ড রেশবের্গ প্রমুখ ব্যক্তিরা ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান-পোলিশ-জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল ব্লক গঠনের যে চক্রান্ত করিতেছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার বিরুদ্ধে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করি (১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ইইরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ);

১৯৩০ সালের ১৮ই জানুয়ারী "রোমের শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্দেশে প্রেরিত আবেদন।" লেফর পত্রিকায় প্রকাশিত। কণ্ডেনহোভে কার্লেগির "প্যান-ইউরোপা" আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার আবেদন এই প্রবন্ধে ছিল।

১৯৩০ সালের ৯ই এপ্রিল: "বাহিরের আক্রমণ হইতে সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে রক্ষার জন্য আবেদন।" এই প্রবন্ধে আক্রমণ করিয়াছিলাম "ফরাসী রাজনীতিতে বৈদেশিক তৈলব্যবসায়িগণের উদ্ধত হস্তক্ষেপ, উদ্ধত প্রভাব বিস্তারকে—ঘৃণ্যতম পুঁজিবাদীর স্বার্থ ও রক্তপিপাসু ফাশিজমের সহিত রোম, জেনেভা, জুদিয়ার সকল দেবতার নামে, ধর্মের নামে কপটতার জঘন্য গুপ্ত প্রেম" (১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল মঁদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)।

১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী: গাস্তঁ রিয়ঁ-র জবাবে লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ: "ইউরোপ নিজেকে প্রসারিত কর অথবা ধ্বংস হইয়া যাও।" ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের লা নুভেল রেভু মঁদেল পত্রিকায় এই প্রবন্ধে আমি বুদ্ধিজীবিগণকে নিশ্চেষ্টতার আশ্রয় হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করি! যে দ্বৈত সংগ্রাম শীঘ্রই শুরু হইবে তাহাতে পক্ষ নির্বাচনের জন্য আমি তাহাদের আহ্বান জানাই। এই দ্বৈত সংগ্রাম বলিতে আমি বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম একদিকে সোবিয়েৎ

উইনিয়নের সহিত ইউরোপের পুঁজিবাদী ফাশিস্টগণের সম্মিলিত শক্তির সংঘর্ষ; অন্যদিকে ইউরোপের সহিত বিদ্রোহী এশিয়া ও আফ্রিকার সংগ্রাম। আমার পক্ষ হইতে আমি জানাইতেছিলাম, "যদি সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আক্রান্ত হয় তবে আক্রমণকারী যেই হউক না কেন, আমার স্থান সোবিয়েতের পার্শ্বে। সানইয়াৎসেন ও গান্ধীর এশিয়ার বিরুদ্ধে সভ্যতার কপট আচরণে আত্মগোপন করিয়া যাহারা অভিযান শুরু করিবে সেই ইউরোপীয় শোষণ-কারীদের পক্ষ লইয়া আমি কখনই যুদ্ধ করিব না। সেই প্রলয়ঙ্কর বর্বর সংগ্রাম যদি কখনও তুমি আরম্ভ কর তবে, হে ইউরোপ, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার উদ্ধত স্বৈরাচার ও উন্মত্ত ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আমি অভিযান শুরু করিতে দ্বিধা বোধ করিব না। ভারতবর্ষ, ইন্দো-চীন, চীন এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত শোষিত জাতির পাশে দাঁড়াইয়া আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইব।

১৯৩১ সালের ২৯শে জানুয়ারী ভক্স পত্রিকায় লিখিত চিঠিঃ "পিছু ফিরিবার পথ আমি নিজ হাতে নষ্ট করিয়াছি"। এই প্রবন্ধে এই কথা জানাইয়া আমি ঘোষণা করিয়াছিলামঃ "আমার মধ্যে এখন একটি নূতন ইউরোপের অভ্যুদয়কে চোখ মেলিয়া তাহারা দেখুন যাহা তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।" আমার ফরাসী লেখক বন্ধুদের অনেকে আমার পিছু পিছু সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দিকে আগাইয়া আসিলেন।

১৯৩১ সালের ১০ই মে ও অক্টোবরঃ "গার্কির প্রতি দুইটি অভিনন্দন বাণী"। "তাঁহারা ও আমারা" নামক গর্কির প্রবন্ধাবলীর বইটির ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে দ্বিতীয় অভিনন্দনটি ব্যবহৃত হয়।

১৯৩১ সালের ৬ই এপ্রিল "হে অতীত, বিদায়"। ১৫ই জুন ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিতে আমার এই সময়কার মানসিক

বিবর্তনের একটা পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, কারণ, ১৯১৫ সালের যুদ্ধের সূচনাকাল হইতে সেদিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও সংঘর্ষের একটা ছবি আছে। সংগ্রামের ঊর্ধ্বে পুস্তক হইতে কতদূরে আসিয়াছি এই প্রবন্ধটিতে তাহা বুঝা যায়।

ইহার মধ্যে মধ্যে সোবিয়েৎ লেখকদের সহিত খোলাখুলি আলোচনা চলে, সোবিয়েৎ পত্রিকাগুলিতে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় (৩১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত গ্ল্যাডকভ ও গেলভিলের নিকট লিখিত চিঠি এবং "স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবীয়তা") এবং ইহার পর হইতে বন্ধুত্বের আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়ঃ বুদ্ধিজীবিগণের কঠোর অভিভাবক গর্কির চিন্তাধারা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুরু হয় "সত্য ও মিথ্যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ," "সৃষ্টির চরমমুহূর্তে জনগণের ইচ্ছাশক্তি" সম্পর্কে এবং সেখান হইতে ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হয় তৎসম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনার ফলে আমার চিন্তাজগতে যেটুকু সন্দেহের মেঘ অবশিষ্ট ছিল তাহা অপসারিত হইয়া যায়; ব্যক্তি ও সামাজিকমানুষের মধ্যে যে-মিল আমি বহুবৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম এইবার তাহার সন্ধান পাইলাম। যে ব্যাপক দৃষ্টি ও জ্ঞান আমি লাভ করিলাম তাহা আমার ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী সহকর্মীদের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিলাম। শান্তিবাদী, অহিংসাপন্থী, মানবতাবাদী এবং মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত অথচ আন্তরিক আদর্শবাদী যাহারা মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থী বিপ্লবের বাস্তব-আসক্ত সংকীর্ণতায় ভীত হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলের মধ্যেই আমার নবলব্ধ জ্ঞানকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চিঠিগুলি লিখি:

১। ভ্যালিন্টিন বুল্লাকভ্‌কে লিখিত চিঠি—অহিংসার মত বীরোচিত হিংসায় আত্মবিসর্জন (১৯২৯ সালের ১১ই এপ্রিল);

২। সের্গে রাডিনকে লিখিত "সাম্যবাদী বস্তুবাদ" (১৯৩১ সালের ১৯শে মার্চ);

৩। এদুয়ার প্রিভাকে লিখিত "বিপ্লব ও অহিংসা" (১৯৩১ সালের ৫ই মে);

International League of Woman for Peace & Liberty এবং League for the Fighters for Peace এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে প্রেরিত কয়েকটি বাণীর মধ্যে। এই বাণীগুলির মারফত ঐ দুই প্রতিষ্ঠানকে আমি বিপ্লবের শিবিরে আনিবার চেষ্টা করি। ছয়বৎসর আগে ১৯২৪ সালে প্রফেসর রুজিয়েকে লিখিত চিঠিতে আমি বুদ্ধিজীবীর আদর্শের একটা নমুনা দিয়াছিলাম; ঠিক তেমনি ১৯৩০ সালের পর এউজেন রেলজিস-এর আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলীর (২০শে অক্টোবর, ১৯৩০ সাল) দীর্ঘ জবাবে ছয় বৎসর পরে আমি আবার তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি করিলাম!

এউজেন রেলজিস একজন রুমানীয়ান বুদ্ধিজীবী। তিনি আন্তরিকভাবে শান্তিবাদী ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। তাহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু যে আন্তর্জাতিকতায় তিনি বিশ্বাস করেন আমার মতে তাহা বিপজ্জনক। তাহার এই আন্তর্জাতিকতা ইউরোপেই আবদ্ধ, বাহিরের পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন। তাহার এই ভুলের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই, আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম "যে-ইউরোপীয়বাদ আজ বিভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করিতেছে (প্যান-ইউরোপিয়ান ফেডারেশন ইত্যাদি); তাহা একটি নূতন ও আরও সাংঘাতিক জাতীয়তাবাদের মুখোশ মাত্র। কারণ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যত হিংস্র লুব্ধ স্বার্থের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে এবং অবশিষ্ট জগতের বিরুদ্ধে

অস্ত্রসজ্জা শুরু করিয়াছে। যে-সঙ্ঘে সমগ্র মানবজাতির প্রবেশাধিকার নাই, সে-সঙ্ঘকে আমি স্বীকার করি না......সে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ বিশ্বব্যাপী নহে, তাহা আন্তর্জাতিক নামেরই অযোগ্য।" ওদিকে এউজেন রেলজিস রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের পুরাতন ঔদাসীন্যতাকেই বহাল রাখিয়াছিলেন! তাহার পক্ষে অবশ্য এই দূরে সরিয়া থাকার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অহংকার ছিল না; কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের একদল অভিজাত মস্তিষ্কবিলাসী কৌশলে এই আচরণটিকে চালু রাখিতে চাহে কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ইহার সুযোগে তাহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারে অথচ শ্রমজীবী জনসাধারণ হইতে দূরে অথবা তাহাদের ঊর্ধ্বে আভিজাত্যের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে। এইভাবে দূরের স্বতন্ত্র হইয়া থাকাটা তাহাদের বেশ ভালো লাগে। শ্রমজীবীসাধারণের মধ্যে মিশিয়া যাইতে ত' তাহারা চাহেই না বরঞ্চ রাজনীতির প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তাহারা যে-যুদ্ধের গৌরব করে সে-যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চের সাজানো যুদ্ধ; সমাজজীবনের রণক্ষেত্র হইতে বহু-দূরে এ-যুদ্ধ তাহাদের মস্তিষ্কের খেলা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে তাহাদেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বার্থপরের মত জনজীবনের কর্তব্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তাজীবীদের এক অদ্ভুত কুলিন সম্প্রদায় তাহারা সৃষ্টি করে। ঘনঘন করতালির মধ্যে জুলিয়াঁ বাঁদা একদিন এই কৌলিন্যের দম্ভই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বহু প্রবন্ধে এবং ল্যা'ম আঁশাঁতে পুস্তকের বহু স্থানে আমি বলিয়াছি—কখনও যথেষ্ট বলিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি নাই—বাস্তব সংস্পর্শ শূন্য মনস্বিতার এই পুতুল পূজার প্রতি আমার নিবিড় ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আছে। যে মাটি হইতে সে জীবনরস আহরণ করিতেছে সেই মাটির সহিত সংস্রব ছিন্ন করিয়া

কেমন করিয়া বাঁচিবে ? বাস্তবের সহিত আত্মীয়তায় যে বিপদ আছে তাহার হাত হইতে সে বাঁচিল বটে কিন্তু তাহার প্রাণরসটুকুও ত' বাস্তবের হাতে, ইহা ছাড়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া ! এই পৌত্তলিকতা ইচ্ছাকৃত হউক বা নাই হউক রাজনীতির আধুনিক ধুরন্ধরগণ ইহাকে উপেক্ষা করেন না ; ইহাকে তাহারা উৎসাহ দেন ; কারণ "এই বাস্তববিদ্বেষী কলাবিলাসী মননজীবীদের "অপ্রযুক্ত" বুদ্ধির খেলায় জনসাধারণের বুদ্ধিমান অংশের মনোযোগ টানিয়া লওয়ার ফলে বহির্জগতে জাতিপুঞ্জের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের যে বিরাট সংগ্রাম চলিয়াছে সেদিকে আর তাহাদের নজর পড়ে না।" যে চিন্তার স্বাধীনতা থাকিলে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রভাব বিস্তারের সুবিধা হয় তাহা আমি চাই। কিন্তু একথা মানি না যে, যে দেখে তাহার আর কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না। কেহ যখন ভালো করিয়া দেখিতে পায় তখন ভালো করিয়া কাজও সে করিতে পারে। "কাজ করিতে হইবে"। বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে (রেলজিসের দেওয়া নাম) "চিন্তার সেবকগণের" সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দম্ভভরে দূরে থাকিবার কোনো অধিকার নাই। "মানুষের শ্রমজীবনের একটি বিশেষ অংশ তাহারা।" স্টালিন একটি ছোট্টকথায় ইহাদের নাম দিয়াছেন "ইনজিনিয়ার্স অব দি স্পিরিট।" শ্রমজীবী সহকর্মিগণের চেয়ে কোনো অংশে উঁচু বলিয়া ইহারা নিজেদের দাবী করিতে পারে না। শ্রমজীবী ছাড়া ইহাদের কোনো অস্তিত্ব নাই। দুই দলের কার্যের লক্ষণ হইবে এক—বৃহত্তর মহত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠা। রেলজিস যখন তরুণদের জন্য আমার নিকট বাণী চাহিয়া পাঠাইলেন আমি লিখিলাম, "তাহারা যেন কখনও চিন্তা হইতে কর্মকে বিচ্ছিন্ন না করে।" যে সংগ্রাম আজ নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মহান যোদ্ধা হওয়ার চেয়ে চিন্তার আজ আর বড় কোনো কাজ নাই।

॥ আট ॥

আমি যখন হইতে কর্মের সৈনিক হইয়াছি সে কোনো অদূর অতীতের কথা নহে। ১৯০০ সালের লেখা আমার "জনসাধারণের রঙ্গমঞ্চ" পুস্তকখানিতে আমি ফাউস্টের কথা দিয়া শেষ করিয়াছিলাম: "প্রারম্ভে ছিল কর্ম।" আমার সমস্ত বই-এর মধ্যে এই কথা আমি বলিতে চাহিয়াছি। আমার জঁা ক্রিস্তফ সেই ক্রিস্তফ যে শিশু পৃথিবীকে কাঁধে লইয়া নদী পার হইয়াছিল। আনেৎ, "বিমুগ্ধ আত্মা" সেই নদী যে-নদীর নামে তাঁহার নাম—"সেই জীবন্ত জলধারা"—সেই চিরপ্রবহমান জীবন। "মরণে পর্যন্ত আমরা সংগ্রামের পুরোভাগেই থাকিব।" এমনকি আর্টে, যে-আর্ট আমার কাছে আমার সমগ্র সত্তার সামিল, এবং সংগীতে বিটোফেন ও হাণ্ডল-এর মত সেই সকল মহাস্রষ্টাগণের দিকেই আমার আকর্ষণ বেশি যাহাদের সংগীত কর্মের প্রেরণা আনে। আমার মানসলোক যখন ভারতবর্ষ হইতে তীর্থযাত্রা সারিয়া ফিরিল, অনন্তের যে স্থাণু স্বপ্নের মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে সেই চিন্তাকে সে সঙ্গে লইয়া ফিরিল না, সে সঙ্গে আনিল সেই সকল মহাপুরুষকে যাহারা স্বপ্ন হইতে শক্তি আহরণের মন্ত্র জানেন, উত্তাল উদ্দাম কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে যাহারা দ্বিধা করেন না; সঙ্গে আনিল নেতা গান্ধীকে, বীর বিবেকানন্দকে।

কিন্তু কর্মোন্মাদনার এই আগুন আমার পাহাড়ের আগুনের মতই দীর্ঘদিন বৃথাই জ্বলিয়া আসিতেছিল। এ আগুন জ্বলিতেছিল তখন "বাঁচিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবার উন্মাদনায়"। আমার জঁা ক্রিস্তফ আমার চোখ দিয়াই এই বাণীকেই পড়িয়াছিল আঁগাদিনের ঘরের সম্মুখে। বাঁচিবার জন্ত বাঁচিয়া থাকা। যে স্নায়বিক অবসাদ ও

নৈরাশ্যের যুগে আমার যৌবন কাটিয়াছে সে-যুগে এ বড় সহজ কথা ছিল না। কিন্তু ইহাই ত' যথেষ্ট ছিল না। রঙ্গমঞ্চে যে গায়কেরা গাহিতে থাকে 'চল আমরা যাই' অথচ কিছুতেই যায় না ইহাও যেন তাই, কারণ কোথায় যাইবে তাহা জানা ছিল না। এমন কি যে ক্রিস্তফ "কখনও দাঁড়াইয়া থাকে না" সেও তাহার ভ্রাতা রলাঁর সৃষ্টির মতই বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার মাথা নাই, শুধু একটি স্পন্দমান শক্তিমান হৃৎপিণ্ড লইয়া একটি অপূর্ণাঙ্গ মানুষ সে; তাহার যে দীর্ঘ চরণ দু'খানি তাহাকে নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল, সে তাহার সহিত তাহার যুগকেও লইয়া গিয়াছিল। তাহার মত তাহার যুগও ছিল কবন্ধযুগ, তথাপি সে আগাইয়া চলিয়াছিল "আগামী আলোকের" দিকে। কিন্তু কি সে আলোক? দেখা গেল সে-আলোক যুদ্ধ ও বিপ্লব। ক্রিস্তফ এই পাগলামির আভাস পূর্ব হইতেই পাইয়াছিল, দুইবার সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে করিতেও করে নাই। কোনো মতে পলাইয়া গিয়া "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" কোথাও লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া যদি তাহাকে লইয়া না যাইত তবে তাহার মত মহান চরিত্রের মানুষ দীর্ঘদিন এই ঊর্ধ্বে থাকিতে পারিত না—এক পক্ষ অবলম্বন তাহাকে করিতেই হইত। এবং "বিমুগ্ধ আত্মা" ষাট বৎসর বয়সে মৃত পুত্রের জন্য স্বেচ্ছায় সেই সংঘর্ষের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমি নিজে ছিলাম। বেশিদিন ইহার বাহিরে আমি থাকিতে পারিতাম না। "ইউরোপে বিপ্লব প্রতিক্রিয়ার হাতে আক্রমণের উদ্যোগ রাখিয়া গিয়াছে, সম্মুখের ঘাঁটিগুলি শত্রু দখল করিয়াছে। ইউরোপের সর্বত্র ফাশিজম্ নিজেকে নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ত্রাণকর্তারূপে জাহির করিতেছে। সেই মহাশক্তিমান বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস হারাইয়া ড্যুচেদের

ও ফুয়েরারদের হাতে হত্যা ও ধ্বংসের গদা তুলিয়া দিয়াছে আর এই ড্যুচেরা ও ফুয়েরাররা জনসাধারণের মধ্য হইতে আসিয়াছে বলিয়া এখনও তাহাদের শক্তি অটুট আছে। ইহারা নেকড়ের জাত বলিয়া আজ পাহারাদার কুকুরে পরিণত হইয়াছে। কালোই হউক কটাই হউক, এই মহামারি দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যতই সাফল্য লাভ করিতেছে ইহার হিংস্রতাও ততই বাড়িতেছে। প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার দিন গিয়াছে। পক্ষে কি বিপক্ষে? হিংসা অহিংসা লইয়া শিক্ষালয়সুলভ আলোচনার কোনো মূল্যই আর আজ নাই। হিংসাই হউক অহিংসাই হউক, সকল শক্তিকে আজ প্রতিক্রিয়াশক্তির বিরুদ্ধে সংহত করিতে হইবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে সকলেরই স্থান করিয়া লইতে হইবে। এই দলে থাকিবে গান্ধীর সেই মহাশক্তিমান "না"। থাকিবে লেনিনের দুর্জেয় সৈন্যদল। বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধিতা, কারখানায় ও যানবাহন ব্যবস্থায় ধর্মঘট, সশস্ত্র উত্থান—এ-সব অস্ত্রই আজ আনেৎ-এর মন গ্রহণ করিয়াছে কারণ সংগ্রামের প্রয়োজন সে বুঝিয়াছে" (লা'নঁসিয়াত্রিস-এর শেষ পর্ব)।

আমিও ইহা স্বীকার করিয়াছিলাম; আমিও সংগ্রাম করিয়াছিলাম। ১৯৩২ সালের বসন্তকালে বারবুসের সহিত আমি সর্বপ্রথম "বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংযুক্ত ফ্রণ্ট" গঠনের জন্য আবেদন জানাই: "আসুন আমরা মিলিত হই! পিতৃভূমি (আমাদের আন্তর্জাতিক পিতৃভূমি) বিপন্ন"। (১৯৩২ সালের ১লা মে তারিখে ল্যুমানিতে ও প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত)।

ইহার একমাস পরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা একটি সম্মেলন করিলাম। "যুদ্ধ তখন চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে, বিপদের খড়গ সমস্ত জাতির উপর উদ্যত"। এই সম্মেলনে আমরা প্রতিনিধি

আহ্বান করিলাম "সমস্ত জাতির সমস্ত দলের সদভিপ্রায়যুক্ত সমস্ত নরনারীর"—আহ্বান করিলাম এমন একটি বিরাট মহাসম্মেলন যাহা "সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, সিণ্ডিকালিস্ট, এনার্কিস্ট, র‍্যাডিক্যাল সমস্ত বিভিন্ন মতের রিপাবলিকান, স্বাধীন ভাবুক ক্রিশ্চান, অ-দলীয় ব্যক্তিগণ, শান্তিবাদী, প্রতিরোধপন্থী, বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধী স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ, ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশের তাহারা সকলে —যাহারা যে কোনো উপায়েই যুদ্ধ নিবারণে সংকল্পবদ্ধ"। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাহাদের সকলেরই ঐক্যকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়াই ছিল এই মহাসম্মেলনের লক্ষ্য। যুদ্ধ, ফাশিজম্ ও প্রতিক্রিয়া অভিন্ন, কারণ সোশিয়ালিস্ট ও কমিউনিস্ট গঠনকার্যে একমাত্র প্রয়োজন শান্তির। বাঁচিবার জন্য, জয়ী হইবার জন্য এই শান্তি তাহার চাই-ই। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এ-কথা ভালোভাবেই প্রমাণ করিয়াছে।

"বিমুগ্ধ আত্মার" এই পরিকল্পনাটিকে আমি "যুদ্ধ-বিরোধী" সমস্ত দলের বিশ্বসম্মেলনের সম্মুখে পেশ করিলাম। ১৯৩২ সালের ২৭শে ও ২৮শে অগাস্ট তারিখে আমস্টার্ডমে এই সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের এবং সমাজতন্ত্রের জাতীয় দলগুলির গোপন ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্রসত্ত্বেও এই বিরাট সম্মেলনের কি বিপুল প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা আজ সুবিদিত। নেতাদের অপেক্ষা জনসাধারণ সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল ; যদিও তাহারা নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল তথাপি নেতাদের তাহারা সম্মুখ পানে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছিল ; এবং ধাক্কার পশ্চাতে ছিল ঐক্য ও সাধারণ ফ্রন্টের অদম্য শক্তির তাড়া। আমস্টার্ডম্ সম্মেলনের গৌরব বারবুসের নামের সহিত জড়িত। সমস্ত দেহ মন দিয়া তিনি ইহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনই প্রথম সুদৃঢ় কেন্দ্র যাহাকে ঘিরিয়া যুদ্ধ ও ফাশিজম্-বিরোধী শক্তিগুলির সুস্থ প্রভাব ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

॥ নয় ॥

ঘটনার পর ঘটনা ঘটিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই জার্মানীতে ফাশিজম্ তাহার অভিযান শুরু করিল। সমগ্র দেশকে চক্ষের পলকে পদানত করিয়া ফেলিল। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে আমিও প্রথমদিন হইতে এই সংগ্রামে যোগ দিলাম। চালাইলাম তীব্র সাহিত্যিক অভিযান। ১৯৩৩ সালের অধিকাংশ ভাগ ইহাতেই কাটিয়া গেল।

আমি কতকগুলি ফাশিজম্-বিরোধী ইস্তাহার প্রকাশ করিলাম এবং ১৯৩৩ সালের ৯ই মে তারিখের কোয়েলনিসে্ ৎসাইতুং পত্রিকায় একটি বিতর্কের সূচনা করিলাম (১৫ই জুন তারিখের ইউরোপ পত্রিকায় এই চিঠিখানি প্রকাশিত এবং সকল বিভিন্ন পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়)।

জার্মানীর প্রতি আমার পুরাতন সহানুভূতির কথা তুলিয়া কোয়েল-নিসে ৎসাইতুং আমার নিকট আবেদন জানাইলেন। ১৪ই মে তারিখের একখানি খোলা চিঠিতে আমার জবাব দিলামঃ "যে জার্মানীকে আমি ভালবাসিতাম সে-জার্মানী ছিল তাহার মহান বিশ্বনাগরিকগণের জার্মানী—যাহারা অন্য জাতির সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের মত অনুভব করিতেন, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন মনের সহিত সংযোগ সাধনের যাহারা চেষ্টা করিতেন। স্বস্তিকাধারি-গণের পায়ের তলায় সেই জার্মানী আজ দলিত, রক্তাক্ত, মথিত। নিজেদের নৈতিক অবনতি ও পাপের দ্বারা এই স্বস্তিকার ধ্বজা-ধারিগণ তাহাদের স্বদেশকে কলংকিত করিয়াছে। ১৯১৮ সালের বিজয় লাভের পর মিত্রশক্তিগণ জার্মানীর প্রতি যে চরম অবিচার

করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাইয়াছি। তাহার উপর জোর করিয়া যে ভের্সাই-এর সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমি তাহার পরিবর্তন দাবী করিয়াছি। অন্যান্য জাতির সহিত জার্মানীর সমতার দাবীও আমি জানাইয়াছি। আপনারা কি মনে করেন এইসকল দাবী আমি করিয়াছি আরও বড় অবিচারের জন্য। আপনারা কি মনে করেন এইসকল দাবী আমি তুলিয়াছি সে জার্মানীর জন্য যে জার্মানী সমস্ত জাতির সমান অধিকারের নীতিকে এবং মানুষের নিকট পবিত্র মানুষের সমস্ত অধিকারগুলিকে নিজে পদদলিত করিয়াছে? হিটলারের জাতীয় সোশিয়ালিজম্ আসল জার্মানীর সব চেয়ে বড় শত্রু। ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আসল জার্মানীর নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি।

বিপদ কেবল একদিক দিয়াই আসিল না। ফ্রান্সে সেই পুরাতন জাতিবিদ্বেষ আবার জাগিয়া উঠিল। হিটলারের নিপীড়নের ফলে যে ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হইল তাহার সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ফরাসী গণতন্ত্রের প্রত্যেক রূপের মধ্যেই যে ফাশিস্ট ও সামরিক চক্রান্ত লুক্কায়িত ছিল এই সুযোগে তাহা ধূমায়িত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে তারিখে "যুবকগণের ' নিকট একটি আবেদন" আমরা প্রকাশ করিলাম (ফাশিজম্ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুবসম্মেলনের উদ্দেশে ইহা রচিত হইয়াছিল)। ইহাতে কেবল হিটলারবাদকে আক্রমণ করিয়াই আমি ক্ষান্ত রহিলাম না। কি গণতান্ত্রিক, কি ধনতান্ত্রিক, কি মধ্যযুগীয়, কি সামরিক সর্বপ্রকারের ফাশিজমকে আমি আক্রমণ করিলাম। আমি শ্লোগান তুলিলাম জাতীয়তাবাদই শত্রু।

জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্ন এখানে মনে, যুদ্ধ তাহাদের বড় ও ফুয়েরার কোম্পানীর বিরুদ্ধে—যাহারা তাহাদের অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে,

বিভ্রান্ত করিয়াছে, নিপীড়ন করিয়াছে। "দুঃখ ও ক্লেশ বরণের মধ্য দিয়া আমরা সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতির সহকর্মী; তাহাদের প্রতি আমরা আজ মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছি যাহাতে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এমন একটি মাত্র গণসম্মেলন গঠিত হইতে পারে, যাহা প্রতিক্রিয়ার পবিত্র সম্মেলনের বিরুদ্ধে একটা কঠিন প্রাচীরের মত দাঁড়াইতে পারে; আমাদের ফ্রন্ট পৃথিবী ব্যাপী।" মঁদ এবং ফ্র মঁদিয়াল পত্রিকায় এই আবেদনটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালের জুন মাসে আমি আন্তর্জাতিক ফাশিস্টবিরোধী কমিটির সভাপতি মনোনীত হই। পারীর স্যুলা প্রেসোয়ার-এ এই সমিতির প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়।

॥ দশ ॥

সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত ফাশিজমের বিরুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। লাইফজিগের বিচার ও ডিমিট্রভের মুক্তিলাভ আমাদের প্রথম জয়লাভ, কিন্তু হিটলারবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। টর্গলের, থেলমান এবং জার্মানীর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তিলাভের জন্য আমরা অভিযান শুরু করিলাম। ভিয়েনায় শ্রমিক বসতিতে বোমাবর্ষণের পরে (১৯৩৪ সালের ২১শে মার্চ ও ২০ জুন) পরদিন ডালফাসকে আমরা তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলাম। সেকুর রুজ আঁতেরনাসিয়নাল-এর সদস্য হিসাবে আমরা মুসোলিনীর কারাগার হইতে মহাত্মা গ্রানস্কি ও তাহার সঙ্গী-গণকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম (১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর)। অষ্টুরিয়াসের অপরাজিত বিপ্লবের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাইলাম। কটা ও কালো মহামারীর বিরুদ্ধে আমার এই অভিযান আমি ভারতবর্ষে পর্যন্ত প্রসারিত করিলাম, কারণ সেখানেও

তাহাদের প্রচারকার্য বিষ ছড়াইতেছিল (১৯৩৩ সালের ২৭শে নভেম্বর "ভারতীয় যুবকগণের প্রতি") ।

পশ্চিমে "উদার" জাতিগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ("মীরাট মামলার বন্দিগণ", ১৯৩৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী)। "স্বাধীনতার সর্বশেষ দুর্গ" দালাদিয়েরের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ("সাইগন বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে", ১৯৩৩ সালের মে মাস) আমরা যুদ্ধ চালাইলাম। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পারীতে ফাশিজম্ চূর্ণ হইয়া গেল। আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলাম (কলংক ধ্বংস কর, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ সাল) যুবকগণের নিকট আবেদন জানাইলাম (১৯৩৪ সালের মে মাস) এবং বণিকস্বার্থের ফাশিজমের সহিত আত্মপ্রতারক ফরাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর এ অপবিত্র সম্মিলনকে আমি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলাম; ফরাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী তখন "মনের বিপ্লব" এই ছদ্মনামে তাহাদের স্বার্থপরতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল (১৯৩৪ সালের ১০ই জুন তারিখে সোবিয়েৎ সাময়িকপত্র The Scientific & Technical Front-এ প্রকাশিত হইবার জন্য এচাক-এর নিকট লিখিত চিঠি)। আমি আমার সঙ্গীদিগকে, বুদ্ধিজীবীদিগকে আহ্বান করিলাম সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনের জন্য, শ্রমজীবীদের মধ্যে নামিয়া কাজ করিবার জন্য : "তাহাদের দেহ হইতে আমাদের জন্ম, তাহাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, তাহাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তাহারাই গাছের মূল কাণ্ড; বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা এইগুলি বিভিন্ন শাখামাত্র। কাণ্ড যদি দুর্বল হইয়া যায় তবে শাখাও শুকাইয়া যাইবে। বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগী শ্রেণী; শোষণকারীরা তাহাদের যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা দেন তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া তাহারা সাধারণ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে গাছকে আমরা টবের মধ্যে আনিয়া বসাইয়াছি সেই গাছ

হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া ফুলের মত তাহাদের অবস্থা। অল্পকালের জন্য তাহাদের দীপ্তি থাকে তারপর তাহারা শুকাইয়া যায়; লোকে তখন সেগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে, মানব সমাজের দলনকারীর বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আবেদন জানাও। ধনিকের ধনমত্ততা, সাম্রাজ্যবাদীর ক্ষমতা-মত্ততা, বৃহৎ ব্যবসায় কোম্পানীগুলির একনায়কত্ব রক্তপানমত্ত ফাশিজমের নানা রূপ—এই সকলের বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আমি আবেদন জানাই। হে শ্রমজীবী শ্রেণী, আমরা হাত প্রসারিত করিয়া দিতেছি, আমরা তোমাদেরই,—আমাদের মিলিত হইতে দাও। আমাদের মধ্যকার বিভেদ ঘুচিয়া যাক, সমগ্র মানবজাতি আজ বিপন্ন (সেকুর উভ্রিয়ে অঁাতেরনাসিয়নাল নামক পুস্তিকার জন্য ১৯৩৪ সালের ১লা মে তারিখে লিখিত)।

যুদ্ধের ঠিক মধ্যেই বইখানি শেষ হইয়া যায়। এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই যুদ্ধ ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ঊর্ধ্বে পুস্তকের বিরোধী নহে। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। "জাতি ও সভ্যতার দম্ভ লইয়া এই যুদ্ধের উৎপত্তি—ইহার ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হইয়া গেল। ১৯১৪ সালে এই যুদ্ধের ঊর্ধ্বেই আমি ছিলাম এবং আমৃত্যু থাকিব" (১৯৩৩ সালে ১৬ই ডিসেম্বর আঁন্দ্রে বেরতেকে লিখিত চিঠি)। "যে যুদ্ধ সত্যকারের যুদ্ধ, যে যুদ্ধের প্রয়োজন ও বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে যুদ্ধ হইবে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে। সামাজিক, নৈতিক ও জাতিগত কুসংস্কারের বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ পুরাতন ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী জগতকে ধ্বংস করিয়া যাহারা নূতন জগত সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছেন তাহাদের সকল কর্মে সকল আশায়, সকল দুঃখবেদনার মধ্যে আমি আছি।" এবং যেহেতু শ্রমিকবিপ্লব আজ "আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর পুরোভাগে চলিয়াছে, এবং যে সংগ্রামের জন্মলাভের ফলে শ্রেণীহীন, ভৌগলিক ব্যবধানহীন নূতন মনুষ্য

সমাজের সৃষ্টি হইবে সেইহেতু এই বিপ্লবে আমার পরিপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।

জঁা ক্রিস্তফ-এ, কোলা ব্রোঞ্যঁ, ক্লেরঁাবোল-এ আমি ব্যক্তিগত বিবেক ও স্বাধীন মনের শক্তিকে উচ্চ আসন দিতে গিয়া যাহা কিছু বলিয়াছি বা করিয়াছি আমার বর্তমান মত ও পথের সহিত তাহাদের অসামঞ্জস্য নাই ; তাহারাও আনেৎ-এর মত বিপ্লবের বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। ইহার মধ্যে আকস্মিক বা অদ্ভুত কিছু নাই, তাহাদের বিকাশের নিয়মানুসারেই ইহা হইয়াছে।

কিন্তু এই বিকাশের পশ্চাতে যুক্তির প্রেরণা ততটা ছিল না যতটা ছিল তাহাদের ও আমার মানসিক প্রকৃতির প্রেরণা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির যুগে আমাদের এই মানস প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল ; এই যুগের আবহাওয়ায় যে চিন্তার দৈন্য ও বিহ্বলতা দেখা দিল আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে তাহা আঘাত করিয়াছিল, আচ্ছন্ন করিয়াছিল ; কিন্তু কর্মের মুখোমুখি আসিয়া আমি কিংবা আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কখনও পথ ভুল করে নাই। আমরা চিরদিনই ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে লড়াই করিয়া আসিয়াছি।

জঁা ক্রিস্তফ, কোলা, ক্লেরঁাবোল, আনেৎ ও তাহার পুত্র বাঁচিয়াছিল ও মরিয়াছিল সমস্ত মানুষের কল্যাণে। সমাজ হইতে তাহাদের লক্ষ্যবস্তুকে পৃথক করিবার কথা তাহাদের কাহারও মনে হয় নাই—"সবার বিরুদ্ধে যে একক" এই লক্ষ্যবস্তুকে বাঁচাইবার জন্য যে অন্য সকলের বিরোধিতা করিয়াছিল একথা তাহারও মনে হয় নাই। জনগণকে তাহাদের প্রয়োজন ছিল সেবা করিবার জন্য সেবিত হইবার জন্য নহে। মনে, কাজে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া তাহারা জনগণের মধ্যে নিজেদের মিলাইয়া দিয়াছিল। তাহারা নিজেরাও ছিল জনসাধারণ—কর্মরত শ্রমজীবী জনসাধারণ। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল মূলত সমষ্টিগত ; পথে

ছায়া দেখিলে ঘোড়া যেমন হঠাৎ মাথা তুলিয়া পিছু সরিয়া আসে তেমনি আমার মত তাহারাও তাহাদের পবিত্র "স্বাতন্ত্র্যবাদে" বাহিরের স্পর্শ পাইবামাত্রই সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য-বাদের মত মোহময় কথাগুলির জন্য আমরা সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত; কেবলমাত্র দীর্ঘ বেদনাময়, মোহ ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার পর আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের এই বিশ্বাস, সত্য ও সঙ্গত বিশ্বাস, এমন মৃত ও গলিত কতকগুলি দেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলে যাহাদের সাহায্যে একটি চতুর সংস্কৃতি আমাদের প্রবঞ্চিত ও এই সকল কথাগুলিকে শূন্য করিয়া অহরহ সেগুলি এমন স্বার্থ দিয়া পরি-পূর্ণ করিয়া তোলে—কথাগুলির মূল ভাবের যাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক ও ব্যক্তিমানুষের অধিকার—এ সকলের বেলাও এই কথা খাটে। কী তীব্র অন্ধ আবেগেই না আমরা এইগুলিকে আগলাইয়াছি, দেখিতে পাই নাই যে, যে-জিনিস আমার প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেছিলাম সে-জিনিস আসল জিনিস নহে, আসল জিনিসের আত্মসাৎকারী বণিকের ট্রেডমার্ক মাত্র। মেয়েদের মত কথাও আমাদের প্রবঞ্চনা করে। আমাদের সমস্ত ভাবাদর্শ, সমস্ত স্বপ্ন লইয়া আমরা কথার বাহুবন্ধনে ধরা দেই। আমাদের স্বপ্নকে যাহারা প্রতারিত করে, আমাদের আদর্শের যাহারা পরম শত্রু, যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের হাতে সেই আদর্শকে বিকৃত করিতে দিয়া কথার মোহে আমরা ভুলিয়া থাকি!

প্রত্যেক যুগেই দেখা যায় সুইফট-ভল্‌তেয়ার প্রমুখ স্বাধীনচেতা যে-সকল লেখক শাসকশ্রেণীর আশ্রয়পুষ্ট হইতে অস্বীকার করিয়াছেন, নিজেদের রচনা দ্বারা তাহাদের কপটতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহারাই যুগের ও শাসকশ্রেণীর কপটতার মুখোশ বারংবার খুলিয়া দিয়াছেন—যে-যুগ ও যে-শাসক মানুষের মহান ও পবিত্র

ভাবধারাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া রাখে। স্বাধীনচেতা লেখকের কর্তব্য সেই প্রচেষ্টাকে যুগে যুগে বারংবার উজ্জীবিত করিয়া তোলা। কথার মোহ, কথার পৌত্তলিকতা বর্তমান গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠে অগণ্য মানুষের মুখে মুখে, "স্বাধীন" (অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য) সংবাদপত্রগুলির পূতিগন্ধময় নর্দমাধারার মধ্য দিয়া, গণপরিষদের গণিকাদের সহস্র সংস্পর্শে। বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে এই মিথ্যার সুযোগ ও সুবিধা বাড়িয়া গিয়াছে বহুগুণ, মিথ্যার শক্তি যে কতখানি মিথ্যাবাদীরা তাহার জীবন্ত সাংঘাতিক প্রমাণ পাইয়াছে; কিন্তু কথার মোহজালে আচ্ছন্ন মানুষের একদল আজ স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছে "ন্যায়" ও "স্বাধীনতা"র মত তাহাদের প্রাণপ্রিয় কথাগুলিকে হত্যাকারী কপটের দল কিভাবে আপনার কাজে লাগাইতে পারে। ইহাদের আঘাত করিবার জন্য আজ আমাদের দরকার একজন ভল্‌তেয়ারের, কিন্তু ভল্‌তেয়ার আমাদের নাই তাই আগুন আমরা নিভাইতে পারি নাই।

এ-যুদ্ধের অপরপক্ষে ছিল শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন, যে-আন্দোলন হইতে আমরা মুক্তির দৃষ্টান্ত পাইতেছিলাম। সে-পক্ষে এমন অনেক শক্তিশালী লোক ছিলেন যাহারা নিজেদের স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি ও উদীয়মান নূতন জগতের বলিষ্ঠ বাস্তবতার বলে বড় বড় আদর্শগুলির মুখ হইতে বুর্জোয়া-সভ্যতা-প্রদত্ত মিথ্যা মুখোশ টানিয়া ছিঁড়িতে পারিয়াছিলেন। নূতন জগতের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমাদের মনকে প্রভাবিত করিতে হইলে প্রয়োজন নিৎসের মত শক্তিশালী লেখকের (আমি এখানে তাহাকে আর্টিস্ট হিসাবেই উল্লেখ করিতেছি, উন্মাদ ভাবুক হিসাবে নহে)। সংঘর্ষের মত্ততার মধ্যে যাহা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহার বিপুল সমালোচনার দিকেই মন স্বভাবতই ধাবিত হয়; নূতন মানুষ সত্যকার স্বাধীন মানুষ, যে-মানুষ

আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে সেই মানুষ, "সবার সাথে মিলিয়া যে মানুষ এক" সেই-মানুষ সৃষ্টির উদ্দীপনা ও উন্মাদনার দিকে মন প্রথমত যাইতে চাহে না।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মর্মস্থলকে নির্মম স্বচ্ছতার সহিত কার্ল মার্কস্ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের কাছে তাহার প্রতিভার এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। যে-মোহজালে আমরা নিজেদের আচ্ছন্ন হইতে দিয়াছিলাম তাহা তিনি ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, আমাদের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করিবার বিপদ বরণ করিয়াও তিনি আমাদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "গণতান্ত্রিক আইনের তালিকা লিপি" এবং "মানুষের স্বাধীনতা" এই দুইটি বাণীর মধ্যে কতখানি সত্যকার স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিমানুষকে ঐগুলি যে কত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা মার্কসের মত এতখানি চোখে আঙুল দিয়া আমাদের আর কেহ দেখাইয়া দেয় নাই।

"কি লইয়া তাহাদের এই স্বাধীনতা? ছয় নম্বর বিষয়বস্তু: 'অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া যাহা খুশি করিবার ক্ষমতাই স্বাধীনতা' অথবা ১৭৯১ সালের ঘোষণাবাণী অনুসারে; 'অপরে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এমন সব কিছু করিবার ক্ষমতাই স্বাধীনতা'; ইহাতে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া মানুষের বিচরণের ক্ষেত্রকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে: মানুষকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; একের সহিত অপরের মিলনের স্বাধীনতার উপর মানুষের ভিত্তি রচিত হয় নাই, রচিত হইয়াছে মানুষের নিকট হইতে মানুষের বিচ্ছিন্ন হইবার স্বাধীনতার উপর। এই অধিকার সেই বিচ্ছেদের অধিকার, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিমানুষের অধিকার, আপনাতে আপনি আবদ্ধ হইয়া থাকিবার অধিকার··· স্বার্থপরতার অধিকার···এই ব্যক্তিস্বাধীনতায় প্রত্যেক মানুষ অপরের মধ্যে তাহার নিজের স্বাধীনতার বিকাশ দেখে না, দেখে পরিসমাপ্তি।

মানুষের এই ঘোষিত অধিকারগুলির কোনোটিই স্বার্থপর মানুষকে, বুর্জোয়া মানুষকে ছাড়াইয়া যায় না। বুর্জোয়া যুগের এই স্বার্থপর মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত কামনায় এমনভাবে অন্তর্মুখী হইয়া থাকে যাহাতে মনে হয় সে যেন সমগ্র সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র জীব। (Zur Fadenfrage, ১৮৪৩)।

যে-অহংকার নিজেকে চেনে, চেনে না নিজের দীনতাকে, সেই অহংকার বুর্জোয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে। ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সম্প্রতি তাহার বিশ্বাস ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও ইনি আমার বন্ধু তথাপি তাহার ভাবধারার সহিত আমার বিচ্ছেদ আমি বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করি। তিনি লিখিতেছেন: "বিরাট ব্যক্তিপুরুষ কেবলমাত্র নিজের জন্যই জীবনধারণ করেন......নিষ্ঠার সহিত এই আদর্শে আসক্ত থাকিবার মত শক্তি ও মহত্ত্ব তাহার আছে। যে-জনগণের উপর তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন সেই জনগণের জন্য জীবনধারণ করিতেছেন বলিয়া ছলনা তিনি করেন না। (ড্যু স্যুর লে'রোপ, N. F. R. ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৪)।

এই যে বড় বড় কথার আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সাজাইয়াছেন ইহার আড়ালে রহিয়াছে জীর্ণ চীর। তিনি নিজেকে স্বাধীন মনে করেন, নিজেকে মনে করেন ঈশ্বর ও প্রভু। কি লইয়া তাহার রাজত্ব! ধ্বংসস্তূপ। "বুর্জোয়া সমাজের দাসত্বকে বহির্দৃষ্টিতে মনে হয় সব চেয়ে বেশি স্বাধীনতা। কারণ, মনে হয় ইহা যাহা দিতেছে তাহা পরনির্ভরতা হইতে ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু এইখানে সম্পত্তি, শিল্প, (Iudustry), ধর্ম প্রভৃতি যাহা কিছুর সহিতই তাহার জীবনের যোগ নাই তাহারই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাকে সে নিজের স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করে।" (মার্কস: Holy Family)।

লেখক হিসাবে আমার কর্তব্য (এবং এই কর্তব্য কচিত্‌-কদাচিত্‌

আংশিকভাবে আমরা পালন করিয়াছি)। এই অস্পষ্টতার অবসান ঘটানো, মার্কসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'অবাস্তব মানুষ' হইতে মানুষকে সাহস ও শক্তির সহিত মুক্ত করিয়া আনা, মানবীয়তার সহিত সাম্যবাদের একাত্মতা বা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মিলন ঘটানো। আঁদ্রে মালরো শিল্প ও সোবিয়েৎ সভ্যতা সম্পর্কে তাহার চমৎকার বক্তৃতায় এই কথাই বলিয়াছেন (অক্টোবর, ১৯৩৪)।

কিন্তু তিনি বলেন এই মানবীয়তার সূচনা নূতন যুগ হইতে, এবং পূর্ববর্তী যুগে ইহা ছিল বলিয়া তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। পূর্ববর্তী যুগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐ যুগে মানুষ 'নিজের সভ্যতাকে অস্বীকার' করিয়াছে। এইখানেই তিনি ঐতিহাসিক বিবর্তনকে খুব বেশি সহজভাবে বা খুব বেশি বড়ভাবে দেখিতেছেন। আমার মনে হয়, মানবতার একমাত্র ধারক ও বাহক বলিয়া পূর্ববর্তী যুগ উদ্ধত দাবী জানাইয়াছে বলিয়াই মালরো তাহাকে মানবীয়তা হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করিয়া তাহার উপর প্রতিশোধ লইয়াছেন। সত্যকার মানবীয়তা যদি পরিপূর্ণ, সচেতন ও সভ্য মানুষের সন্ধান হয়, যদি উহাতে সবার সহিত একের মিলনের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হয়, তবে মানবীয়তাই ছিল অতীতের চিন্তানায়কগণের মূল সুর। 'Ode to Joy' ও 'Ninth Symphony'র মধ্যে মানুষের মিলনের মহিমার ও ভ্রাতৃত্বের তীব্র উপলব্ধির যে-বাণী শোনা যাইতেছে যে-দুই মহাচেতনার অভ্যুদয়কে মালরো আজ স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছেন তাহা উপলব্ধির জন্য শীলারের সহিত বিটোফেন ত' নবযুগের অভ্যুদয়ের জন্য বসিয়া ছিলেন না।

আজ যে সকল মহান শিল্পী নবযুগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছেন তাহারা তাহাদের পূর্বাচার্যগণের মত প্রভাতের পূর্বেই দিনের আবির্ভাবকে ঘোষণা করিতেছেন না। আজ অবশেষে তাহাদের

আহ্বানে সেই দিন সমাগত। আজ আর্টের আদর্শ ও সমাজসংগ্রামের মধ্যে মিলনের সেতু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্টের স্বপ্ন আজ আর প্রতিভার ধ্যানদৃষ্টি নহে; সে-স্বপ্নে আজ বাস্তবের ঠাসবুনানি। বাস্তব জগতেই সে-স্বপ্ন আজ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। মানুষের মনে আজ এক সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়াছে—নিরাপত্তার অনুভূতি, আজ আর আগের মত মানুস জলের উপর হাঁটে না।

ভগনার যখন তার 'ত্রিস্তান' লেখেন তখন ইউরোপে কেহ উহা শুনিবার বা বুঝিবার নাই বলিয়া হতাশায় তিনি নাকি উহা রিও ডিজানিরোর এক কাল্পনিক শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য লিখিয়াছিলেন। আগামী যুগের উপযোগী আর্ট সৃষ্টি করিয়া প্রতিভাবান আর্টিস্টগণকে সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ মানুষের এমন ছবি মনের মধ্যে আনিতে হইয়াছিল যাহারা তাহার আর্ট বুঝিতে পারিবে। আজ তাহাদের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির সেই শ্রোতৃ-সাধারণ সমুপস্থিত। আমরা আজ আর একা নই। আমরা একসঙ্গে কথা কহিয়া চলিয়াছি। যদিও সমাজের বর্তমান স্তরকে আঘাত দিয়া একটু আগাইয়া দেওয়া, আগামীদিনের বাস্তব সম্পর্কে স্বপ্ন আনিয়া দেওয়া মহান শিল্পীর চিরদিনের কর্তব্য থাকিবে, তথাপি তাহার স্থান অন্যান্য মজুরের মধ্যেই। আজ তাহারা সকলেই একসাথে একই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতেছে। আগে যাহারা উপাসনা মন্দির নির্মাণ করিত তাহারা খাটিত :

আজ আমাদের চোখের আচ্ছাদন খুলিয়া গিয়াছে। যে স্বাধীন শক্তি-নিচয়ের মুক্তির জন্য আমরা অন্ধের মত এতকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, এক সমাজতান্ত্রিক সমাজে আজ তাহার সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ শুরু হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমরা দীর্ঘদিন যে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছি তাহার মূলে ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। (কিন্তু ক'জন সমাজতন্ত্রীই বা উহা তখন বুঝিয়াছিল!)

স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের সহযোগিতা ও সম্মেলনের উপর যে-সমাজ গড়িয়া ওঠে সে-ই সমাজতন্ত্রী সমাজ। মার্কস্ নিজেই ত' বলিয়াছেন। "সকলের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ।"

সম্প্রতি (২৩শে জুলাই, ১৯৩৪) এইচ. জি. ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎকালে স্টালিন ওয়েলসের মধ্যশ্রেণীসুলভ ভীতিতে সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেন যে, "ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টিমানুষের স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, থাকা উচিত নয়। দু'এর মিলন ঘটাইতেই হইবে। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।"

স্টালিন স্বার্থ সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন; ভাবধারা সম্পর্কেও সেই কথাই বলিতে পারিতেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থার কঠিন মুঠিতে পিষ্ট হইয়া সমস্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কৃতি আজ মরিতে চলিয়াছে। স্থবির কাপুরুষ পাশ্চাত্য সমাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার হাতেই নিজের শক্তিশালী মনস্বীদের সঁপিয়া দিয়া আসিতেছে। আজ এই সমাজের নূতন জন্ম হইতেছে, মজুরশাসিত সমাজের উর্বর মাটিতে পুরাতন তরু নবজীবন লাভ করিতেছে; লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ-রসে পরিপুষ্ট হইয়া এই তরু দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে।

কয়েকমাস আগে (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) মস্কোতে পারস্যের প্রাচীন কবি ফেরদৌসীর সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। লেনিনের এই বাণীকে স্মারক করিয়া উৎসব শুরু করা হয়ঃ "মানব-সমাজের সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়া যে-সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিখুঁত জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই শ্রমিকসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে।" এই প্রসঙ্গে সোবিয়েৎ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি এনুকিজে বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন গ্যয়টে ও বিটোফেনের শত

বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিয়াছে এবং আজ সে পুস্কিনের শতবার্ষিকী ও বিখ্যাত জর্জীয়ান কবি রুস্তাভেলির ৭৫০তম বার্ষিকী করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তিনি ঘোষণা করেন: "মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি তাহাদের সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়া যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সবচেয়ে ভালোটুকু আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কারণ নূতন সমাজের নির্মাণকার্যে আমরাই মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী।"

চিরজীবন আমরা এই স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি—সর্বজনীন প্রাণের স্বপ্ন; এই স্বপ্নই আজ জয়ী হইয়াছে। সুদীর্ঘ মৃত্যুনিদ্রা হইতে জাগিয়া, অতীতের কবর হইতে এই স্বপ্ন বাহির হইয়া নূতন জীবনের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফেদর গ্ল্যাডকভ ও ইলিয় সেলভিনস্কিকে লিখিত এক পত্রে আমি সেক্সপিয়রের এণ্টনি ও ক্লেঅপেট্রার সেই অনৈসর্গিক দৃশ্যের উল্লেখ করি যেখানে "পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী মহাসংগ্রামের পূর্বসন্ধ্যায় অন্ধকারে এণ্টনির শিবিরের উপর আকাশে রহস্যময় সংগীত ভাসিয়া যাইতে শোনা গেল— যেন কোন অদৃশ্য অশ্বারোহীদল সংগীত ও বাদ্যের সমভিব্যবহারে চলিয়া গেল।...ইহা ডিওনিসসের অশ্বারোহীদল; পুরাতন জগতের দুই দেবতা মানবীয়তা ও স্বাধীনতা তাহার শিবির ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।" তাহারা নূতন সমাজব্যবস্থার দিকে চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের পূজারী আমরাও তাহাদের পিছু চলিয়াছি। তাহাদের আমরা সেবা করিতে চাই, যে-সমাজে তাহারা উদ্দীপনা আনিবে সেই সমাজকে আমরা সেবা করিতে চাই। আমার বুকে তাহাদের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে বলিয়াই আমি শেষে নূতন জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। যে পথে আসিয়াছি সে পথ অন্ধকার কণ্টকাকীর্ণ। সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, কখনও পড়িয়াছি আবার উঠিয়াছি; কখনও পথ হারাইয়াছি আবার পথ পাইয়াছি, আবার দৃঢ়পদে যাত্রা শুরু করিয়াছি। এ শিখার উজ্জ্বলতা যেন চিরদিনই

বাড়িয়া চলে। মুক্ত আত্মা যেন মুক্ত মানুষকে, বিশ্বজনীন সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রগুলির জনগণকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে। এই জনসম্মেলনই পৃথিবীতে আনিবে শান্তি, মানুষের শ্রমের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে অবাধ প্রগতির প্রান্তরভূমি।

॥ হে অতীত, বিদায় ॥

১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত আমার দুই সিরিজ প্রবন্ধ সম্প্রতি আবার পড়িতেছি। প্রবন্ধগুলি দুইটি বিভিন্ন নামে (ও-দস্যু দ্য লা মলে ও লে প্রেকুারসোর) সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি একটি চিন্তাধারারই তথা একটি কর্মধারারই ক্রমবিকাশ; তখনকার দিনের ভাবাবেগকে তাই উহা গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। আর পড়িতেছি যুদ্ধের কয়েক বৎসরের আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী। এই ডায়েরীর ত্রিশটি প্রকাশিত খণ্ডে রহিয়াছে বহু চিঠিপত্র এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধাবলীর ভাষ্যরূপে আমার ভাববিবর্তনের পথরেখা; রহিয়াছে আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যের চাবিকাটি। এ যেন এক দীর্ঘ, ঝটিকাসংকুল সমুদ্রযাত্রা; যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু এ-যাত্রার শেষ হয় নাই। গত সতের বৎসর ধরিয়া এই যাত্রা চলিয়া আসিতেছে অবিশ্রান্তভাবে।

১৯১৪ সাল হইতে যাহারা আর আমার সন্ধান পায় নাই, ও-দস্যু দ্য লা মলে-র রচনাকালে, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আমি যে স্থানটি হইতে আমার এই যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম আজ সেই স্থানে আসিয়া তাহারা যদি মনে করে যে, আবার আমাকে তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে, তবে তাহারা খুব ভুল করিবে।

সেদিন এক অব্যাহত যাত্রার সবেমাত্র সূচনা। এই যাত্রাপথে আমি বহু সংস্কার, বহু মোহ, বহু বন্ধুত্ব পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি।

এই যাত্রা আমার আজও শেষ হয় নাই। এই যাত্রাপথের শেষপ্রান্তে মানুষ যখন পৌঁছায়, তখন অঙ্গে তাহার আবরণ থাকে না, কারণ মলিন মাটিতে সে তখন তাহার পাকা আসন পাতিয়া বসে; ধরিত্রীমাতার কাছে তার সব লেনাদেনা চুকাইয়া দেয়।

যদি কখনও সময় পাই তবে ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রার সমগ্র কাহিনী বলিব। এ কাহিনী এমন এক স্বীকারোক্তি যাহার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের একটি মুমূর্ষু শ্রেণীর পুরা একটি পুরুষ তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে—অবশ্য যদি এত কাণ্ডের পরও নিজের মুখের ছবি দেখিবার সাহস তাহার থাকে। এই শ্রেণী বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী; ইহারই শুষ্ক শীর্ণ ভাবাদর্শকে ধ্বংস করিয়া এক নূতন জগতের শ্যামল সতেজ জীবনতরুকে যাহারা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে আমরা নিজেরাও আছি!

কিন্তু এখানে আমি যুদ্ধের চারি বৎসরে ভাববিবর্তনের গতিরেখা ছাড়া আর কিছুই আঁকিব না,—অদৃশ্য তীরন্দাজের ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত মুক্ত মনের শায়কের পথটিকে মাত্র আমি দেখাইয়া যাইব। কথায় বলে, ভালোভাবে যে কাজের শুরু, আধখানা তাহার সমাপ্ত। যাত্রারম্ভের প্রথম পদক্ষেপ পরবর্তীকালে যতই দ্বিধাদুর্বল মনে হোক না কেন, ঐ প্রথম পদক্ষেপের মধ্যে ত' সমগ্র যাত্রার পূর্বাভাস রহিয়াছে। পাশার দান পড়িয়াছে। এখন অবিশ্রাম আগাইয়া চলিতে হইবে, আর থামা চলিবে না।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই যাহার এইভাবে যাত্রা শুরু, নিশ্চয়ই সে জানিত না কী সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতেছে, জানিত না কীই বা ভবিষ্যতে পাইবে। জানিত না কোন দিগন্ত মুছিয়া যাইতেছে, ভাসিয়া উঠিতেছে কোন নূতন দিগন্ত। ......যাত্রী আসিতেছে বহুদূর হইতে। সে আসিতেছে পুরাতন বুর্জোয়া ফ্রান্স হইতে—প্রাচীন প্রাদেশিক

ফ্রান্স হইতে ; আসিতেছে পিতৃভূমি ও বিপ্লব এই দুই যমজধর্মের রসধারাপুষ্ট দেশের অন্তর্লোক হইতে। (এই বিপ্লব ১৭৮৯ সালের বিপ্লব, তাহাদের কাছে একমাত্র বিপ্লব। ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী উহার আগেকার বিপ্লবকে করিয়াছে উপেক্ষা, পরের বিপ্লবকে করিয়াছে অস্বীকার। এই বিপ্লব তাহাদের নিজেদের বিপ্লব, তাহাদের আপন ভাগ্যের শীর্ষদেশে এই বিপ্লব তাহাদের উন্নীত করিয়াছে। তাহাদের ধারণা ছিল ভাগ্যকে তাহারা সম্পূর্ণ জয় করিয়াছে ; বিপ্লব তাহাদের করায়ত্ত)। ভালমির কামান গর্জনের মধ্যে, আর্মারের সংগীতধ্বনির মধ্যে এই দুই ধর্ম মিলিত হইয়াছিল। ইহাদের একটি পিতৃভূমি ; আমার শৈশবকালে ১৮৭০ সালের রক্তস্নানে আপনার অবসন্ন শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। প্লাস দ্য লা কঁকর্দের অভ্যন্তরে অবগুণ্ঠিত স্ট্রাসবুর্গের মূর্তিই ছিল তার বেদী, উপাসনা মন্দির, সেখানে নিত্য Revanche গান ধ্বনিত হইত।

বাকী রহিল রিপাবলিক। প্রেসিডেণ্ট গ্রেভী ও তাহার জামাতা উইলসনের আমল হইতে এই রিপাবলিক সম্পদশালী, আরামপ্রিয় ও সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহা সরকারী ধর্মসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, ১৮৮৯ সালে ইহার অভিষেক হয় ; একশ' বছর আগে অধিকৃত বাস্তীয় দুর্গকে বুর্জোয়াশ্রেণী বিগ্রহ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এই সময়, এবং এই বিগ্রহই হয় তাহার টাকার বাক্স। রিপাবলিকের উপাসনা মন্দিরে সর্বদা ইচ্ছা করিয়াই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া রাখা হয়, এই বিভ্রান্তির জন্ম সুদূর অতীতে। এই বিভ্রান্তির কথা আবার ভাবিতে হইবে। আর্মিডোরের তরবারির দিন হইতে '৮৯ সালের বিপ্লবকে স্বার্থপর ভাগ্যান্বেষীর দল প্রতারিত করিয়া আসিতেছে। ইহারাই ঐ বিপ্লবকে প্রথম নেপোলিয়ানেরই অধীনে 'ডাইরেক্টরী'তে পরিণত করে। কিন্তু গিরোদিন ও আত্মবিক্রিত

জ্যাকোবিনদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ একদিন যাহাদের তাহারা গিলোটিনে বলি দিয়াছে তাহাদেরই সম্পত্তি ও টাকার থলির উপর দাঁড়াইয়া বিপ্লবের বাহিরের রূপ ও পদ্ধতি বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। তারপর স্থূলকায় মেদস্ফীত হইয়া তাহারা কমিউনের 'শীর্ণদেহ মানুষগুলি'কে পিষিয়া মারিয়া নিজেদের 'পানামা' খালের পায়ে বিক্রয় করিল।

সেই 'পানামা' কলংকের দিনে আমি ছিলাম একজন তরুণ অধ্যাপক। বাস্তবসম্পর্কশূন্য নীতিজ্ঞান আমাকে শিখাইতে হইত। এক বৎসরের বেশি আমি ইহা সহ্য করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই মিথ্যা প্রতারণামূলক নীতি কত পুরুষ ধরিয়াই না লোকে চোখ বুজিয়া গিলিয়া আসিতেছে। কতদিন ধরিয়া না 'স্বাধীনতা', 'সাম্য', 'ভ্রাতৃত্ব' এই বমনোদ্রেককারী তিনটি কথার মধ্যে কত বড় না মিথ্যা আদর্শ আপনাকে প্রচার করিয়া আসিতেছিল। তবু কত লোকই না সর্বমনেপ্রাণে ইহা বিশ্বাস করিত। তাহাদের এই দেবতাত্রয়কে অগ্নি পরীক্ষায় যাচাই করিবার বিপদ হইতে তাহাদের রক্ষা করিয়াছিল। তখনকার সেই শান্ত নিরাপদ দিনে মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, ক্ষুদ্র জীবিকা লইয়া নম্র, নির্জন, শ্রমবঞ্চিত, নিষ্কলুষ জীবনযাপন করিত। তাহাদের চোখে না ছিল বৃহৎ আদর্শের বিদ্যুদ্‌দীপ্তি, না বাজিত বুকে আঘাতের বেদনা।........

সময় যখন আসিল, কেহ তাহাকে অভিনন্দন করিল না। আসিল 'ড্রেইফ্যুস কলংকে'র আঘাত। পিতৃভূমি ও বিপ্লব পরস্পর সংবদ্ধ আদর্শের এই দুই মূর্তি দুই ব্যাঘ্রের মত মুখোমুখি দাঁড়াইল। দেখিলাম সরকারী মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে; এক মুহূর্তে দেখিলাম স্বাধীনতা ও বল দুই শক্তিঃ বিপ্লব ও সেনাবাহিনী—চারিদিকে হিংসা। সত্যনিশ্চেতন কোনো জাতির পক্ষে সহসা সত্যের মুখোমুখি হওয়া

বড় বিপজ্জনক। কয়েক মাস ধরিয়া এই ঝড়ের ঝাপটে ফ্রান্স ধূলিলুণ্ঠিত রহিল, মনে হইল সব বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কারো কারো মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্য বিকৃত হইয়া গেল।

দুইটি পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসকে কিছুতেই মিলিত করা গেল না; কোনো একটিকে পরিহার করাও গেল না। জনসাধারণ আর মাথা ঘামাইতে চাহিল না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে তাহারা আবার ডুবিয়া গেল। এই সমস্যার গভীরে যাইবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না—অতএব একটা মৌন নিষ্পত্তির ফলে সংকটের অবসান হইয়া গিয়াছে। পরস্পরবিরোধী ও ছদ্মবেশী দুই মূর্তির মধ্যে একটা নির্বাক নিষ্পত্তি হইয়া গেল; কারণ তাহারা জানিত একের সমর্থন না থাকিলে অন্যের চলিবে না। এবং এই আপসের প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি খোয়াইয়া জাতি বুদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আপসরফা করিয়া আরামে গা ঢালিয়া দিল! আপস হইল সবকিছুর—পিতৃভূমির, ন্যায়ের, স্বাধীনতার ও সভ্যতার। ইহাদের পতাকাতলে আবার আশ্রয় পাইল ডাকাতির সোনা—আশ্রয় পাইল রাষ্ট্রনীতি ও গুপ্তসন্ধির সেইসকল নায়কগণ যাহারা জাতির ভাগ্য ও বৃহৎ শক্তিনিচয়ের স্বার্থে বাকী পৃথিবীর লুটের ধন লইয়া জুয়া খেলায় মাতিয়াছিলেন।

১৯০০ সালের কাছাকাছি মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ (ইহাদের মধ্য পেগির সহিত আমিও ছিলাম) এই আপসের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। নিষ্কলুষ নিষ্ঠুর সত্যের নেশায় এই ছোট দলটি তখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর তাহাদের মনে আবার লাগিয়াছে বিটোফেন ও 'রেসারেকসন'-এর ছোঁয়া। সভ্যতার পাপ ও রাজনীতির ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কাইয়ের দ্য লা ক্যঁাজেন শুরু করিল দুঃসাহসিক আক্রমণ। পিতৃভূমি ও মানবসমাজ—এই দুই আদর্শ লইয়া আমরা তখন মগ্ন হইয়া ছিলাম। এই দুইয়ের মধ্যে

মিলন ঘটাইবার অথবা দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার জন্ত সময় না লইয়াই আমরা তাহাদের মন্দিরে যে-পাপ সাধিত হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিলাম। সংকল্প করিলাম ঐ মন্দিরে টাকার থলি খুলিয়া যাহারা দেনা-পাওনার আসর জমাইয়াছে তাহাদের দূরে তাড়াইয়া যুগল দেবতার পূজাকে পবিত্র করিয়া তুলিব। দুই দেবতা আমাদের কাছে তখন অভিন্ন। জঁা ক্রিস্তফ ও পেগি তখন কর্মের এক অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগে অধীর; এমন এক বীরধর্মে তাহারা আত্মহারা, যাহার আবেগে যে কোনো বিশ্বাসের পদমূলে জীবন সঁপিয়া দিয়া, সর্বস্ব বলি দিয়া মানুষ শান্ত হয়। সেদিনের সেই নেশায় যাহারা পাগল হইয়াছিলেন এবং যাহারা সে ভাবসুরাপানকে কখনো অস্বীকার করেন না, তাহাদের একজন জঁা রিশার ব্লক! তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত দেস্তঁ্যা দ্যু সিয়েক্ল পুস্তকে লিখিতেছেন (১৯৩১): "আমাদের সমগ্র যৌবন কাটিয়াছিল একটিমাত্র কথার নেশায়: সেবা।" এই কথাটিই ছিল আমাদের জীবনবেদের মূলবাণী, আমাদের সম্মেলন মন্ত্র। ...টলস্টয়ের সমগ্র মানবজীবনকে অভিভূত করিয়াছিল এই একটি কথা।...পেগির সহিত জঁ্যা ক্রিস্তফ এবং ড্রেইফ্যুস সংকটযুগের অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগ এ-সকল মিলিয়া আমাদের চারিপাশে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও নিভিক কর্তব্যের এক দুর্গ গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমাদের ছিল স্বেচ্ছায় সেবার আদর্শ। আর এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়াই আমরা ১৯১৪ সালের সংকটে স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছিলাম—'আমাদের আদর্শের ইহাই হইল সব চেয়ে শোচনীয় পরিণতি।' জঁা রিশার লিখিতেছেন "আত্মদানের এই অতিআসক্তির হাত হইতে আমি ছাড়া আর বিশেষ কেউ নিষ্কৃতি পায় নাই, কারণ আমি ছিলাম সকলের চেয়ে বেশি টলস্টয়পন্থী; তাই আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম এই সেবা-দাসত্বের পরপারে ধর্মাসক্ত বিবেকের স্বাধীন, স্বতন্ত্র গভীর নির্জনতা।" জঁা

রিশার হয় ত' বুঝিতে পারিবেন কী গভীর দুশ্চিন্তা লইয়া আমি দেখিতেছিলাম যে-স্রোতস্বিনী জঁা ক্রিস্তফ নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল সেই স্রোতস্বিনীর মধ্যে আমার বন্ধুরা ও ছোট ভাইয়েরা ডুবিয়া যাইতেছে। তবে কি তাহারা তাহাকে অনুসরণ করে নাই!

অনুসরণ তাহারা ঠিকই করিয়াছিল! কিন্তু পরপার হইতে অনুসরণকারিদিগকে স্রোতউত্তরণে সাহায্য করিবার মত সময় ক্রিস্তফের ছিল না। আমার নিকট আমার এই বন্ধুদের একজনের মায়ের লেখা একখানি চিঠি (১৯১৪ সালের ২৫শে অগাস্ট তারিখে লেখা) এখানে আমি উদ্ধৃত করিতেছি। বন্ধুটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক— নিষ্কলুষ, হৃদয়বান, প্রাণাবেগে পূর্ণ। যুদ্ধের প্রথমদিকে লোরেনের একটি সংঘর্ষে ইনি নিহত হন। চিঠিখানি এই:

"আমাদের একমাত্র পুত্র জার্মান বুলেটে নিহত হইয়াছে। যুদ্ধে যাইবার পূর্বে সে প্রায়ই আপনার কাছে চিঠি লিখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিত। জানি না শেষ মুহূর্তে এই বাসনা সে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে কিনা এবং এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি তাহার অনেক বন্ধুর, যাহারা হয় ত' তাহার মত আজ এ-জগতে নাই, মনোভাব আপনার নিকট ব্যক্ত না করিয়া পারি না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সংশয় ও সমালোচনার মনোবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া যে-শক্তি ও বীরত্বকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এই প্রাণবান হৃদয়বান তরুণেরা সেই শক্তি ও বীরত্বকে আপনার রচনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে। আপনার রচনা পড়িয়া তাহারা সত্যই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে; আপনার প্রেরণার উত্তাপ তাহাদিগকে জীবনের সহজ বাস্তবতা হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়াছে। আপনার বাণী তাহাদের দিয়াছে সেই আনন্দময় আবেগ, যাহা বুকে লইয়া তাহারা এতখানি দৃঢ়পদে রণাঙ্গনে যাত্রা করিতে পারিয়াছে, পশ্চাতের আকর্ষণে এতটুকু বিচলিত হয় নাই। তাহাদের

বিয়োগবেদনাকে আর এই ভয়াবহ যুদ্ধের অনুগামী দারুন দুর্দিনকে আমরা হাসিমুখে বহন করিব, তাহাদের আত্মবলিদানের সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করিয়া। তাহারা আপনার কাছে যে কতখানি ঋণী তাহা আপনাকে জানাইতে চাই, আর জানাইতে চাই তাহাদের কৃতজ্ঞতা…"

এই কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর যখন শুনিলাম যুদ্ধের কল্যাণে আত্মবলিদানের গুণকীর্তনে বারেস ও বুর্জে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, তখন আমার বেদনাবিদীর্ণ অন্তরের তলদেশ মথিত করিয়া তাহাদের উদ্দেশে এই আর্ত বাণী বাহির হইয়া আসিল ঃ পাপিষ্ঠ তোমরা, এই তরুণ বীরদের হৃদয়ে আত্মবিনাশের বাসনার এই বীজ ত' আমরাই রোপন করিয়াছি। এ বলি ত' আমরাই প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু তোমাদের জন্য, তোমাদের যুদ্ধের জন্য ত' ইহা আমরা করি নাই। তোমাদের যুদ্ধ কাহাকেও কিছু করিতে পারে নাই! তোমাদের যুদ্ধে তাহারা খুন হইয়াছে।…"

যে মানুষ লিখিয়াছিল 'সংগ্রামের উর্ধ্বে' এই হইল তাহার ট্রাজেডি। ১৯১৪ সালের শৌর্যবান এই এক পুরুষ—আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের, শিষ্যদের, সন্তানদের লইয়া গঠিত। আমাদের শিক্ষাতেই ইহারা শিক্ষিত, কিন্তু এই শিক্ষার প্রয়োগপন্থা তাহাদের জানাইবার মত সময় আমরা পাইলাম না। পাইলেও জানাইতে পারিতাম না। কারণ, স্বীকার করিব, আমাদের নিজেদেরই ইহা জানা ছিল না। যেখানে দুই পথ আসিয়া মিশিয়াছে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা ইতস্তত করিলাম!

আমার এই স্বীকারোক্তি জাতির এক পুরুষের স্বীকারোক্তি! অন্য কাহারও চেয়ে আমার নিজের অপরাধ কম নহে। পিতৃভূমি ও মনুষ্য সমাজ—এই দুই আদর্শ লইয়া মারাত্মক বিভ্রান্তির অবসান অগাস্টমাসের প্রথমদিকে আমাদের মধ্যে একজনও ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। আমরা

কোনোটিকেই ত্যাগ করিতে চাহিলাম না। দুইয়ের মধ্যে আপস চলিতে পারে এই দুরাশায় অন্ধ হইয়া আমরা অন্ধকারে পথ হাতড়াইতে লাগিলাম। আমরা, এই 'আমরা' বলিতে আমি কেবল বুদ্ধিজীবীদের কথা বলিতেছি না (বুদ্ধিজীবীরা তখন মক্ষিকাপালের মত ঘুরিতেছিল)। কর্মজীবী বহু লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন; ইহাদের অনেককে আমি জানি। রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা ইহাদের কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন জোরে নিজে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইনি স্থির করিতে পারেন নাই, রোমক আদর্শে সমগ্র জাতির অস্ত্রসজ্জা অথবা জাগ্রত জনগণ কর্তৃক আত্মভাগ্য নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ, ইহার কোনটি শ্রেয়। কিন্তু, তখন গহ্বরমুখ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে !....পথ বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সময় আর নাই। আমাদের পক্ষ হইতে বাছিয়া লওয়া তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই দানবীয় অতীতকেই ·আমরা গ্রহণ করিয়াছি— যে অতীত আমাদের ভবিষ্যতকে লিখিতে শুরু করিয়াছে। তখন আমি সুইজারল্যাণ্ডে এক দীর্ঘ ক্লান্তির স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিতেছিলাম। সেই নয়নমনোহর গ্রীষ্মঋতুর জুন-জুলাই মাসের দিনগুলিকে অন্ধকার করিয়া আকাশে যে মেঘ জমিতেছিল, প্রেমের বাহুপাশে দৃষ্টি আবৃত থাকায় আমি তাহা দেখিতে পাই নাই। (এত মনোরম গ্রীষ্মঋতু ত' আর আসে নাই ! ইউরোপে যখন হত্যাযজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল তখনকার সে-দিনগুলির সে কি চোখ-ধাঁধানো রূপ !) । আমার চোখের উপর হইতে দয়িতের চম্পক অঙ্গুলিগুলি যখন সরিয়া গেল তখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ও যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে।

সেই অন্ধকারে পথ খুঁজিতে আমার সময় লাগিল। আর কাহাকেও যে দেখাইতে পারি সে-কথা তখনও চিন্তাও করি নাই। সে কাজ আমার নহে। আমি কি ? আমি তখন একজন কবি ও সংগীতকার, যাহার ধ্যানের প্রাঙ্গনে মাঝে মাঝে ভবিষ্যত দুর্দিনের দুশ্চিন্তার ছায়া

পড়ে মাত্র। (বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইউরোপের ভীষণ দুর্দিনের পদধ্বনি আমার কানে আসিয়াছে, প্রথমজীবনে লিখিত আমার একাধিক নাটিকায় ইহার সাক্ষ্য আছে)।

কিন্তু এ পর্যন্ত রাজনীতি আমি স্পর্শ করি নাই। আমার মানসপুত্র, ত্রিশ বৎসরের আমি, জঁ্যা ক্রিস্তফ্ আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই আমার নামকে করিয়া তুলিল একটি সম্মেলনক্ষেত্র, পর্বতচূড়ায় একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা (জ্বলন্ত হইলেও যাহা ধূমবিহীন নহে); নৈতিক জীবনের পরিচালক ও সঙ্গী কোনো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ফ্রান্সের তরুণগণ। কিন্তু যেখানে সমাজসংগ্রামে কর্মের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, নির্দেশের জন্য আমি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়াছি, তাকাইয়াছি সোশিয়ালিস্ট নেতাগণের মুখের দিকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু। আনাতোল ফ্রাঁস ও অক্টাভ মিরাবোর মত সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিজীবীদের দিকেও তাকাইয়াছি। দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর তাহারা প্রবল প্রতিক্রিয়াবন্যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। নির্দেশের জন্য গিয়াছি শিক্ষালয়ের পণ্ডিতদের নিকট, গিয়াছি আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের কাছে, যাহাদিগকে একল নর্মাল স্যুপেরিয়োর ও সরবন-এ প্রথমে ছাত্র হিসাবে ও পরে অধ্যাপক হিসাবে নিবিড়ভাবে জানিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ইহাদের স্বচ্ছ ধীশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনাপদ্ধতি ও সত্যানুরাগ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম ইহাদেরই আছে মনের স্বাধীনতা ও অকলংকিত বিচারবুদ্ধি। অন্ধকারে দিশাহারা আমি তখন অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলাম, কখন তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিব : "এই পথে......"

আসিল না এই নির্দেশবাণী, আসিল শুধু রণাঙ্গনগামী সেনাবাহিনীর পদশব্দ, আর আসিল আরামকেদারাশায়ী বীরগণের অর্থহীন নির্বোধ গান : "আলে, আঁফাঁ দ্য লা পাত্রি।"

সকলেই তখন তাহাদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; জোরে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হইলাম। অগাস্টের প্রথম কয়েক বৎসর নিজের সহিত কথোপকথন চালাইলাম, নানাভাবে প্রশ্ন করিলাম বিবেককে, করিলাম ঈশ্বরের মধ্যে আত্মগোপন। বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল পিতৃভূমি ও মানবসমাজ আমাদের এই দুই দেবতার একটি অপরটিকে গিলিয়া খাইয়াছে। যেটি রহিয়াছে সেটিকেও লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। এই একক দেবতায় বিশ্বাস অটুট রহিল কি কেবলমাত্র আমারই! কাল পর্যন্ত যাহাদের বিশ্বাস অটুট ছিল তাহাদেরও কেহ যখন কোনো কথা কহিলেন না তখন আমার কি বলা উচিত হইবে? কীই বা আমি বলিব? বলিবার কি অধিকারই আমার আছে? কেই বা আমার কথা শুনিবে? রণাঙ্গন হইতে বন্ধুগণের প্রথম পত্র আসিতে শুরু করিল। উৎসাহের আর অন্ত নাই; ফরাসী কলিতে বিশ্বাস তাহাদের তখন উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে কলির হাজার মাথা, অতীতের পিতৃভূমি, ভবিষ্যতের পিতৃভূমি, রাজন্যবর্গের পিতৃভূমি, গণতন্ত্রের পিতৃভূমি, ধর্মযুদ্ধের পিতৃভূমি, উপাসনামন্দিরের পিতৃভূমি আর পিতৃভূমি বিপ্লবের।

১০ই অগাস্ট তারিখে ডায়েরীতে আমি লিখিলাম: "আমি কি করিতে পারি? এই যুদ্ধ সকলেই চাহে। ইহার বেদীমূলে নিজের রক্ত দান করিতে সকলেই ব্যগ্র। আমি আর তাহাদের করুণা করি না। নিয়তি নিজের পথে চলুক। কিন্তু ঘৃণাকে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিব না।"

De profundis clamans..."হে স্বর্গীয় শান্তি, হে আমার সংগীত, ঘৃণার তলদেশ হইতে আমি তোমাকে উপরে তুলিব..."

তখন আমি "আরা পাসিস" নামক গাথাটি লিখি (অগাস্ট ১৫-২১)। যুদ্ধের মধ্যে এইটি আমার প্রথম সন্তান। কিন্তু শিশুটিকে আমি আমার নিজের

কাছে রাখিলাম। আমি ছাড়া কে আর ইহার কণ্ঠস্বর শুনিবে। এক বৎসরের মধ্যে কাহাকেও ইহা শুনাইতে সাহস করি নাই। এক বৎসরেরও অনেক পরে ১৯১৫ সালের বড়দিনের সময় সুইস পত্রিকাগুলিতে উহা প্রকাশিত হইল। কোনো ফল হইল না; হইল শুধু কিছু স্থূল রসিকতার উদ্রেক।

ইতিমধ্যে প্রতিদিন আসিতে লাগিল বিপর্যয়ের সংবাদ। মন একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। সমগ্র বেলজিয়মে আগুন জ্বলিতেছে। ফ্রান্স পরিবেষ্টিত। মনে হইল বন্ধু, দেশ, সভ্যতা, সবকিছু যেন পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে; মনে হইল নিজেও যেন উহাদের সাথে কোনো জঠর গহ্বরে আসিয়াছি। কখনও কখনও অন্যগুলির চেয়ে সাংঘাতিক কোনো অপরাধের কথা শুনিয়া আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে লাগিলাম। (২৯শে অগাস্ট—১লা সেপ্টেম্বর তারিখে গেরহার্ড হাউপ্টমানকে লিখিত চিঠি)। কোনো সেনাবাহিনীর চেয়ে ও কোনো দেশের চেয়েও বড় কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল। এই বিদ্রোহ আমাদের পূর্বপুরুষগণের উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে, যে-দেবতায় আমরা সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। এই প্রাচীন ক্ষমাহীন দেবতা আমাদের পিতৃভূমি। বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতেছিল তাহারই রক্তসিক্ত বিগ্রহের বিরুদ্ধে।

এই গহ্বরের মধ্যে আমি নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আদর্শের আবেগে অধীর ইউরোপের বীর তরুণেরা কত বড় সাংঘাতিক ফাঁদে পা দিয়াছে, কতখানি সর্বনাশা দুর্বুদ্ধি তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। আত্মোৎসর্গের মহিমা ও মৃত্যুর ক্ষুদ্রতার মধ্যে যে একটি বিরোধ রহিয়াছে—আমার অন্তরকে তাহা বিদ্ধ করিল। সে-দিন যাহারা মরিতেছিল তাহাদের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা এবং অপরদিকে যাহারা মারিতেছিল তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের বিদ্রোহ—এই দুই

বিপরীত আবেগে আমার মন তখন বিদীর্ণ হইতেছিল। মারিতেছিল যাহারা তাহাদের মধ্যে ছিল রণযন্ত্রের পরিচালক পাপাত্মারা, আর ছিল উভয়পক্ষের শিবিরের শয়তান বুদ্ধিজীবীর দল যাহারা রণাঙ্গণের পশ্চাতে নিরাপদ দূরত্ব হইতে যুদ্ধরত তরুণগণের মাথার উপর দিয়া পরস্পরের কটুকাটব্য নিক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছিল।

তখন মার্ন-এর যুদ্ধ চলিতেছিল। এই অবস্থার মধ্যে (১১ই—১২ই সেপ্টেম্বর) আমি 'সংগ্রামের উর্ধ্বে' রচনা করি এবং আমার জেনেভার পুরাতন বন্ধু পল সাইপেলকে পড়িয়া শুনাই।

আজ আবার ইহা পড়িতেছি, পড়িতেছি এই শ্রদ্ধাঞ্জলী সেই তরুণদের উদ্দেশে যাহাদের একদিন বলি দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহারা শেষে আমাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের দৈন্য ও লঘুচিত্ততার শোধ তুলিয়াছিল। সেদিন যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, আজও আমি সেই মতই পোষণ করি। সেদিনের একটি কথাও আজ প্রত্যাহার করিব না। ১৮৮০ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আমার কৈশোরকাল সামাজিক অহমিকা ও হীন সুবিধাবাদের কদর্য আবহাওয়ার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, পারীতে তখন গণপরিষদ ও সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্নীতির বন্যা চলিতেছে। আমার ছোট Aert-এর চেয়েও বেশি প্রাণবান, আত্মবলিদানের জন্য যাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের নিকট আমি নত হইতে পারি না। যদি এই আত্মবলিদানের লক্ষ্য (অন্তত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর পক্ষে) এতখানি পবিত্র না হইত, তবে ক্ষমতা ও জনমতের নিয়ন্ত্রণকারীদিগের হাতে তাহাদের এমন ভীষণভাবে আহত হওয়া আরো শোচনীয় ব্যাপার হইত। আর তারপর, হাসিমুখে যাহারা শহীদ হইতে গেল তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমি তাহাদের হত্যাকারীদের (জ্ঞানেই হোক কিম্বা অজ্ঞানেই হোক) বিরুদ্ধে অভি-যোগবাণী উচ্চারণ করিলাম। এই হত্যাকারীদের মধ্যে ছিল বক্তা,

চিন্তাবীর, গির্জার নায়কগণ ও একাধিক গভর্নমেণ্ট। ইহার ফলেই তাহাদের সমস্ত আক্রোশ আমার উপর আসিয়া পড়ে; পাপাত্মারা নিজেদের চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে।

আমি আর কি করিতে পারিতাম? সঙ্গিহীন, সম্পদহীন সে দুর্দিনে একজন কতটুকু কি করিতে পারিত? বাঁধ ভাঙ্গিয়া ইউরোপ তখন পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে, আমার প্রবন্ধে আমি ইউরোপের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলাম, ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলাম বিপ্লবের এবং একাধিক সাম্রাজ্যের অবসানের, ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলাম জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংসের। "জারদের দিন একদিন আসিবে।"

তখন আমার একমাত্র আশা রহিল মুষ্টিমেয় স্বাধীন চিন্তাজীবীদের একত্রিত করিবার। ভাবিলাম অন্তত চিন্তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধকে যথাসম্ভব অমানুষিক পরিণতির হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে। যুদ্ধ এবং যাহা কিছু মানবিক—এই দুইয়ের মিলন সাধন যে অসম্ভব তাহা তখনও আমার বুঝিতে অনেক বাকী ছিল। ২২শে-২৩শে সেপ্টেম্বর জুর্নাল ছ জেনেভ পত্রিকায় যুদ্ধশান্তির আবেদন জানাইয়া আমার যে রচনা প্রকাশিত হয়, সংযত ভাষায় লিখিত বলিয়া উহার কোনো ফল ফলিল না; রাইন নদীর তীরে তখন গত দশ দিন ধরিয়া মহাযুদ্ধের যে তীব্রতর সংগ্রাম চলিতেছিল তাহার উন্মাদনায় আমার এই আবেদন নিঃশব্দ বিস্মৃতির তলে মিলাইয়া গেল। তখন র‍্যাঁস্ নগরে আগুন জ্বলিতেছে; সেই আগুনের মধ্য হইতে নিবিড় ঘৃণার যে বিষাক্ত ধূম বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহার মধ্যে আমার মিনতি ঢাকা পড়িয়া গেল। সে মিনতি ফ্রান্সের কানে পৌছিল পুরা একটি মাস পরে; ফ্রান্স তখন আর সে-ফ্রান্স নাই।

আর একটি জিনিস প্রথম দুইমাস আমাকে হতাশার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। জার্মানসাহিত্যে ও পুস্তকে যে অবিশ্বাস, বিকারের প্রলাপ

প্রকাশিত হইতেছিল তাহার তুলনায় ফ্রান্সের প্রকাশিত রচনা অনেকটা সংযত ছিল। সর্বোপরি আর একটি জিনিস হইল (ইহাকে বিশ্বাস বলিব কি আশা বলিব জানি না, কারণ বিশ্বাসের উৎস তখন শুকাইয়া গিয়াছে), সে জিনিসটি হইতেছে এই যে, রাশিয়াকে বাদ দিলে যে সব চেয়ে বড় শয়তান সে মিত্রশক্তিপুঞ্জের পক্ষে ছিল না।

শীঘ্রই আমার এ মোহ ভাঙ্গিল।

যে কদর্য ঘৃণাকে সাহিত্যিকেরা ধূমায়িত করিয়া তুলিতেছিলেন, অথচ যাহাতে তাহাদের নিজেদের কোনো বিপদ ছিল না, তাহা ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র-জগতকে বিপুলবেগে সংক্রমিত করিয়া প্রায় সমগ্র জাতি ও তাহার ভাবধারাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম ইহা বোধহয় সাময়িক বিভ্রান্তি মাত্র। প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক বিপদ যতই বাধা পাইতে লাগিল, ততই এই বিষাক্ত সংযম আরো উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল, মৃত্যুর হাত হইতে সদ্য রক্ষা পাওয়া ভয়ার্ত পশু যেন তাহার প্রতিশোধ নিতেছিল। দেশের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, তাহার হিংস্রতা সম্পর্কে মোহমুক্ত মনের কিছু তিক্ত অভিমত ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম। "বর্তমান মানুষের সত্যকার মাপকাঠি কি হইবে" সে সম্পর্কেও লিখিয়া ছিলাম।

যাহাদিগকে সবচেয়ে বেশি জানি মনে করিতাম তাহাদের প্রকৃত রূপ এই সংকটে চোখে প্রতিভাত হইয়াছে। মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে দেখিব ভাবিয়াছিলাম প্রিয়বন্ধুর স্নেহসিক্ত মুখচ্ছবি সেখানে দেখিলাম বাচ্চা নেকড়ের ফ্যানাসিক্ত দাঁত।"

কিন্তু বাচ্চা নেকড়ের চেয়ে বুড়ো নেকড়ে আরও বেশি সাংঘাতিক। এই বুড়ো নেকড়ে-দলের দলপতি ছিলেন বারেস। আর ভয়ে দিশেহারা হইয়া আনাতোল ফ্রাঁস তাহার সত্তর বছরের বার্ধক্যজীর্ণ

কণ্ঠে অন্যসকলের সহিত চীৎকার জুড়িয়া দিলেন; তিনি চীৎকার জুড়িয়া দিলেন কারণ সৈন্যদলে তাহাকে লইত না (২৮শে সেপ্টেম্বর)।

ইউরোপ হইতে আর কিছু আমি আশা করিলাম না। "সমস্ত ইউরোপটা যেন একটা উন্মাদ আশ্রম। এখানে প্রত্যেকেই যেন নিজেকে জগতপিতা ভগবান মনে করিতেছে।" (ডায়েরী, ২৮শে সেপ্টেম্বর)

১লা অক্টোবর তারিখ, অর্থাৎ অন্য সকলের চেয়ে চারবছর আগে যুদ্ধরত দেশগুলির বাহিরে একজন বিরোধ-নিষ্পত্তিকারীর অনুসন্ধান করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌কে আমি লিখিয়াছিলাম, "মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, এই ভয়াবহ যুদ্ধের লক্ষ্য যাহাই হোক না কেন, পরিণতি যে ইউরোপের ধ্বংসে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়াও যে-সকল হতভাগ্যের সংগ্রামের উন্মাদনা হইতে মুক্ত রহিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারা আপনার ও আপনাদের দেশের দিকে তাকাইতেছে। যুদ্ধরত জ্ঞাতিভ্রাতৃগণের কানে আপনার কণ্ঠস্বর যেন অবিলম্বে দৃঢ়ভাবে ও সত্যভাবে পৌছিতে পারে। এ-যুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধরত জাতিগুলির স্বার্থ বিজড়িত নহে; এই অধর্মযুদ্ধে সমগ্র সভ্যতা আজ বিপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মবিস্মৃত ইউরোপকে আজ একথা স্মরণ করাইয়া দিক যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষের প্রতিভা ও পরিশ্রম যে প্রগতির বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে, আপন দম্ভ ও ঘৃণার পরিতৃপ্তির জন্য তাহা ধ্বংস করিবার অধিকার কোনো জাতির নাই।"

বলা বাহুল্য, হোয়াইট হাউস নিবাসী মানুষটি এ-আবেদনের কোনো জবাব দিলেন না।

৬ই অক্টোবর আমি ভেভে হইতে জেনেভায় রওনা হই, সেখানে ইন্‌টারন্যাশন্যাল রেডক্রসের কাজে আমি আত্মনিয়োগ করি। এবং

রেডক্রস স্থাপিত যুদ্ধবন্দী অফিসে কার্য করি। ঐ তারিখে আমি লিখিয়াছিলাম ঃ

মনুষ্য চরিত্র এবং সর্বোপরি বুদ্ধিজীবীশ্রেণী সম্পর্কে এই সংকটে আমার নূতন জ্ঞান লাভ হইল। এই আত্মাভিমান যুক্তিঅভিমানী, স্বাধীনতা ও মানবতার সহায় আদর্শের ধ্বজাধারী চিন্তানায়কেরা কত ত্বরিতে, কত সম্পূর্ণভাবেই না তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস ও আদর্শকে ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া দিতে পারে। যখন আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে, যখন দেখিব আবার তাহারা তাহাদের আদর্শের উদারতা ও মানবতার দম্ভ করিতে শুরু করিয়াছেন, তখন এ-দিনের কথা ভুলিব না। এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে তাহাদের কোনো অসুবিধাই হইবে না। যদিও পশুশক্তির পুনর্জাগরণের দিনে এই দম্ভ এক মুহূর্ত রক্ষা করিবার সাহস তাহাদের নাই। "বন্ধুগণ তোমরা কত ভঙ্গুর।"

এই কথাগুলি আজও খাটে ; কারণ, শান্তিবাদ আজ আবার বেশ চালু হইতেছে। কারণ, ক্ষমতাধিষ্ঠিত শক্তির অর্থাৎ রাজনীতি ও স্বর্ণস্বার্থের অনুকূলে এই শান্তিবাদ আজ নিরাপদ শান্তির দিনে বসিয়া বণিকস্বার্থে পরিচালিত সরকারী ক্ষমতার আশ্রয়পুট হইতে শান্তি স্থাপন ও দেশপ্রেম সম্পর্কে যাহারা আজ আমাকে মুরুব্বির মত উপদেশ দিতেছেন তাহাদের কাহারও কাহারও আত্মসমর্পন নিজের চোখে দেখিয়া আমি ইতিমধ্যেই একটা তিক্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

অক্টোবর মাসে যুদ্ধবন্দীদপ্তরের কাজের মধ্যেই আমি দুইটি প্রবন্ধ লিখিলাম। একটির নাম "The Lesser of Two Evils" এবং অপরটির নাম "Inter Arma Caritas"। আজ প্রবন্ধ দুইটিকে অত্যন্ত নিস্তেজ মনে হয়। সেদিন আমি যুদ্ধকে আক্রমণ করি নাই, আক্রমণ করিয়াছিলাম শুধু ঘৃণাকে, তাহাও কেবলমাত্র শত্রুপক্ষের। মদগর্বিত জার্মানী তখন দাম্ভিক অপভাষণে আকাশবাতাস ভরিয়া তুলিতেছিল।

তাহা ফ্রান্সে বহু বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর স্বাক্ষরে তখন যে-সকল কদর্য প্রবন্ধ, ইশ তাহার ও বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছিল তাহা এত বড় হইয়া কানে আসিতেছিল না। এইসকল ব্যক্তির মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন এই সংক্রমণে তাহারাও যে আক্রান্ত হইবে, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। স্তেফান জর্জের নামকরা শিষ্য, গ্যয়টের সাহিত্যের একজন প্রধান পণ্ডিত ফ্রিডরিখ গুণ্ডলফ্ লিখিলেন "সমস্ত শ, মেটারলিঙ্ক গু'অনুৎসিও মিলিয়া সংস্কৃতির যতটুকু যাহা করিয়াছেন তাহার চেয়ে বেশি করিয়াছে আতিলা।" আরও লিখিলেন, "এক জার্মানী ছাড়া আর সমস্ত ইউরোপ পচিয়া গিয়াছে।" জার্মানীই একমাত্র দেশ "যে সৃষ্টি করিতে পারে এবং সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই যাহার ধ্বংসের ক্ষমতা আছে।" 'যুদ্ধকালীন চিন্তাকণা' পুস্তিকায় টমাস মান ফ্রান্সকে হীনভাবে অপমান করিলেন ও জার্মানদের নির্মম ধ্বংসকার্যে (বিশেষত র‍্যাঁস্ গির্জা ধ্বংসের ফলে) ফরাসীদের মন যে গভীর শোকে বেদনায় উন্মোথিত হইয়া ওঠে তাহাকে বিদ্রূপ করিলেন। জার্মান রণতান্ত্রিকতাকে তিনি সংস্কৃতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া সমর্থন করিলেন।

এই সকল কারণেই আমি ১৯১৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যাহা লিখি তাহাতে অতিমানব-নীতির নামে জার্মানদের এই ব্যভিচারে এতখানি তীব্র ও তিক্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল রচনায় ফরাসী মনস্বীদের সম্পর্কে যে প্রশংসার কথা ছিল তাহাকে অতিশয়োক্তি বলা চলিতে পারে কারণ, ফ্রান্সের মানসক্ষেত্রে যে গভীর বিপর্যয়ের শুরু হইয়াছিল তাহা তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহা হোক, সোজা কথায় ফ্রান্সের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আমি অপরাধ করিয়াছিলাম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবার ফলেই আমার বিরুদ্ধে হীন আক্রমণের ঝড় বহিতে শুরু করিল। 'খ্রীষ্ট ও চিরন্তন সংগ্রাম' পুস্তিকায় প্রশংসায় মুখর বুর্জে ও ফরাসী একাডেমীতে

তাহার সতীর্থ ফ্রেদেরিক মাস আমাকে আক্রমণ করিলেন। মাস জার্মান প্রতিভাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেন এবং বলিতেন, সংগীতকে আইন করিয়া 'র‍্যা আলমা' ও 'মার্সে ইয়েজ' এই দুইটিতে সীমাবদ্ধ করা উচিত। ফরাসী একাদেমীর মত ধর্মসংস্রবমুক্ত প্রগতিবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই দলে ভিড়িল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় সরবন-এ আমার সতীর্থ ফরাসীবিপ্লবের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওলারও আমার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। ২৩শে অক্টোবর মাতঁ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে আমাকে আক্রমণ করিলেন। এই প্রবন্ধে সরবন-এর নামে আমার সহিত সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তিনি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরদিন লাক্‌সিয় ফ্রাঁসের, লঁ্যাত্রাসিজা ও লা ক্রোয়া—সকলেই তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। ওলার, দোদে ও লা ক্রোয়া—এই তিনটি লইয়া হইল এক পবিত্র সম্মেলন। দূরে বসিয়া গর্বের সহিত আমি দেখিতে লাগিলাম আমাকে তাড়া করিয়া মারিবার জন্য তাহারা কি-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিব না যে, প্রথম আঘাতেই এই নির্লিপ্ততার পর্বতশিখর হইতে আমি পতিত হইলাম। লা ক্রোয়া আমার বিরুদ্ধে প্রথম যে তীরটি নিক্ষেপ করিল তাহা আমি আমার দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছি, শিকারের পশুর দেহ বা দেহাংশ শিকারের কীর্তি হিসাবে শিকারী যে-ভাবে টাঙাইয়া রাখে। লা ক্রোয়া লিখিল:

"সরবন-এর প্রাক্তন শিক্ষক, বিদেশী ডিগ্রিধারী রম্যাঁ রলাঁ সুইস পত্রিকা 'জুর্নাল দ্য জেনেভ-এ তাহার জার্মান বন্ধুদের নামমাত্র তিরস্কার করিয়া মিত্রশক্তিপুঞ্জকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন কসাক, মরোক্কোবাসী সুদানী ও শিখদের সাহায্যে সভ্যতার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার জন্য। নিজেকে সভ্যতার একটি স্তম্ভ মনে করিবার মত এই গগনস্পর্শী দম্ভকে মঃ ওলার মাতঁ্যা পত্রিকায় আক্রমণ করিতে দ্বিধা করেন। মঃ ওলার-ও ত'একসময় শান্তিবাদী ছিলেন।"

ইহার পরেও সামান্য যে কজন বন্ধু অবশিষ্ট ছিলেন তাহারাও বিমূঢ় হইয়া আমাকে থামিতে অথবা যাহা বলিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভয় পাইয়া আমার প্রকাশক আমাকে লিখিলেন, প্রত্যহই নূতন নূতন পুস্তকের দোকান জঁ্যা ক্রিস্তফ বয়কট করিতেছে; এই সঙ্গে অনুরোধ করিলেন যাহা কিছু লিখিয়াছি সব প্রত্যাহার করিয়া আমি যেন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি! রোজ সকালে প্রাতরাশের টেবিলে চাকর এক একগাদা করিয়া বেনামী চিঠি আনিত। চিঠির লেখকেরা আমাকে এই বলিয়া শাসাইতেন যে জোরে-র ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। আমার আক্রমণে সমগ্র সাহিত্যিক-পালটা যেন আমাকে শেষ করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন আলফ্রে কাপ্যুস নামক একজন ভদ্র লেখক-বন্ধু ফিগারো পত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন।

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারিগণের উদ্দেশে লিখিত পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ আমি লিখিলাম। প্রবন্ধের তারিখটি লক্ষ্য করিতে হইবেঃ ১৭ই নভেম্বর, ১৯১৪। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছিল প্রধানত আমার সেই প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করিয়া, যেগুলিতে তখনও পিতৃভূমির সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছিল। Inter Arma Caritas (৩০শে অক্টোবর) ও বেলজিয়ামের সম্মানার্থে লিখিত ছোট দুঃসাহসিক শোকগাথাঃ "To the People Who Are Suffering for Justice" (২রা নভেম্বর)—এই দুইটি রচনা পর্যন্ত ঐ ভাবধারা বলবতী ছিল।

আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পশ্চাতে যে কদর্য অন্ধ বিদ্বেষ ছিল সেদিন অপেক্ষা আজ আরো বেশি করিয়া তাহা অনুভব করিতেছি। জবাবপ্রসঙ্গে কোথাও আমি একটি কথাও প্রত্যাহার করি নাই। বরঞ্চ, পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই আরো জোর দিয়া

বলিলাম। জার্মানীর প্রতি আমার সহানুভূতি ও মৈত্রীমনোভাব আমি সর্বপ্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রক্ষা করিয়া চলিলাম। জার্মানীর নেতাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত শাস্তির ঘোষণাবাণীর সহিত জার্মান জাতিকে আমি কিছুতেই জড়াইতে চাহিলাম না। ফ্রান্সে যে সকল বুদ্ধিজীবী ঘৃণার বিষকে ফেনাইয়া তুলিতেছিলন তাহাদের বিরুদ্ধে আমি অভিযান শুরু করিয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া আমার একটি কথায় সাংঘাতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। 'চিরন্তন যুদ্ধের' এই শয়তান প্রচারকগণকে আমি বলিলাম যে, এমন দিন আসিবেই যখন রাইন নদীর ওপারের প্রতিবেশীদের সহিত ব্যবসায়ের স্বার্থে তাহারাই সর্বপ্রথম হাত মিলাইবে। (গত দশ বৎসর ধরিয়া তাহারা যে এই কাজটি করিয়া আসিতেছে, একথা না বলিলেও চলে। ১৯১৫ সালের ফরাসী জাতীয়তাবাদী আজ জার্মানীর নিকৃষ্টতম বণিক জাতীয়তাবাদীর সহিত হাত মিলাইয়াছে)। কিন্তু কেহ যে বলিবে ইহা হইতেছে বা হইবে—তাহা তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

আমার বন্ধুরা হতাশ ও ব্যথিত হইলেন। প্রকাশক আমাকে লিখিলেন: "ইহা কিছুতেই প্রকাশ করা চলে না কারণ ফল হইবে শোচনীয়। আপনার যে সকল রচনা বারুদের গাড়িতে আগুন লাগাইয়াছে, আমার বিশ্বাস এই প্রবন্ধটি তাহার চেয়েও বিপজ্জনক। এ সম্পর্কে কাপ্যুস ও অন্যান্য বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি; বিদেশেও সকলেরই এই মত। প্রবন্ধটি প্রকাশ না করিতে, এমনকি বিদেশেও প্রকাশ না করিতে, আমি আপনাকে মিনতি জানাইতেছি। আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে দিন অন্যদের, তাহারা চেষ্টা করিলে আপনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন।"

পরদিনেই (২৪শে নভেম্বর) আমি কিছুতেই ইতস্তত না করিয়া লিখিলাম, "যদি বিশেষ অবস্থার দোহাই দিয়া বন্ধুগণ আমার অপরাধ

স্খালনের চেষ্টা করেন তবে আমি প্রকাশ্যভাবে তাহাদের আমার পক্ষসমর্থনের অধিকার অস্বীকার করিতে বাধ্য হইব। আমার মত আমি কিছুতেই প্রত্যাহার করিব না, এবং এই মতপ্রকাশের অধিকারও ছাড়িতে পারিব না। যদি দেখি আমার দেশ কোনো অন্যায় করিতেছে তবে তাহা নিঃশব্দে উপেক্ষা করিতে আমি পারিব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণসংশয় হয় তাহাও স্বীকার। আমি কোনো অজুহাত চাই না। আমার দেশের, আমার ফ্রান্সের জন্য আজ আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি: মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের কথা আজ এখানে এতই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। আত্মঘাতী অন্ধ উন্মাদনার হাত হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আমি তাহারই সম্মানকে বাঁচাইবার, তাহারই ন্যায় ও মানবতার ঐতিহ্যকে বাঁচাইবার জন্য তাহার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার দেশ একদিন একথা বুঝিবেই এবং বুঝিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিবেই।"

আমার এই সংকল্পকে আরো স্পষ্ট, আরো দৃঢ়, আরো কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য ৪ঠা ডিসেম্বর আমি 'বিগ্রহ' নামক প্রবন্ধ লিখি। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে এত খোলাখুলি আক্রমণ ইতিপূর্বে কখনও করে নাই।

"ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের জন্য আমি আর গর্ববোধ করি না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের চিন্তানায়কেরা যে অবিশ্বাস্য দুর্বলতা দেখাইয়া সমষ্টিগত নির্বুদ্ধিতার পায়ে আত্মসমর্পন করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের মেরুদণ্ড বলিয়া কোনো পদার্থ নাই।...

এই প্রবন্ধে পিতৃভূমিকে আমি এক পুতুলমূর্তিরূপে দেখাই। যে গণতান্ত্রিক-বিগ্রহকে মিত্রশক্তিগণ তাহাদের 'ন্যায়যুদ্ধের' রথের উপর বসাইয়াছিলেন তাহাকেও আমি পিতৃভূমি-বিগ্রহের চেয়ে বেশি

শ্রদ্ধা দেখাইলাম না। 'এ পাষাণমূর্তিগুলি ভাঙিবে কে ?' 'পিতৃভূমি, গণতন্ত্র, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা' এ সকলের নিকটেই আমি 'স্বাধীনতা' রক্ষাপ্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানাইলাম।

সেদিন হইতে অতীতের সহিত সম্পর্ক আমার একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ যে সকল বন্ধুরা জনমতের, এমন কি নিজেদের মতেরও বিরুদ্ধে, তখনও পর্যন্ত আমার পক্ষ লইয়া লড়াই করিতেছিলেন তাহারা হতাশ হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ যিনি তিনি লিখিলেন 'বিগ্রহ' প্রবন্ধটি তাহার হৃদ্‌পিণ্ডে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। চিরদিনই আমার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত আমার মা পারি হইতে আমাকে জানাইলেন 'বিগ্রহ' পড়িয়া আমার সম্পর্কে আমার বন্ধুদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে—পরিবর্তন হইয়াছে আমার বিরুদ্ধে।" (২০শে ডিসেম্বর)

তবুও সেইদিন, ১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর' আমার ডায়েরীতে লেখা, "জুলাই মাসের পর আজ প্রথম আমি পিয়ানো স্পর্শ করিলাম।" প্রতি সন্ধ্যায় যাহার সাহচর্য আমি উপভোগ করিয়াছি সেই প্রিয়সঙ্গী সংগীতের সহিত সংস্রব রাখি নাই গত পাঁচমাস। (এই কয়মাস সমসাময়িক ঘটনাবলীর ভয়াবহতা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক মুহূর্তের জন্যও অবসরবিনোদনে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তিক্ত প্রশান্তির সহিত আমি লিখিলাম ঃ "এই দেশগুলি ধ্বংস হইয়া গেলেও আমি বিচলিত হইব না ; কারণ ইহারা স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, এমন কি ইহাতে যেন আনন্দও পাইতেছে। আমি আর ইহাদের জন্য সংগ্রাম করি না, আমার সংগ্রাম সম্মানের জন্য। আজ সন্ধ্যায় একটু মোজার্ট—আমার প্রিয় মোজার্ট—বাজাইয়াছি ; আর বাজাইয়াছি কিছু প্রাচীন জার্মান ধর্মসংগীতের সুর।"

(ফ্রেদেরিক মার্স যদি জানিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেন !)

আমার মন হঠাৎ কেন এভাবে মুখ ফিরাইল ? ডিসেম্বর মাসে দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে।

ফ্রান্সে ঘৃণার বন্যা তখন এতখানি তীব্র ও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল যেরূপ ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। ফ্রান্সের পক্ষে আশু বিপদ তখন কাটিয়া গিয়াছে, তাই ইহা আমার পক্ষে আরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের সবচেয়ে প্রখ্যাত ও স্বাধীনচেতা চিন্তাজীবিগণ এই কোরাসে যোগ দিয়াছেন। যোগ দিয়াছেন বের্গ্‌সঁ ও রেমি দ্য গুরমঁ। তাদের রাজা বারেস রাগে অন্ধ হইয়া শুধু জার্মানদের উপর নহে, ফরাসী শান্তিবাদীদের উপরও ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন আঁদ্রে বোর্নিয়ে-র, লুই ব্যারাএঁা ও এমিল পিকার। ইহারা সকলেই জার্মান জাতির বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে অস্বীকার করিলেন। পারির ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের রেক্টর বোদ্রিয়ার এই সুরে সুর মিলাইয়াছেন।

নৈতিক পরিস্থিতি একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। ঠিক সেই সময় বার্লিনের বিজ্ঞানপরিষদে জনৈক সদস্য ফাদার লাসনের উন্মাদ অপভাষণের একবাক্যে তীব্র নিন্দা করিতেছিল এবং লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট আস্টভাল্ড-এর সহিত সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মহানুভবতা প্রদর্শন করিতেছিল। এইরূপে জার্মানী যখন চিন্তাজগতে স্বাভাবিক সহনশীলতার দিকে চলিয়াছে, তখন ফ্রান্স যেন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামত চলিয়াছিল ঠিক ইহার বিপরীত পথে। 'পরিকল্পনামত' কথাটি আমি ইচ্ছা করিয়াই লিখিলাম কারণ, ফ্রান্স হইতে ব্যক্তিগতভাবে বা বিশ্বস্তসূত্রে আমি যে সকল খবর পাইতাম তাহাতে বুঝিয়াছিলাম ফরাসী জাতি যুদ্ধের প্রতি কতখানি উদাসীন ও

শান্তির জন্য কতখানি তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই বিরুদ্ধে হিংস্র পশুপালের মত সমস্ত সংবাদপত্রগুলি একযোগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল শুধু বাহিরের নির্দেশে নহে—সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায়ও বটে।

যে-ব্যক্তির চরিত্রকে শ্রদ্ধা না করিলেও আর্টকে আমি শ্রদ্ধা করি তাহার সম্পর্কে এই কঠোর মন্তব্য করিতে হইতেছে বলিয়া আমি সত্যই বেদনা বোধ করিতেছি। কিন্তু হতাশাক্ষুব্ধ জার্মানীর মন্থর মৃত্যুর এক অগ্রিম স্বপ্নে যিনি পাশবিক উল্লাসে আত্মহারা হইতে পারেন, যিনি লিখিতে পারেন "নীল চোখ ও লাল চুলওয়ালা লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা কেমন করিয়া রাশিয়ানদের হাতে মরিতেছে ও মরিবে, কেমন করিয়া এক নিখুঁত অবরোধ-ব্যবস্থার কল্যাণে ফরাসী ও রাশিয়ানদের মধ্যে পিষ্ট হইয়া জার্মানী একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইবে" তাহার সম্পর্কে আমি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিব না কেন?

এই ব্যক্তির ও তাহার হিংস্র দেশপ্রেমের কথা মনে পড়িয়া আজ ষোল বছর পরেও আমার মন বিতৃষ্ণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সের পক্ষ লইয়া কথা বলিবার অধিকার তাহার আছে একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। তিনি যে-জাতের লোক হোন না কেন, আমার জাতের কেহ নন! আমার ও এই রক্তশোষকদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার যোগসূত্রই থাকিতে পারে না।

কিন্তু শেষ আঘাত আসিল সুইজারল্যাণ্ড-প্রবাসী ফরাসীদের নিকট হইতে। তাহারাও স্বদেশের জ্ঞাতিভ্রাতাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিব্যুন দ্য লোজান পত্রিকায় রেনে পেইও আমাকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। খুব মুরুব্বিয়ানার সাথে তিনি আমাকে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন (ইহা আমি খুব উপভোগ করিয়াছিলাম এবং আশাকরি আমার বর্তমান পাঠকেরাও করিবেন)। তিনি লিখিলেন, "তাহার

লেখা পড়িয়া মনে হয় বিশ্বনাগরিক হইতেই তাহার সবচেয়ে আগ্রহ বেশি।" পারির বৃহৎ 'নির্ভুল' সংবাদপত্র-জগতে ও ১৭ই ডিসেম্বরের ল্য তাঁ পত্রিকায় আমার প্রতি আক্রমণের বহর দেখিয়া জুর্ন্যাল দ্য জেনেভ শঙ্কিত হইয়া পড়িল এবং আমার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে শুরু করিল। যে সুইস শহরটিতে আমি থাকিতাম সেখান হইতে অনেক চিঠি পাইতে লাগিলাম। জেনেভার জনৈক কোমলহৃদয়া মহিলা লিখিলেন: "প্রত্যেক জার্মানকেই হত্যা করা দরকার।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জানাইলেন, "আঃ, জার্মানহীন ইউরোপ কী আরামের কী শান্তির স্থানই না হইবে।"

পাঠক সহজেই বুঝিবেন কেন তখন মানুষের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি আবার আমার বিশ্বস্ত, উপেক্ষিত সহচর সংগীতকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু আরো কারণ ছিল। তখন আমার চোখ খুলিতে শুরু করিয়াছে: যুদ্ধে মিত্রশক্তির দায়িত্বও আমি আবিষ্কার করিতে শুরু করিয়াছি। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ব্রিটিশ ব্লু বুক-এ আমি স্যার এডোয়ার্ড গ্রে-র সহিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের ১লা অগাস্ট তারিখের সাক্ষাৎকারের কথা পড়িয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই। জার্মান রাষ্ট্রদূত জানাইয়াছিলেন গ্রেট ব্রিটেন যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে ফ্রান্স ও তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গায়ে হাত না দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে জার্মানী রাজি আছে। গ্রে স্পষ্টভাবে হাঁ না কিছু জানাইতে অস্বীকার করায় বিমূঢ় জার্মানী কৌশলে পাতা ফাঁদে পা দেয়। সেই বিশাল বিভ্রান্ত জানোয়ার তখন তাড়া খাইয়া বেলজিয়ামে ঢুকিয়া পরে। ইংরাজ শাসকশ্রেণী ইহাই চাহিতেছিল। জার্মানী এইভাবে ফাঁদে পা দেওয়ায় তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণের সম্মতিলাভের একটা সুযোগ পাইল।

আমি জানি স্যার এডোয়ার্ড গ্রে-র অনিশ্চয়তা-নীতির এই ব্যাখ্যার অনেকে প্রতিবাদ করিবেন (যদিও ইহার পরে আমাদের কিছু না বলা সত্ত্বেও ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন)। কিন্তু আমার এই ব্যাখ্যা সত্য হোক বা না হোক সেদিন হইতে আমার মনে সংশয় ঢুকিয়াছে; আমার মনের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা যে, সংশয় আজও যায় নাই। তাই আমি যুদ্ধের পাপের জন্য সমস্ত ইউরোপকে আক্রমণ করিলাম, দায়ী করিলাম সমস্ত রাষ্ট্রকে সমষ্টিগতভাবে। ১৯১৫ সালের ১১ই জানুয়ারী আমি লিখিলাম:

"ধীরে ধীরে আশঙ্কার সহিত আবিষ্কার করিয়াছি মিথ্যার বেসাতি একা জার্মানীই করে নাই। আমার কাছে প্রত্যেক যুদ্ধরত শক্তিই কমবেশি এইযুদ্ধের জন্য দায়ী। এমন হইতে পারে যুদ্ধের ইচ্ছা জার্মানীর সবচেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু ইচ্ছা তাহার যতটুকুই থাক, এমন কদর্যভাবে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের অপরাধ তাহারই সবচেয়ে বেশি দাঁড়াইয়াছে।"

১৯১৪-১৫ সালের ঘটনাবলী চিন্তাধারায় একটা গভীর, আকস্মিক পরিবর্তন আনিল। এটা খুব ছোট কথা নয়। বহুদিন, বহুমাস ধরিয়া তীব্র অন্তর্দাহের আগুনে পুড়িয়া আমার মধ্যে নূতন এক ব্যক্তিত্ব জন্ম লইল, মৃত অতীত সমাহিত হইল। সে-সকল অন্ধকার দিনে হৃদয়মনে গভীর যন্ত্রণা বহিয়া আমি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া মৃত্যুর আস্বাদ লইতে চেষ্টা করিলাম।"

কিন্তু মৃত্যুর আলিঙ্গন বহুবার আমার মধ্যে জীবনের আস্বাদ জাগাইয়া তুলিয়াছে। সংগীতের মত মৃত্যুও আমার জীবনের এক বড় বিশ্বস্ত সহচর; সংকটমুহূর্তে যখনই পথ খুঁজিয়া পাই না তখনই আমার হাত ধরিয়া বলে আগাইয়া চল।

পথের সন্ধান পাইয়া আমি আবার যাত্রা শুরু করিলাম। কিন্তু মোড়

ঘুরিতেই এবার আমাকে অতীতের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল। আমার সেদিনের বন্ধুরা এই পথপরিবর্তনের জন্য আমার অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। কিন্তু নূতন পথে আসিতেই আমার বহু নূতন বন্ধু লাভ হইল। দুঃসাহসী পাখীরা যেমন ঝড়ের বাতাস ঠেলিয়া আসে তেমনি তাহাদেরও অনেকেই আমার দিকে ছুটিয়া আসিলেন। আমার 'সংগ্রামের উর্ধ্বে'র আবেদনে প্রথম সাড়া আসিল বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসা ইলিওনোরা ডিউসের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে। ১৯১৪ সালের ১৩ই অক্টোবর রোম হইতে তিনি কয়েক লাইন লিখিয়া পাঠাইলেন: "আপানার হৃদয় যেন আপনার নিজের বাণীর মধ্যেই তাহার সন্ত্বনা খুঁজিয়া পায়…ও দস্যু ছ লা মলে… আপনার কণ্ঠস্বর যেন থামিয়া না যায়…জানি আপনার কণ্ঠস্বর থামিবে না…"

সাড়া আসিল ইউরোপের অন্য প্রান্ত হইতে আর একটি রমণীর কণ্ঠস্বরে। ১৮ই ডিসেম্বর এলেই কে আমাকে অনুরূপ পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্স হইতে বিভিন্ন কণ্ঠের বিভিন্ন বাণী আসিতেছিল। ওলার এবং পারির সংবাদপত্র-জগৎ আমার বিরুদ্ধে যে-অভিযান শুরু করিয়াছিলেন তাহাতে আমার এইটুকু সুবিধা হইয়াছিল যে, হতাশাক্ষুব্ধ নিঃসঙ্গ ফরাসী জনসাধারণের অন্তরে আমার বাণী পৌঁছিয়াছিল; কারণ এ-ধরনের আক্রমণ আমার উপর না হইলে আমার আবেদন সম্পর্কে তাহারা কোনপ্রকার কৌতূহল দেখাইত না। আমার আবেদনে সাড়া আসিল সর্বপ্রথম এইসকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে: মার্সেল মার্তিনে (২৪শে অক্টোবর) আমেদে দ্যুনোয়া (৪ঠা নভেম্বর), টলস্টয়ের পুরাতন বন্ধু পল বিরুকফ, বর্দোর দর্শনের অধ্যাপক দোর্দ্যা, আঁরি গিল্‌বো (ইনি ১৩ই নভেম্বর লা বাতাই স্যাঁদিকালিস্ত পত্রিকায় আমার উদ্দেশে

একখানি 'খোলা চিঠি' প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দেন।) শোভেলঁ নামক লিসে ভল্‌ত্যার-এর একজন শিক্ষক, পি. জে. জুভ (২৫শে নভেম্বর), ম্যারসেরো, জর্জ পিয়শ, ফেরনাঁ দেগ্রে, ফ্রাঞ্জ জুর্দা, এদুয়ার দ্যুজার্দ্যাঁ, গুস্তাফ দ্যুপ্যা, জাক মেনিল, লিয়ঁ বাজালজেৎ, এমিলি ম্যাসন, গ্যাস্টেন থিয়েসন, এ. প্রিভা, ফেলিসিয়ঁ শালে এবং অন্যান্য আরো অনেকে।

ইংলণ্ডেও ইউনিয়ন ডেমক্রেটিক কণ্ট্রোল তখন ট্রেভেলিয়ান, ই. ডি. মরেল, নর্মান এঞ্জেল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনস্বীদের সহায়তা ও সমর্থনলাভে সমর্থ হইয়াছে। ১৪ই নভেম্বর কেম্‌ব্রিজ মেগাজিন পত্রিকায় 'সংগ্রামের ঊর্ধ্বে' প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তিকাকারে ইহা ব্যাপকভাবে বিতরিত হয়। ইহা লইয়া ব্যাপক ও গভীর আলোচনার সূত্রপাত হয়, তাহাতে দেখা গেল নিপীড়িত মানুষের প্রতি নিবিড় দরদ তরুণ সৈনিকদিগের হৃদয়েই সবচেয়ে বেশি।

১৯১৫ সালের ২২শে মার্চ বার্লিন হইতে আইনস্টাইনের একটি বহৎ বাণী আসিল: "পরস্পরকে ভুল বুঝিবার বদনাম পরিণতিস্বরূপ ফরাসী ও জার্মানজাতির মধ্যে যে গভীর বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আপনি যেরূপ দুঃসাহসিকতার সহিত আপনার মত ব্যক্ত করিতেছেন —সংবাদপত্র হইতে তাহার কিছু কিছু আমি জানিতে পারিয়াছি। আপনি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি গ্রহণ করুন। যাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল তাহারা যে কেমন করিয়া এতখানি অন্ধ ও উন্মাদ হইয়া উঠিল তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আশা করি, আপনার দৃষ্টান্তে অনেকেই এই বিকারের ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। এ যেন এক সাংঘাতিক সংক্রামক ব্যাধি। ইউরোপে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত-ভাবে যে বিপুল কাজ চলিয়াছে তাহার ফলে কি কেবল ধর্মান্ধতা

অপসৃত হইয়া তাহার আসনে অন্ধ জাতীয়তাবাদ অভিসিক্ত হইয়াছে ? ভবিষ্যৎ যুগ কেমন করিয়া আমাদের এই ইউরোপকে শ্রদ্ধা করিবে ? বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরাও দেখিতেছি তাহাদের বিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন গত আটমাস তাহারা কবন্ধ জীবন যাপন করিতেছেন। আমি আমার সামান্য শক্তি আপনার হাতে তুলিয়া দিতেছি। আমার পদমর্যাদার কথা অথবা জার্মান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সহিত আমার সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিয়া আপনি যদি মনে করেন আমি কোনোরূপ কাজে লাগিতে পারি তবে আমাকে কাজে লাগাইবেন।”

আরো একটি ঘটনা ঘটিল। তাহার গুরুত্বও কম নহে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে সোবিয়েৎ রিপাবলিকের ভবিষ্যৎ শিক্ষামন্ত্রী আনাতোল লুনাচারস্কি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইনি আমার নিকট আসিলেন যেন ভবিষ্যতের দূত হিসাবে, আসিলেন ভবিষ্যৎ রুশবিপ্লবের অগ্রিম বার্তা বহন করিয়া। তিনি আমাকে জানাইলেন, যুদ্ধের পরে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিবে। কথাটি এমন সহজভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বলিলেন যে, মনে হইল সব যেন পূর্ব হইতেই ঠিক হইয়া আছে।

আমি বুঝিতে পারিলাম আমার পায়ের নিচে এক নূতন ইউরোপের, এক নূতন সমাজের সৃষ্টি হইতেছে সেই নূতন জগতের স্পর্শ অনুভব করিয়া আমি আস্বস্ত বোধ করিলাম। ১৯১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর আমি আমার এক জার্মান বন্ধুকে লিখিলাম (এই বন্ধুটি যুদ্ধের প্রকৃত কারণ স্বীকার করিতে চাহেন নাই) ঃ

“মিথ্যা মোহজালে নিজেকে আর জড়াইয়া রাখিবেন না। মুক্তির একটিমাত্র পথ আছে ঃ পিতৃভূমির মতবাদ পরিহার করা। সভ্যতাকে যিনি বাঁচাইতে চাহিবেন তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে এই মোহবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।”

গ্রাব্রিয়েল সাইলেসের সহিত দৃঢ় অথচ সৌজন্যপূর্ণ এক বিতর্কপ্রসঙ্গে আমি লিখিলাম ঃ

"বহু পরস্পরবিরোধী মতবাদের হানাহানির মধ্যে আমাদের ক্ষণভঙ্গুর মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জাতীয় আদর্শ ও মানবীয় আদর্শ—এই দুইএর মধ্যে একটিকে আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। আপনি জানেন ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি আমার জীবনকে বহুদিন কিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই রুধিরাপ্লুত বীরগণের প্রতি আমার একপ্রকার অন্ধ আসক্তি ছিল। কিন্তু আজিকার এই সংকটের ফলে সে আদর্শ আমার অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে ঃ ইতিহাসের যাদুঘর হইতে তাহাকে বর্তমান জীবনে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বিপজ্জনক। যা ছিল আমার যৌবনের স্বপ্ন ও আদর্শ আজ বুঝিতেছি ক্যাথলিক আদর্শের মতই তাহা নতুন যুগের নতুন আদর্শের স্বাধীন বিকাশের পথে ভীষণ অন্তরায়। নিষ্ঠুর হইলেও এই সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।"

এইজন্যই আমার ভাবধারার প্রতি সত্যকার মজুরশ্রেণীর সহানুভূতি অথবা সত্যকার প্রতিক্রিয়াশীলশ্রেণীর ঘৃণার কোনোদিন অভাব হয় নাই! এ. প্রিভা (২৬শে ফেব্রুয়ারী), রসমার (৫ই মে), ফেরনাঁ দেপ্রে প্রমুখ ব্যক্তিগণ পারি হইতে আমাকে লিখিয়া জানান, মজুর শ্রেণীর মধ্যে যে-সকল সিণ্ডিকালিস্ট মজুর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের আনুগত্য ত্যাগ করেন নাই তাহাদের মনে আমার প্রবন্ধে কতখানি কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি জাগিয়াছে।'

১৯১৫ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে হেন্‌রি মাসিস্ 'ওপিনিয়ন' পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে 'ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রম্যাঁ রলাঁ' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তিনি আমার যতখানি উপকার করিলেন তাহা আর কেহ করেন নাই।

তাহার আনাড়ীর মত এই বিষোদ্গার প্রচারের পক্ষে ফরাসী সেন্সর কর্তৃপক্ষ এমন সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেন যাহা আমার 'সংগ্রামের উর্ধ্বে' পুস্তিকার প্রচারকার্যে আমার বন্ধুগণ পান নাই। এইভাবে জনসাধারণের মনে আমার সর্বনাশের বীজ বপন করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল হইল—আমার সমস্ত বন্ধুরা মিলিয়া আমার ভাবধারাকে যতটুকু প্রচার করিতে পারেন নাই তাহার অনেক বেশি প্রচার করিলেন ইনি। ১৫ বছর পরে আমি আজ তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার সকল শত্রুই যদি মাসিসের মত ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হইতেন তবে আমার কাজ অনেক সহজ হইত, আমার ভয় ছিল আমার বন্ধুদের সম্পর্কেই বেশি। ইহাদের মধ্যে একজনের সহিত ছিল আমার বিশ বৎসরের বন্ধুত্ব। মত পরিবর্তনের ভয়ে ইনি আমার লেখা পড়িয়াও দেখিলেন না, অথচ আমাকে আক্রমণ করিলেন। বন্ধুদের মধ্যে আর ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন, দুর্বলমতি ভ্যারআয়েরঁ। (মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে চিরদিনই ভালবাসিয়াছি) ইনি তখন জঘন্য ঘৃণাব্যঞ্জক কবিতা প্রকাশ করিতেছিলেন। ইনি সর্বপ্রথম কৃতকার্যের ফল পাইলেন, অনুশোচনাও করিলেন। কিন্তু বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। গাব্রিয়েল দান্নুন্‌ৎসিও-র মত কদর্য কবির সহিত আমি তাহাকে কখনই এক করিয়া দেখিব না। জেনোয়ার নিকট কোয়ার্টোতে বসিয়া তখন তিনি তাহার কপট কাব্য 'সারমন্ অন দি মাউণ্ট' প্রকাশ করিতেছিলেন। এই কাব্য পড়িয়া আমার আর্ডিয়তোর দেয়ালে সিগ্নোরেলি লিখিত খ্রীষ্টবিরোধীদের হত্যার ইঙ্গিতে পূর্ণ কাব্যের কথা মনে পড়িয়াছিল। বন্ধুদের মধ্যে আর ছিলেন আনাতোল ফ্রাঁসের মত দাম্ভিক, বিদ্বেষ-দুষ্ট ভদ্র-পোশাক পরিহিত যোদ্ধার দল। যতদিন পর্যন্ত না 'ধ্বংসকার্য সুসম্পন্ন

হইবে এবং 'সুবিচারের সত্যযুগ' প্রতিষ্ঠিত হইবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধশান্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাইবার সংকল্পকে ইহারা কোনোদিন গোপন করেন নাই।

এই হিংস্র নপুংসক নির্বুদ্ধিতার আবহাওয়ার মধ্যে, যখন জার্মানী লুসিতানিয়া জাহাজে টর্পেডোর আঘাত করিল (৭ই মে) এবং ফ্রান্স আকাশ হইতে কার্লসুরুহে শিশুদের উপর বোমা ফেলিয়া (জুন) তাহার প্রতিহিংসা লইল। তখন আমি লিখিলাম "আমাদের প্রতিবেশী শত্রু" (১৫ই মার্চ) "যুদ্ধের পুস্তকাবলী" (১৯শে এপ্রিল) এবং "বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর হত্যাকাণ্ড" (১৪ই জুন)। ইহার পর হইতে আমার উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িল। গুলি আসিতে লাগিল উভয়পার্শ্ব হইতে। ল্য তাঁ পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে একটি নূতন অভিযোগ আনা হইল। আমি নাকি 'নূতন পিতৃভূমি' নামক জার্মান প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিতেছিলাম এবং এই প্রতিষ্ঠানটি নাকি ফ্রান্সের নৈতিক মনোবল ধ্বংস করিবার জন্য জার্মানীর নূতন সমরোপকরণ (৭ই জুলাই)। জার্মানরাও আমাকে ক্ষমা করিল না। তাহাদের গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতির জন্য তাহাদের কেহ কেহ প্রাণদান করিয়াছে লিখিয়া ফরাসীদের চোখে তাহাদের সম্মান কমাইয়া দিবার জন্যই বোধহয় এই আক্রমণ। রাইমের একজন ম্যাজিস্ট্রেট স্টার্টগার্ট হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় আমাকে তীব্রভাবে অপমান করিলেনঃ "মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেল। রমাঁ রলাঁর জবাব।" মেসার নামক গিসেনের একজন অধ্যাপক অভিযোগ আনিলেন আমি নাকি তাহার বন্ধু ডাক্তার ক্লাইনের প্রতি যে মনোভাব দেখাইয়াছি তাহা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পরোক্ষে সমর্থন। ইনি লিখিলেন ডাক্তার ক্লাইন প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় জার্মান কর্তৃক বেলজিয়াম আক্রমণ সমর্থন করিয়াছিলেন। (ইহাতে তিনি তাহাকে প্রশংসা করিতে চাহিয়াছিলেন) এবং

সর্বোপরি, জার্মান সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত একখানি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় আহৃত জার্মান অন্ধ জাতীয়তাবাদের এই চমৎকার অভিব্যক্তিকে পরম সন্তোষ সহকারে প্রকাশিত করিয়া তাহা অস্বীকার করিবার জন্য আমাকে আহ্বান জানাইল। এই পত্রিকাখানি সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া জাহির করিত।

এই উন্মাদদের লইয়া আমার ধৈর্যচুতি ঘটিবার উপক্রম করিতেছিল। ১৯১৫ সালের ৩রা হইতে ৭ই জুলাইয়ের মধ্যকার আমার ডায়েরীতে (আন্তর্জাতিক যুদ্ধবন্দী-দপ্তরে আমার কাজের শেষ কয়দিন) আমি লিখিলাম ঃ

"গত বারোমাস ধরিয়া অবিচারের হাত হইতে আমার নিজের আত্মাকে এবং যাহারা রণাঙ্গনের পুরোভাগে লড়াই করিতেছে তাহাদের বাঁচাইবার জন্য সংগ্রামের পর আজ বুঝিতেছি আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমার ক্রমেই মনে হইতেছে ইউরোপীয় যুদ্ধ সৌরজগতের একটা সংকট। এ-যেন একটা সমষ্টিগত বিকৃতির অভিব্যক্তি। ইহার মূল রহিয়াছে জাতি-রসায়নের রহস্যময় নিয়মের মধ্যে, জাতিতে জাতিতে বিপজ্জনক সংমিশ্রণের মধ্যে। হয় ত' ইহারও অতিরিক্ত কিছু। হয় ত' ইহা উপগ্রহের এক অসুস্থ অবস্থা, হয় ত' তাহার যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। দাঁড়াইয়া দেখা ছাড়া করিবার কিছুই নাই। আমি কয়েকমাসের জন্য অন্তর্লোকে আত্মগোপন করিতে যাইতেছি।"

১৭ই জুলাই তারিখে জার্মান ও ফরাসী কুকুরগুলিকে পাঠাইয়া দিলাম। জুরিখের International Rundschau পত্রিকার সম্পাদককে এই চিঠিখানি লিখিলাম। সম্পাদক সৌজন্যসহকারে চিঠিখানি প্রকাশ করিলেন।

"গত এক বৎসর ধরিয়া আমার সমস্ত বিশ্রাম, সমস্ত সাফল্য, সমস্ত

বন্ধুত্ব বিসর্জন দিয়া আমি অন্ধ, উন্মাদ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। দুইটি যুদ্ধরত জাতিকে, বিশেষত আমার জাতিকে, আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, তাহার শত্রুও তাহার মতই মানুষ, তাহারাও দুঃখ-বেদনার অংশীদার। আমি আশা করিয়াছিলাম আজিকার জার্মানীতে এমন একটি ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাইব যাহা ফ্রান্সের হৃদয়তন্ত্রীতে দরদের স্পর্শ বুলাইয়া সেখানেও অনুরূপ ভাবের উদ্বোধন করিবে.এবং ফলে এমন সংকীর্ণতামুক্ত স্বাধীন চিন্তার সৃষ্টি হইবে যাহা দুইটি জাতির মধ্যবর্তী অকারণ বিদ্বেষের গভীর গহ্বরের উপর মৈত্রীর সেতু বাঁধিতে পারিবে। আমার আশা পূর্ণ হয় নাই। আমার প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই উভয়দেশ হইতে আমার ভাগ্যে তিরস্কার ছাড়া আর কিছু জুটে নাই। উভয় দিক হইতেই আসিয়াছে একই ধরনের নির্বুদ্ধিতা। আমি থামি নাই বটে কিন্তু এই নির্বুদ্ধিতা আমাকে অবশেষে অস্ত্রহীন করিয়াছে। মঃ মেসার খুশি হইবেন। তিনি আমার নিকট এইটুকু চান যে, তাহার বন্ধুব গৌরববৃদ্ধির জন্য আমি যেন সমস্ত জগতকে জানাইয়া দিই যে, তাহার বন্ধু জার্মান কর্তৃক বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা-ভঙ্গকে সমর্থন করিয়াছেন। জানাইয়া আমি দিব। এবং জানাইয়া দিয়া ফরাসী পাঠকদের মনে ডাক্তার ক্লাইনের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদ্রেক আমি করাইয়াছি তাহা চূর্ণ করিয়া দিব। জার্মানদের রাষ্ট্র-আনুগত্যকে ভুল বুঝিয়াছি বলিয়া মঃ মেসার আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, আমি নাকি যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা চোখের উপর দেখিয়াও নীরব রহিয়াছি। অথচ ফরাসী লেখকদের মধ্যে কেবলমাত্র আমি এই যুদ্ধকে অন্তত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঘৃণার আবহাওয়া হইতে মুক্ত করিয়া মানবিক করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য. চেষ্টা করিয়াছি। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত.হইয়াছে। ক্লান্তিতে, হতাশায় আমি আজ

স্বেচ্ছায় দূরে চলিয়াছি এমন এক অন্ধ সংগ্রামের মধ্য হইতে যেখানে যোদ্ধাদের মধ্যে অন্ধ উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই নাই, যেখানে যোদ্ধারা বারবার এককথাই আবৃত্তি করিয়া চলে অথচ একবারও ভাবিয়া দেখে না অপরের মনে কিভাবে উহা সঞ্চারিত হইবে। আমি ইহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলাম। আমি দুঃখ করি না; কারণ, আমি কর্তব্য করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ বুঝিয়াছি ইহা করিয়া লাভ নাই। তাই আজ চলিয়াছি আর্টের মধ্যে আশ্রয় লইতে, বাহিরের আঘাত-সংঘাতে যে-আশ্রয়স্থল কোনোদিন ভাঙ্গিবে না।

তথাপি আমি একবার শেষ চেষ্টা করিলাম। রক্তাক্ত বৎসরটি পূর্ণ হইয়া গেল; আসিল জোরে-এর হত্যাকাণ্ডের বার্ষিকী। আমি এই মৃত্যুর স্মরণে ও মৃতের সম্মানে কিছু লিখিতে চাহিলাম। 'সংগ্রামের ঊর্ধ্বে'র প্রবন্ধাবলীর এইটিই ছিল শেষকথা। কিন্তু এই শোক শ্রদ্ধাঞ্জলিটি জুর্নাল দ্য জেনেভ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে কতখানি বেগ পাইতে হইয়াছিল ইউরোপের জনসাধারণ তাহা জানিলেন না। মৃত্যু-বার্ষিকী দিনের জন্য লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশের অসম্মতি জানাইয়া সম্পাদক ২১শে জুলাই তারিখে আমাকে লিখিলেন:

"জনসাধারণ, এবং বিশেষ করিয়া ফরাসী জনসাধারণ, বুঝিবে না এই ঘটনাটির জন্য আমরা এতখানি স্থান ব্যয় করিতেছি কেন। কারণ এই মহান সমাজতন্ত্রী নেতার নামে তাহারা সাম্যবাদের ভয় পায় এবং হয় ত' অন্যায়ভাবেই তাহারা ইহাকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়া জাতীয় প্রতিরোধ শিথিল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।"

আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইলাম এবং আমার বন্ধু পল সাইগেলের সাহায্যে প্রবন্ধটিকে ২রা অগাস্ট প্রকাশিত করাইলাম। কিন্তু তৎপূর্বেই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত হইয়া আমি জেনেভা পরিত্যাগ

করিয়াছি। আমি আবার মাটির সংস্পর্শ লাভের জন্য চলিয়াছিলাম। আমি লিলুলি ও ক্লেরাঁবো এই দুই পুস্তকের খসড়া রচনা করিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে অভিযান চালাইয়া যাইবার জন্য মনাৎ আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ১০ই অগাস্ট তারিখে আমি লিখিলাম ঃ

"তুমি যতই নিজেকে ভার-উত্তোলনের দণ্ড বানাইতে চাহ না কেন, ভাররক্ষার জন্য প্রস্তরখণ্ডের তোমার আবশ্যক। সে প্রস্তরখণ্ড কোথাও মিলিল না।"

কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, আমার এই অবসরগ্রহণের ফলে আক্রমণের তীব্রতা কমিয়া গেল। তীব্রতা বাড়িয়া গেল দ্বিগুণ। ল্য গোলোয়া এইরূপ আক্রমণের মধ্যে বেশ নাম করিয়া লইলেন। আলব্যার গিনঁ আমাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন (৭ই অগাস্ট)। বৃদ্ধ ফ্রেদেরিক মার্সঁ পর পর কয়েকটি প্রবন্ধে আমাকে হীনভাবে আক্রমণ করিলেন। তারপর আসিলেন আক্রমণকারিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান পল-ইয়াস্যাঁৎ লোয়াস, ইনি আক্রমণ শুরু করিলেন ১৫ই অগাস্ট তারিখ। যদি কয়েক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে থামাইয়া না দিত তবে কবে যে তিনি নিজে থামিতেন তাহা বলিতে পারি না। তথাপি তিনি আমার মৃত্যুই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কখনও তাহাকে জবাব দিই নাই। ইহাই তিনি কোনোদিন ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি এত বাড়াবাড়ি শুরু করিলেন এবং আমাকে লইয়া এত বেশি লিখিতে শুরু করিলেন যে, অবশেষে আমার শত্রুরাও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণার আর সমস্ত অধিকারই আছে একটি অধিকার ছাড়া— বিরক্তিকর হইবার অধিকার তাহার নাই। কিন্তু ঘৃণাকে বিরক্তিকর করিয়া তুলিবার প্রতিভা লোয়াস-র ছিল। এই প্রতিভার সদ্ব্যবহারের

আনন্দ হইতে তিনি যেন বঞ্চিত না হন আমি তাহাই কামনা করিতাম। এই সকল নীচতা ও আরো বহুপ্রকারের ক্ষুদ্রতাকে আমি ভুলিবার চেষ্টা করিলাম কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাহচর্যে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন স্প্রিটলী; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লুসার্নে গিয়াছিলাম; ছিলেন আইনস্টাইন; ইনি ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভেবেতে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন; আর ছিলেন আমার তখনকার দিনের প্রতিবেশী সিস্কিভিচ এবং শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারের আলফ্রেড এইচ ফ্রায়েড।

আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত গাবুনের ল্যাম্বারিন নামক স্থানের একটি হাসপাতাল হইতে আলসেসের একজন বিখ্যাত মনীষী অ্যালবার্ট সোয়াইজার আমাকে ভ্রাতৃত্বের অভিনন্দনবাণী পাঠাইলেন (ইহাকে ফরাসীদের বেতনভুক নিগ্রোদের পাহারায় রাখা হইয়াছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস!) ইনি আমাকে লিখিলেন যে, "মনুষ্যের আবাসহীন অরণ্যের নির্জনতায় পর্যন্ত" প্রবন্ধগুলির প্রতিধ্বনি গিয়াছে এবং "আমার ভাবধারা এই দুর্দিনে একটি পরম আশ্বাস ও সান্ত্বনার বস্তু ...সংগ্রাম চালাইয়া যান, আমার হৃদয় আপনার সহিত রহিয়াছে যদিও বর্তমান অবস্থায় আপনাকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" কিন্তু স্প্রিটলীর 'প্রমেথুস্'ই ছিল তখনকার দিনে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী। ইহা ছিল আমার নিকট পাহাড়ের বুক চিরিয়া বাহিরে আসার ঝরণার মত। আল্পস পাহাড়ের এই দুর্দম, দুঃসাহসী বীরের আত্মা যেভাবে আমার আকুল স্বাধীনতা-পিপাসাকে মিটাইতে পারিত পৃথিবীতে আর কিছু তাহা পারিত না। যাহা হউক কয়েকমাস অন্তর্লোকে বাসের পর এই সকল মৈত্রীতীর্থে পুণ্যস্নান সারিয়া আমি আবার রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সংগ্রামের তখন এক নূতন স্তর শুরু হইয়াছে। তখন আর জুর্নাল দ্য জেনেভ

পত্রিকায় লিখিবার প্রশ্নই উঠে না। উহা তখন শান্তির বিরুদ্ধে, পোপের বিরুদ্ধে, হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, ফোর্ড মিসনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এক কথায় যাহারাই যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে একটা আপসের চেষ্টা করিতে চাহিতেছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে পাগলের মত চীৎকার করিতেছিল। চার্লস বের্নার-এর ক্ষুদ্র পত্রিকা রেতু মাস্যুয়েল ছাড়া জেনেভাতে এমন একখানি সুইস পত্রিকা ছিল না যাহাতে আমি লিখিতে পারি। কিন্তু একজন ফরাসী সহকর্মী আমার জুটিয়া গেল। ইহার নাম আঁরি গিলবো। এই ফরাসী তরুণটির উৎসাহ ছিল অসীম। সংগ্রামের উত্তেজনায় তাহার নাসারন্ধ্র যেন সর্বদা বিস্ফারিত হইয়া থাকিত। ইনি ছিলেন এক মূর্তিমান সংগ্রাম। ১৯১৫ সালের জুন মাসের প্রারম্ভে তিনি পারি হইতে জেনেভায় আসেন এবং ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে দ্যম্যা নামক পত্রিকা বাহির করেন। আমি ছিলাম ইহার ধর্মপিতা এবং অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সব সময়েই যে তাহার সহিত আমার মনে মিল হইত তাহা বলিতে পারি না। আমি যতটা চাহিতাম তাহার চেয়েও উগ্র ছিল এই পত্রিকার সুর। জেনেভায় কয়েকমাস থাকিবার পর লেনিন, রাডেক, জিনোভিয়েফ প্রমুখ প্রবাসী রুশবিপ্লবীদের সহিত গিলবোর মিশিবার সৌভাগ্য হয়। ফলে তাহারা এই তরুণকে বিপ্লবের পথে টানিয়া লইয়া যান, যে-পথে তখনও আমি পা দিই নাই। ইহা ছাড়া আবেগ ও উত্তেজনার আতিশয্যে গিলবো এমন ভাষা ব্যবহার করিতেন, অথবা এমন সকল কাজ করিয়া বসিতেন যাহার ফলে যে আদর্শকে আমরা রক্ষা করিতেছিলাম তাহাই বিপন্ন হইয়া পড়িত।

যুদ্ধের মধ্যে শত্রুদের অপেক্ষা বন্ধুদের সহিতই আমার সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বেশি এবং আমার বিশ্বাস এ অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক নহে। গিলবো ও আমার মধ্যে কত পত্রালাপই না হইয়াছে। তথাপি আমার

এই তরুণ বন্ধুটির নিষ্কলঙ্ক আদর্শনিষ্ঠা কঠোর আত্মাভিমান ও দুঃখব্রতী নিঃস্বার্থপরতা এবং দুঃসাহসী বীরত্বের পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিয়া আমি পারি না। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এই লোকটির বিরুদ্ধে যে কতখানি হীন কুৎসা প্রচার করিয়াছে তাহা কি বলিব (ইহার অদম্য মনোবলকে তাহারা এখনো ক্ষমা করিতে পারে নাই)। অবশেষে সুইস কর্তৃপক্ষ তাহাকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করে ও পরে নির্বাসিত করে। তারপর ক্লেমাঁসোর উকিলেরা তাহাকে ধরিয়া মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। (১৫ বৎসর পরে এই দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তন হয়)। ব্যক্তিগত সাহস ও চিন্তাশীলতা ছাড়াও তাহার আর একটি গুণ ছিল। তিনি ছিলেন সংগঠনকার্যে পারদর্শী। তাহার সম্পাদনায় ডমা্যা পত্রিকাখানি প্রথম বৎসরেই আলোচনায় ও তথ্যপ্রচারে একটি উচ্চস্তরের পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধের মধ্যে অন্য কোনো আন্তর্জাতিক পত্রিকা ইহার সমকক্ষ হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। ইউরোপের স্বাধীন-চেতা বুদ্ধিজীবীদের নাম ও প্রবন্ধ এই পত্রিকাখানি একত্রিত করিয়াছিল। ই. ডি. মরেল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ফ্রিডেরিক ভান এডেন, হেরিয়েট রোলাণ্ড হল্স্ট, এ. ফোরেল, লাৎসকো, ফ্রিৎস এডলার প্রমুখ বুদ্ধিজীবিগণ এবং প্রবাসী রুশবিপ্লবিগণের সমগ্র দলটিই এই পত্রিকার মারফত আত্মপ্রকাশ করিতেন। আমিও ইহাতে 'To the Eternal Antigone,' 'A Woman's Voice in the Battle,' 'Liberty,' সেক্সপিয়র সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে 'The Murdered People' এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করি। শেষোক্ত প্রবন্ধটি যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মনোভাবের একটি নূতন পর্যায়ের সূচনা করে। এই রচনাগুলি আমার ব্যথার ধ্যানের একটি বৎসরের বহু অন্ধকার দিন। ইহার মধ্য দিয়াই আমি ক্লেরাবো-র

সহিত বেদনার পথে চলিয়াছিলাম। ফ্রান্স ও তথা সমগ্র ইউরোপকে যে রক্তবন্যায় তখন প্লাবিত করিয়াছিল তাহার হাত হইতে পলাইয়া প্রথমে জেনেভায় ও পরে শিয়েরে আমার যে-কজন অল্পসংখ্যক ফরাসী বন্ধু আশ্রয় লইয়াছিলেন—এই রচনাটি প্রথমে তাহাদের পড়িয়া শুনাই। এই দলটির মধ্যে ছিলেন রেনে আর্কস, পি. জে. জুভ, আঁদ্রে জুভ, ফেরনা ডেপ্রেস, গ্যাস্টন থিয়েসন, ফ্রাউস মাসেরেল, ক্লড স্যালিভেস্, মাদ্‌মোয়াজেল এস দ্যুশেন ও আমার বীর ভগ্নী মাদ্‌ল্যান। কেবল মাত্র যুদ্ধের সঙ্গে নহে, প্রাচীন সমাজ ও তাহার অন্তর্লীন ধনতন্ত্রী বুর্জোয়া ব্যবস্থার সহিত সর্বসম্পর্ক ছেদনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল, এই প্রবন্ধটির সূচনাতে সমস্ত সতর্কতা আমি দূরে পরিহার করিলাম। জাতিসমূহের বিরুদ্ধে এক তীব্র অভিযোগ আনিলাম। আমি মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেখাইলাম সত্যকারের পাপীকে : সত্যকারের পাপী—সোনা।

"ইউরোপীয় রাজনীতিতে আজ যে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে—সবচেয়ে বড় আবর্জনা সেথায় সোনার তাল। যে-শৃঙ্খল সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রান্তভাগ রহিয়াছে কুবেরের হাতে; শুধু কুবের নহে, কুবের ও তাহার কুকর্মের অনুচরদের হাতে। কুবেরই আজ প্রত্যেক রাষ্ট্রে সত্যকারের প্রভু ও নেতা। তাহার হাতে তাহারা আজ হীন ব্যবসায় ও কদর্য লেনদেনের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। আদর্শের জন্য মানুষ আত্মদান করে কিন্তু আত্মদান করিতে যাহারা পাঠায় তাহারা জীবনে স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই জানে না। যুদ্ধ দীর্ঘ হইলে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে যুদ্ধ কতখানি বাণিজ্যের জন্য কতখানি অর্থের জন্য......"

সেদিন যাহা সত্য ছিল আজ তাহা একশত গুণ বেশি সত্য। একদিন যেমন সোনা যুদ্ধকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিয়াছিল আজ

পৃথিবীর শান্তিকেও তেমনি সোনাই প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। খুশি হইলে এই সোনা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করিবে, একটি যুদ্ধ, প্রয়োজন হইলে দশটি যুদ্ধ হয় ত' হইবে আগামী কাল (হয় ত' আজই) যদি না বিপ্লব আসিয়া তাহাকে বাধা দেয়। কারণ, আজ এই বিপ্লব আসিয়াছে—তরুণ, জোয়ান ও সশস্ত্র। বিপ্লব আজ আমাদের দ্বারে পাহারা দিতেছে। ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে ইহার আগমনকে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, ইহার অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম, কিন্তু বেদনার সহিত মনশ্চক্ষে ইহাও আমি দেখিয়াছিলাম যে এই বিপ্লবের অভ্যাগমে ঘৃণার অভিযান দ্বিগুণ শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিবে, ধ্বংসের শ্মশানে ইউরোপ মরিয়া পড়িয়া রহিবে।

"হে ইউরোপ বিদায়···তুমি আজ কবরে পথ হাতড়াইয়া ফিরিতেছ, কবরেই তোমার স্থান, কবরেই তোমার শয্যা। জগতের নেতৃত্বভার অন্যে গ্রহণ করুক।"

এই রচনার তারিখ ১৯১৬ সালের ২রা নভেম্বর।

বিপ্লব তখনও আরম্ভ হয় নাই কিন্তু সমগ্র ইউরোপের ভস্মের আচ্ছাদনের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বলিতে শুরু করিয়াছিল। ফ্রান্সে মজুরশ্রেণীর একটা সংখ্যালঘুদলের মধ্যে তখন আবার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। সি জি টি-র একটা শাখার নিকট হইতে আমি এক পত্র পাইলাম (১৯১৫ সালের ৫ই-৮ই সেপ্টেম্বর)। জিমারবাণ্ট যাইবার পথে মারহাইম চিঠিখানি আমাকে দিয়া গেলেন। লেনিন যেখানে কিছুদিন আগে শ্রেণীসংগ্রাম ও মজুর-বিপ্লবের জন্য শক্তিশালী আবেদন করিয়া গিয়াছিলেন সেখানে আসিলেন কিয়েন্থল (১৯১৬ এপ্রিল মাসের শেষভাগ)। এমনকি ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্য হইতে বিদ্রোহের সাংঘাতিক কানাকানি ও কথাবার্তা আমার

কানে আসিতে লাগিল। আমি ইহাকে সমর্থন করিলাম না; কারণ, এই অন্ধ ক্ষোভ ও অসন্তোষের না ছিল কোনো আদর্শ, না ছিল কোনো সংগঠন, না ছিল কোনো নেতা—যিনি তাহাদের শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতে পারেন। পশ্চিম ইউরোপে লক্ষ্যহীন ধ্বংস অথবা কতকগুলি সামরিক বিবৃতির মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের এই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি হইতই। গিলবোর নিকট লিখিত বহু পত্রে আমি ইহার তীব্র নিন্দা করি। লেনিন নিজে উহার উৎসাহ দিতেন কিনা আমার সন্দেহ আছে কারণ, চিন্তাশীল ও কর্মবীর নেতা মাত্রই শৃঙ্খলাহীন কার্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ বড় খবর আসিল। আশার অধীর উত্তরের বাতাস জেনেভার পথে পথে সে-খবর বহন করিয়া আনিল। বাতাসে রক্তবসন্তের সৌরভ পাওয়া গেল। খবর আসিল রাশিয়া তাহার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে। ঐ সময়েই গর্কির নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইলাম। লেখক চিঠির মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া—নূতন বড়দিনের আনন্দবার্তা জানাইয়াছেন! 'খ্রীষ্ট উঠিয়াছেন'! যুদ্ধরত একটা মহাদেশের ওপার হইতে এপারের আমাকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। জেনেভায় স্বাধীনচেতা ফরাসীদের আমাদের সমস্ত দলটি রুশ বড়দিনের অভিনন্দনে একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল: 'সত্যই তিনি উঠিয়াছেন'। সকলের সম্মিলিত স্বাক্ষর সম্বলিত একটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করিলাম। যে-পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করিলাম উহার মধ্যকার আবেদনটি রচনা করিলাম আমি নিজে। আবেদনটির নাম 'স্বাধীন ও স্বাধীনতার প্রতি ধাবমান রাশিয়ার প্রতি' (১৯১৭ সালের ১লা মে)।

পশ্চিম ইউরোপের আমাদের মত আমেরিকা হইতেও স্বাধীনচেতা বহু মনস্বী রুশবিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের

মর্মস্থল এই আমেরিকা তখন যুদ্ধের নৈবেদ্য খাইয়া মেদস্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্য হইতে আসিলেন ম্যাক্স ইস্টম্যান ও তাহার মাসেস পত্রিকার প্রধান সহ-সম্পাদক জন রীড। জন রীড কয়েকমাস পরেই অক্টোবর-বিপ্লবের অপূর্ব ইতিহাস রচনা করিয়া অমর হন। আজ তাহার দেহ ক্রেমলীন-প্রাচীরের তলে লেনিনের পার্শ্বে সমাহিত। ইহাদের উদ্দেশে আমি মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলাম।

ইউরোপের জাতিগত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে, ফ্রান্সের সোশিয়ালিস্ট ও সিণ্ডিক্যালিস্ট সংখ্যালঘু দলের পক্ষ হইতে, স্বাধীন মতবাদের সংবাদপত্রগুলি ও রুশ বিপ্লবীদলের দ্বারা যে প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছিল তাহার সংবাদ নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের সহিত চাপিয়া যাইবার জন্য আমি একটি প্রবন্ধে এই প্রথম সুইস সংবাদপত্রগুলিকে আক্রমণ করিলাম। সে-প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে একটা বিদ্রোহের আগুনের উত্তাপ অনুভব করা যায়। এ-বিদ্রোহ তাহাদেরই যাহারা "সমুদ্রের উপর দিয়া এবং সমুদ্রের চেয়েও বিশাল মানুষের নির্বুদ্ধিতার উপর দিয়া ইউরোপ নামক কারাগার হইতে আমেরিকা নামক কারাগারের সহিত হাত মিলাইয়াছে।"

ইহারই অল্পকাল পরে আমি ই. ডি. মরেলের পক্ষ সমর্থন করি তিনি তখন ইংলণ্ডে অত্যন্ত কদর্য অবস্থার মধ্যে কারারুদ্ধ। সুইজারল্যাণ্ডে আমার নিকট তাহার একখানি রাজনৈতিক পুস্তিকা পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ; অভিযোগটি শুধু হাস্যাস্পদই নহে, একেবারে মিথ্যা। 'সৈনিক সর্বহারাদের' নামে হত্যালিপ্সু পুরাতন জগতকে বারবুস্ একটি প্রবন্ধে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারিফ করিয়া বারবুসকে পত্র দিলাম। এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম না; সেনাবাহিনীতে

যে-সকল তরুণ ফরাসী বুদ্ধিজীবী ছিল তাহাদের ক্ষোভ ও বেদনার আর্তনাদের জবাবও দিলাম।

সীমান্তের অপর পারে যাহারা ছিলেন তাহাদের বিদ্রোহ ও বেদনাকে আমি প্রকাশিত করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে ছিল লাৎস্কোর বিকারের আর্তনাদ, স্তেফান ৎসাইগের বাইবেলের মত বিষণ্ণতা, ফাদার নিকোলাইয়ের যুদ্ধের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। উৎপীড়িত ও কারারুদ্ধ এই জার্মান পণ্ডিতকে আমি একজন 'মহান ইউরোপীয়ান' বলিয়া অভিনন্দন জানাইলাম। ইহাও জানাইলাম আমার দিক হইতে আমি কিছুতেই নিজেকে ইউরোপ ও ইউরোপীয় ঐক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। আমার কল্পনার 'বিশ্বদেশের' মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়াও রহিয়াছে, রহিয়াছে সমগ্র মানবসমাজ!

১৯১৮ সালের ১৫ই মার্চ 'ফর দি ইন্টারন্যাশনাল অব মাণ্ডই' নামক একটি প্রবন্ধে আমি আমার 'ইউরোপের বাহিরে বিশ্বমানবতা' প্রবন্ধের পুনরায় অবতারণা করি। এই প্রবন্ধে ইহাই আমি বিশেষভাবে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমি মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীর জন্য সংগ্রাম করিতেছি না; এ সংগ্রাম জনসাধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্য—যাহা কেবলমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য নহে।'

১৯১৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে দ্যমঁ্যা পত্রিকাখানির উপর সমাজসংগ্রামের ছাপ পড়ে। গিলবো-র ইচ্ছা ছিল তাহার জেনেভার বন্ধু বোলশেভিক নেতাদের সহিত ইউরোপের উপর দিয়া বিপ্লবের মশাল বহিয়া সে পেট্রোগ্রাডে যায়। তাহা না গিয়া সে ফরাসী সুইজারল্যাণ্ডে তাহার পত্রিকাখানিকে রুশবিপ্লবের মুখপত্র করিয়া তোলে। লেনিন, ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ, রাকোভস্কি, রাডেক, কালেনিন, জিনোভিয়েফ, লুনাচারস্কি অর্থাৎ পুরাতন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িবার যুদ্ধের সমগ্র সামরিক নেতৃমণ্ডলীর সদস্যদের নাম আমার প্রায়ই

এই পত্রিকাখানিতে চোখে পড়িত। রুশবিপ্লব ও রুশ বিপ্লবীদের সে সমর্থন করিত দুঃসাহসের সহিত। কিন্তু তাহার পত্রিকাখানির মত রুশবিপ্লবের ঘটনামালার এত ভাল ইতিহাস ফরাসী ভাষায় আর নাই।

আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম শুধু নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবেই। বিপ্লবের বীরগণের মহত্ব ও তাহাদের আদর্শের উচ্চতার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল বটে কিন্তু তাহাদের হিংসাত্মক রক্তপাতের পথ আমাকে কেবলই দূরে ঠেলিত। আমি কর্মী ছিলাম; আমার কাজ ছিল চিন্তা। আমি ভাবিতাম ইউরোপের চিন্তাধারাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, স্বাধীন ও দল-নিরপেক্ষ রাখিবার চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে লেনিন্ আমাকে সঙ্গে করিয়া রাশিয়ায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং গিলবো-র মারফৎ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হই নাই।

মানসিক বিবর্তনের যে-স্তরে তখন আমি পৌঁছিয়াছি তখন বিপ্লবকে অমি ভুল করিয়া একাধিক রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ বলিয়া ভাবিতাম, সেইজন্য চিন্তা জগতের প্রহরীর স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে আমি রাজি হই নাই। আজ আর আমার ওভাবে ভাবা চলে না। আজিকার মত সেদিন তখনও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, এমন কি শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, অভ্যন্তরটা এমনভাবে চোখে পড়ে নাই। 'বুদ্ধিজীবীর কুলীনগোষ্ঠী' নামক (এমন কি যখন 'আন্তর্জাতিক' নামে তাহারা জাহির করে তখনও) অদ্ভুত জীবের ভিতরটা তখনও আজিকার মত পড়িতে পারি নাই। যে চরিত্রবল, নাগরিক সৎসাহস ও চিন্তার বলিষ্ঠতা ঐ গোষ্ঠীর আছে বলিয়া আমারি ধারণা ছিল, দেখিলাম তাহার কিছুই নাই। ইহারা মুখে সত্যের বড় বড় বুলি আওড়ায়, এই বুলিতে নিজেদের ঢাকিয়া রাখে। বাস্তবক্ষেত্রে সত্যকে ইহারা ভয় পায়। সত্যকে ইহারা নিজেদের কাজে লাগায়। ইহারা এত

দূর যায় যে, সত্যকে সাহিত্যিক প্রসাধন হিসাবে, আর্টের অধরের কৃত্রিম রঞ্জনী হিসাবে ব্যবহার করিতেও ইহাদের বাধে না। এইভাবে ইহারা নিজেদের জাহির করে। লেখকদের মধ্যে সৌন্দর্যের উপাসক যিনি সবচেয়ে বেশি, তিনি রাস্তায় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য সত্যকে পণ্যা নারীর মত ব্যবহার করেন।

যদিও জাঁ ক্রিস্তফের সঙ্গে আমিও বহু পূর্বেই সত্যের এই সকল গণিকা ও দালালদের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তথাপি আরো কত দেখিবার বাকী থাকিল তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই—বুঝিতে চাহি নাই। ইহার পরেও আশা করিয়াছিলাম ইউরোপের মনস্বী-গোষ্ঠীর মধ্য হইতে ছোট অথচ দুঃসাহসী, আদর্শনিষ্ঠ, সংকল্পবদ্ধ একটি উপদলের অভ্যুত্থান দেখিতে পাইব এবং ইহারাই চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, প্রেক্যুরসোর পুস্তকের শেষ প্রবন্ধগুলি ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া লেখা। ইহাদের একত্রিত, দলবদ্ধ করিবার জন্য, ১৯১৯ সালের বসন্তকালের 'ঘোষণাবাণীটি' পুস্তকের সর্বশেষে সন্নিবেশ করি। সমগ্র জগতের শত শত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরের স্বাক্ষর ইহাতে রহিয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই আবেদনটির রচনা করিতে বসিয়া আমার চিন্তা বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, 'বিশ্বজনগণের' সেবায় তাহাদের নিয়োগ করিতে চাহিয়াছে—যে বিশ্বজনগণ 'দুঃখ ভোগ করে, সংগ্রাম করে, পরাজিত হয়, আবার ওঠে, আবার রক্তসিক্ত প্রগতির কঠিন পথ বাহিয়া যাত্রা শুরু করে।' তারপর ১৯১৯ সালের জুনমাসে 'প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট লিখিত পত্রের' ভাষা হিসেবে আমি উহাতে যে-নোট (এই পত্রে) লিখি: প্রেসিডেন্টকে' কোনো দলবিশেষের নহে, সমগ্র বিশ্বজনগণের জন্য' সংগ্রাম করিতে অনুরোধ জানাই। তাহাতে আমি ঘোষণা করি যে, উইলসনের ব্যর্থতার সঙ্গে

সঙ্গে প্রমাণিত হইয়া গেল 'বুর্জোয়া সমাজের মহান ভাবাদর্শের আর কিছু অবশিষ্ট নাই।'

তারপর তাকাইলাম তরুণ সোবিয়েৎ রাশিয়ার দিকে। দেখিলাম কী অপরিমেয় অমানুষিক সংগ্রাম করিয়া এই শিশুরাষ্ট্র বহুশতাব্দীর নাগপাশ ছিন্ন করিতেছে। ইতিপূর্বে পপুালেয়র পত্রিকায় একটি চিঠিতে আমি সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আঁতাতের সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 'রুশ বোলশেভিকদের সহিত আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন' পুনরায় জ্ঞাপন করি এবং প্রেক্যুরসোর পুস্তকের শেষ বাক্য ('বিচার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীর পরিশিষ্ট, অগাস্ট, ১৯১৯) বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবরোধ স্থাপনের ফলে রুশ বন্ধুদের স্বাক্ষরলাভের অক্ষমতার জন্য দুঃপ্রকাশ করিয়া অকুণ্ঠিতভাষায় ঘোষণা করা হয় 'রাশিয়ার ভাবাদর্শই পৃথিবীর অগ্রগামী চিন্তাধারা।'

যুদ্ধের পাঁচ বছরের (১৯১৪—১৯) বেদনাময় আমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে আঁ দস্যু দ্য লা মলে ও প্রেক্যুরসোর নামক দুইটি পুস্তিকায়। ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি এই প্রতিক্রিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটা অদ্ভুত অবস্থায়—ন যযৌ ন তস্থৌ। এদিকে আমি আশা করিতে লাগিলাম স্বাধীন, সুস্থ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক মনস্বীতার একটি দুর্গ গড়িয়া তুলিতে পারিব; অন্যদিকে দেখিলাম, কম্পাসের কাঁটা উত্তরমুখে দাঁড়াইয়াছে—ইঙ্গিত দিতেছে সেই লক্ষ্যস্থলের, যেদিকে ইউরোপের অগ্রগামী সৈন্যদল, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বীর বিপ্লবীদল চলিয়াছে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া। কম্পাসের কাঁটা নির্দেশ দিতেছে সেই পথের—যে-পথ সমগ্র মানবসমাজের সামাজিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের পথ।

অভিজ্ঞতা আমার আজও শেষ হয় নাই। এই অভিজ্ঞতার পরিশিষ্ট একদিন আমি বলিব * ; বলিব কেমন করিয়া মাত্র কয়েকজন ছাড়া ইউরোপের কোনো 'স্বাধীন' মনস্বীই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। বলিব কেমন করিয়া ইউরোপে পথ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে ভারতবর্ষের মহাত্মার নিকট স্বাধীন আত্মার বলিষ্ঠ উদ্বোধনের ও নূতন কর্মপথের সন্ধান পাই। বলিব তারপর কেমন করিয়া ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে পারিলাম এই আদর্শের সংঘাতকে—যাহাকে মার্কস্ অর্থনৈতিক বস্তুবাদের কঠোর আইনের নিগড়ে বাঁধিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ পৃথিবীকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ও সর্বহারা শ্রমিকসঙ্ঘ, এই দুই দানবের মধ্যকার গহ্বর দিনের পর দিন বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর করিয়া চলিয়াছে। বলিব কেমন করিয়া এই ঘাত-সংঘাতের ফলেই আজ আমি এই গহ্বর উত্তীর্ণ হইয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বড় শ্রান্তি, বড় বেদনার এ যাত্রা। এ যাত্রা আজও শেষ হয় নাই। এ যেন নাবিক সিন্ধুবাদের যাত্রা। এ যাত্রা যেদিন শেষ হইবে সেদিন বলিব :

"শান্তি, শান্তি, শান্তি। হে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক, হে আমার ক্লান্ত চরণ দুখানি, ঘুমাও ঘুমাও। তোমরা যা করিয়াছ তাহা চমৎকার। কঠোর, বিপদাকীর্ণ ছিল তোমাদের যাত্রাপথ। তা' হোক, তবু পথই চমৎকার। এমন পথে হাঁটিয়া পা দিয়া রক্ত পড়িলেও সুখ।"

* ইহাই আমি প্রারম্ভে বলিয়াছি।

॥ চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী ॥

হে মানসক্ষেত্রের শ্রমিকগণ, সমস্ত পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হে সমধর্মী সহকর্মিগণ, যুদ্ধরত জাতিগুলির বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদনীতির ফলে গত পাঁচ বৎসর সেনাবাহিনীর দ্বারা তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছ। আজ যখন সীমান্তপ্রাচীর আবার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে তখন পুনরায় ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের জন্য এই আবেদন তোমাদের কাছে পাঠাইতেছি। যে নূতন বন্ধন আজ আমরা বরণ করিব তাহা পূর্বের বন্ধনের চেয়ে আরও দৃঢ়, আরও শক্ত হইবে।

যুদ্ধ আমাদের বিশৃঙ্খলার গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই তাহাদের বিজ্ঞান, শিল্প ও মনকে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োগ করিয়াছে। আমরা কাহাকেও অপরাধী করিতে চাহি না। বিচ্ছিন্ন একক মানুষের মানসিক দুর্বলতা আমরা জানি, বিপুল সমষ্টিগত শক্তির সমষ্টিগত ঘটনাপ্রবাহের আদিম শক্তিকেও আমরা চিনি ; শেষটি আগেরটিকে এক মুহূর্তে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ; কারণ প্রতি-রোধের জন্য প্রস্তুত হইবার মত বিপদের ইঙ্গিত সে পায় নাই। এই অভিজ্ঞতা যেন ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগে।

যে শৃঙ্খলমুক্ত শক্তিনিচয়ের পায়ে স্বেচ্ছায় সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়া আমরা উহাদের ক্রীতদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা যে আমাদের জীবনে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটাইয়াছে তাহা সর্বপ্রথমে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। ঘৃণার যে অসংখ্য বিষাক্ত বীজাণু আজ ইউরোপের সর্বদেহ জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার জন্ম ও বৃদ্ধিলাভের দায়িত্ব আর্টিস্ট ও মনস্বীদেরও কম নহে ; জ্ঞান ও কল্পনার অস্ত্রাগার হইতে তাহার পুরাতন ও নূতন, ঐতিহাসিক

ও বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক ও কাব্যিক সর্বপ্রকারের যুক্তি বাছিয়া লইয়া এই ঘৃণার যুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন; মানুষের সহিত মানুষের অন্তরের মিলন ধ্বংস করিতে তাহারাও কম করেন নাই। যে চিন্তার প্রতিনিধিত্বের দাবী তাহারা করেন সেই চিন্তার মহিমাকে তাহারা কলুষিত করিয়াছেন; মনস্বিতাকে তাহারা উত্তেজনার উপকরণ হিসাবে বিশেষ কোনো কোনো গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, দেশ ও শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন। আজ এই বর্বর হানাহানির মধ্য হইতে বিজয়ী বা পরাজিত প্রত্যেক জাতি বিক্ষত বিনষ্ট এবং (মুখে স্বীকার না করিলেও) মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে জড়িত হইয়া মনস্বিতার মহিমাও খণ্ডিত হইয়াছে।

এই আপস, এই অপমানকর মৈত্রী, এই গোপন দাসত্ব হইতে মনকে মুক্ত করিতে হইবে। চিন্তা কাহারও ক্রীতদাস নহে; আমরাই চিন্তার ক্রীতদাস। আমাদের অন্য কোনো প্রভু নাই, চিন্তাকে উঁচু করিয়া রাখিবার জন্য, তাহার আলোককে চিরদিন প্রোজ্জ্বল রাখিবার জন্য, পথভ্রমে যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহাদের একত্রিত করিবার জন্য আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্ধকারে অন্ধ বাসনা কামনার ঝড়ের মধ্য দিয়া একটি স্থির বিন্দুতে, একটি ধ্রুব তারকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। দম্ভ ও হানাহানি ইহাদের মধ্যে কোনোটাই আমরা গ্রহণ করিব না, দুটিকেই বর্জন করিয়া চলিব, একমাত্র সত্যকেই আমরা মানিব; মানিব সেই সত্যকে যে-সত্যের পায়ে কোনো শৃঙ্খল নাই, যে-সত্যের পূর্ণতাকে ভৌগলিক সীমান্তপ্রাচীর দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে না, যে সত্যের বিস্তৃতির শেষ নাই, জাতি ও বর্ণের সংকীর্ণতা যে-সত্যকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। মানুষের নিয়তি ও জীবনযাত্রায় আমাদের যে কোনো কৌতূহল নাই তাহা নহে, আমাদের সমস্ত পরিশ্রম তো সেই

মানুষের জন্যই। কিন্তু এ-মানবতা পূর্ণ মানবতা, খণ্ড মানবতা নহে। বহু জাতিকে আমরা স্বীকার করি না ; আমাদের কাছে জাতি এক, সে-জাতি অনন্য ও বিশ্বব্যাপী, সে-জাতির মানুষ দুঃখ ভোগ করে, লড়াই করে, বারম্বার পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, রক্তসিক্ত কঠিন পথে অশ্রান্ত চরণে আগাইয়া চলে। এ-জাতি সমস্ত মানুষের এক জাতি। এ-জাতির প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের ভাই। তাহারাও যাহাতে আমাদের মত এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে সেইজন্য তাহাদের অন্ধ আত্মকলহের শীর্ষদেশে মৈত্রীর এই তোরণ আমরা স্থাপন করিতেছি। এ-তোরণ এক বহুবিচিত্র চিরন্তন মুক্ত মনের মহাতোরণ !!

ভিলে নেভে আর. আর

১৯১৯ সালের বসন্তকাল।

[এই ঘোষণাবাণীর স্বাক্ষরকারিগণ সম্পর্কে ভূমিকা দ্রষ্টব্য। অনুবাদক।]

॥ বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর ঐক্যের আবেদন ॥

এই যুদ্ধের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের ও শ্রমজীবী-জগতের মধ্যকার বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং যতই দিন যাইতেছে এ-বিচ্ছেদ ততই গভীর ও ব্যাপক হইতেছে। এ-যুদ্ধের সাংঘাতিক কুফলের ইহা অন্যতম এবং ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে বিপদ্‌জনক। প্রত্যেক দেশেই এই পবিত্র ঐক্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এই ঐক্য প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজস্বার্থে সমর্থন ও পোষণ করেন, কিন্তু যাহারা দেশে দেশে এই ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের আন্তর্জাতিক ঐক্যকে বিসর্জন দিয়া এই ঐক্যকে রক্ষা করা হয়। ঐক্যের এই আন্তর্জাতিক আকাঙ্ক্ষাকে দলন করিতে বুদ্ধিজীবীরা যাহা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। গবেষণামন্দির, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্যিক-সমিতিগুলি অবিশ্রান্তভাবে যে জাতীয় বিদ্বেষ ও দম্ভের ইস্তাহারগুলি প্রচার করিয়াছে সে-কথা স্মরণ করিয়া আজ আর লাভ নাই। বুদ্ধিজীবীদের মত জাতীয়তাবাদের এত বড় উৎসাহী সমর্থক যে আর নাই তাহা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

জার্মানীর মত যে-সকল দেশে বিপ্লব হইয়াছে সেইসব দেশে প্রায়ই ছাত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেই হোয়াইট-গার্ডস্‌-এর সৃষ্টি হয়। ইহাও দেখা গেল নূতন ভাবাদর্শকে দলনের জন্য বিপ্লব-বিরোধীরা এই সৈন্যদের ব্যবহার করিয়াছে। পারির পালিটেকনিকস্‌ ও বড় বড় কলেজগুলির ছাত্রগণ ১৮৩০ সালে একটা জাগ্রত জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ব্যারিকেডে দাঁড়াইয়া, যটুকু করিয়াছিল তাহা যেন আজ কতদূর অতীতের কথা বলিয়া মনে হয়। আজিকার বুদ্ধিজীবিগণ যেন মধ্যশ্রেণীর সাথে আপনাদের একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছে, মধ্যশ্রেণীর সমস্ত সংকীর্ণ কুসংস্কারগুলিকেই, সমস্ত রক্ষণ-

শীলতাকেই তাহারা যেন গ্রহণ করিয়াছে ; যে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে তাহাদের বিশেষ সুবিধাগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে তাহার ভয়েই তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পায়ে আত্মসমর্পণ করিতেছে।

ফলে সাধারণ মানুষের চোখে ইহাদের স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠিতেছে ; অথচ ইহাদের অনেকেই সাধারণ মানুষেরই আত্মজ ; অতএব সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক পরিচালক ও উপদেষ্টা হওয়াই তাহাদের উচিত। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে জনসাধারণের এই মোহমুক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইতেছে। তাই দেখিতে পাই রাশিয়ায় কিছুকাল বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ঠুর দমন চলিল ; বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় আজ হয়তো সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ভিতরে আজও সন্দেহের আগুন জ্বলিতেছে। তীব্রতায় কিছু কম হইলেও ঐ একই লক্ষণ দেখা যাইতেছে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালিতে ; মাঝে মাঝে ভাষার যে-তিক্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহাতেই বোঝা যায় বিষ কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

'বুদ্ধিজীবীরা ধ্বংস হোক'—এই রণধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়াই যেন বুদ্ধিমান অথচ অতীত অভিজ্ঞতায় তিক্ত ও ক্রুদ্ধ কতকগুলি শ্রমিককেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। মসীজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যকার এই বিচ্ছেদের মত মর্মান্তিক ঘটনা পৃথিবীতে আর কি হইতে পারে! ইহার ফলে মসীজীবিগণ নূতন জীবনের উৎসের সহিত সর্বপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, গ্রন্থাগারের ধূলিধূসরিত কোনো প্রাচীন প্রতীকের মত অস্তিত্বই বহন করিবে মাত্র ; অথবা ইহার চেয়েও বড় বিপদ আসিবে ইহাদের জীবনে—শোষকশ্রেণীর হাতে গণনির্যাতনের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইবে ইহারা। আর বুদ্ধিজীবীদের হাতের জ্ঞানের মশাল নিবিয়া গেলে, শ্রমজীবীদের অভিযাত্রায় আসিবে বিশৃঙ্খলা ; তাহারা শুধু ধ্বংসের স্তূপই নির্মাণ করিবে, তাহাদের দ্বারা কোনো স্থায়ী নির্মাণকার্য সম্ভব হইবে না।

উভয় শ্রেণীর মধ্যকার এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে আমাদের দূর করিতে হইবে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আমাদের চেতনা আনিতে হইবে। এই কার্যের অধিকার আমাদের আছে। আমরা সংখ্যায় অল্প হইতে পারি কিন্তু সমস্ত দেশের এমন কয়েকজন চিন্তাজীবী লইয়া আমরা গঠিত যাহারা অত্যাচারের চারিটি বৎসর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে অটল বিশ্বাসে উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ আর শুধু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। কর্মক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করিবার জন্য আমাদের সম্মিলিত হইতে হইবে। অতীতের স্বেচ্ছাচারের দুর্গের উপর আঘাত হানিবার জন্য একই আবেগে সম্মিলিত সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সহিত আমাদের যোগ দিতে হইবে। অতীতপন্থী শক্তিনিচয়ের যে বিশাল প্রাচীর মানুষের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করিতেছে তাহাও ভাবাদর্শ ও স্বার্থ দিয়া গঠিত। স্বার্থকে তাহারা প্রকাশ করিতে চাহে না, কিন্তু ভাবাদর্শকে তাহারা মহিমামণ্ডিত করিয়া দেখাইতেছে ; স্বার্থের প্রকাশের চেয়ে এই ভাবাদর্শের প্রচারই বিপদ্‌জনক বেশি। আদর্শবাদের আচ্ছাদনে লোভ ও হিংসা আত্মগোপন করিয়া আছে।

এই সংগ্রামে আমাদের একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। এই মৃত্যুময় ভাবাদর্শগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই রক্তলিপ্সু জাতীয়তাবাদে ও ঈর্ষাকাতর স্বদেশ-প্রেমে হয়তো প্রথম অভ্যুদয়ের সময় পূর্ণতার সুষমা ও আদর্শের মহিমা ছিল। কিন্তু ব্যর্থ ত্যাগ, নিষ্ফল আত্মহনন, ব্যাপক ধ্বংস ও বিপুল আহুতি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করিবার শক্তি ইহাদের নাই। অথচ এই ধ্বংসের মধ্যে নূতন সৃষ্টির একটি বীজেরও সন্ধান মেলে না ; এই ধ্বংসের ফলে পৃথিবী বহুশতাব্দী ধরিয়া শুধু শ্মশান ভস্মেই পরিণত হইয়া থাকিবে। এই জাতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের মুখোশ খসাইয়া ফেলাই

আমাদের কাজ। অতীতের দেবতাদের নির্বাসিত করিয়া সেখানে আমরা সত্য ও জীবনের নূতন নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত করাইতে চাহি। কি নৈতিক কি বাস্তবিক সর্বপ্রকারের বিচ্ছেদ-সীমান্তের শৃঙ্খল হইতে, মৃত অতীতের সর্বপ্রকার প্রাণহানিকর কুসংস্কার হইতে মানুষকে আমাদের মুক্ত করিতে হইবে।

আজ শ্রমিকশ্রেণী পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সমবায়-সমিতি, ইউনিয়ন ও সোবিয়েৎগুলির মধ্য দিয়া বিপুল নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। পণ্যোৎপাদনের হার যথাসম্ভব বেশি করিয়া, কল্যাণ ও বাস্তব সম্পদের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া শ্রমিক শ্রেণী সমগ্র মানবসমাজের জীবনযাত্রাকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানসক্ষেত্রের শ্রমিকগণ, আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না ; আমাদেরও কাজ রহিয়াছে। জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা-বাদ ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিবার দায়িত্ব আমাদেরই। বুক ভরিয়া টানিবার মত নিখিল পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে শ্রমজীবিগণকে পরিপ্লাবিত করাই আজ আমাদের কাজ। একমাত্র এই বাতাসে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণেই তাহার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকিতে পারে, ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহনের শক্তি অটুট থাকিতে পারে। কাহাকেও দেশের মাটি হইতে ছিনাইয়া লওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বিক্ষত না হইয়া নিজের স্মৃতি ও জাতীয় বন্ধন হইতে নিজেকে ছিন্ন করা লেখক ও শিল্পীর পক্ষেই সবচেয়ে কঠিন।

সাধারণ কর্মধারা পরিপুষ্ট করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও রূপের আবিষ্কার ও প্রচারের দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের ও চিন্তাজীবীর। গাছের শিকড় মাটির গভীরে থাকে বটে, কিন্তু শুধু মাটিই গাছের প্রাণ যোগায় না, উপরের আলো ও বাতাস হইতেও গাছ প্রাণ আহরণ করে। তাই নিখিলবিশ্বের চিন্তাধারার বিশাল সমুদ্রে মানববনস্পতিকে

স্নান করিতে হইবে। আজ, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে এক অর্থহীন, অকল্যাণকর সংঘর্ষের ফলে সমাজের সৃজনীশক্তি ও উৎপাদন-শক্তির মধ্যেও সংঘর্ষ চলিয়াছে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে যাহারা মুক্ততর, যোগ্যতর, আনন্দোদ্বেল এক নূতন পৃথিবীর সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন তাহাদের আজ মিলিত হইতে হইবে এবং প্রত্যাশা করিতে হইবে এমন এক ব্যবস্থার যেখানে সৃজন ও পণ্যোৎপাদনের মধ্যকার বর্তমান বিরোধ সহযোগিতায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্বের প্রগতি আজ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা যেন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া না পড়ি, কর্মে আমাদের যেন শ্রান্তি না আসে। শ্রমিকেরা যে-পথ গড়িতেছে বুদ্ধিজীবীদের তাহা আলোকিত করিতে হইবে। তাহারা দুইটি বিভিন্ন মজুরের দল। কিন্তু কাজের লক্ষ্য এক।

॥ বার্লিনে রক্তাক্ত জানুয়ারী ॥

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯১৯

লাইবনেক্‌ট ও রোজা লুক্‌সেমবুর্গ-এর হত্যায় জনসাধারণ স্তম্ভিত হইয়া যায়। আরও স্তম্ভিত হয় তাহারা এই হত্যার জঘন্য হিংস্রতা দেখিয়া। একটি সংজ্ঞাহীন স্ত্রীলোকের মুমূর্ষু দেহ যে পাশবিক উল্লাসে একপাল শৃগাল টানিয়া লইয়া গেল—কিভাবে কোথায় তাহাকে কলুষিত করিতে জানি না—তাহা দেখিয়া সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত হইলেও ফরাসী সংবাদপত্রগুলিতে তেমন কোনো সাড়া জাগে নাই। এই জানুয়ারীর দিনগুলির মর্মান্তিক তাৎপর্য যেন ফ্রান্সের সংবাদপত্র-জগৎ ভালো বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই এই ঘটনাগুলি শুধু জার্মান বিপ্লবের পক্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবীর শান্তির পক্ষে, কতবড় সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। মিত্ররাষ্ট্রগুলির শাসকশ্রেণী ও তাহাদের বুর্জোয়া

সংবাদপত্রগুলি অদ্ভুত এক দৃষ্টিহীনতার পরিচয় দিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতা সত্যই এতদুর গিয়াছে যে সন্দেহ হয় ইহা অনিচ্ছাকৃত নহে। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারলাভ ও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার আসন্ন প্রয়োগের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহারা স্পার্টাসিস্ট-দিগের পরাজয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে; অথচ এই পরাজয়ে মিত্রশক্তিবর্গের যে কত বড় রাজনৈতিক বিপদ সূচিত হইতেছে সে সম্পর্কে তাহারা উদাসীন। ধনতান্ত্রিক স্বার্থরক্ষায় তাহারা এতদুর অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছে যে নিজেদের জাতিসম্পর্কে এই জাতীয়তাবাদীদের কোনো উদ্বেগের অবকাশ নাই।

গত দুইমাসের ঘটনাবলী মনোযোগের সহিত লক্ষ করিয়া আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি প্রাচীনপন্থী, সমরলিপ্সু ও রাজতন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়াশীল অভিযান জার্মানীতে দানবীয় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, আর ইহার সাথে একটা জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উন্মাদনা জড়ের মত সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মিত্ররাষ্ট্রগুলির প্রতি আজ আমি এই সতর্কবাণী করিতে চাই: "তোমরা তোমাদের কদর্য, স্ববিরোধী, একাধারে দৃঢ় ও দুর্বল নীতির দ্বারা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছ। একদিকে যেমন তোমরা জাতীয় দম্ভের পাশবিক প্ররোচনা যোগাইয়াছ, অন্যদিকে তেমনি জার্মানীর কতিপয় শাসক সম্পর্কে দেখাইয়াছ অবিশ্বাস্য ঔদাসীন্য।

"তোমরাই তো একদিন কাইজার ও যুবরাজের শাস্তি দাবী করিয়াছ। সেই তোমারাই আজ কেমন করিয়া এর্ৎসূবের্গে-এর সহিত আপস আলোচনা চালাইতেছ। এই এর্ৎসূবের্গেরই তো একদিন লিখিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে একটি জার্মান নাগরিকের রক্তপাত হইতে দেওয়ার চেয়ে সমগ্র লণ্ডন ধ্বংস করা অনেক বেশি মানবিক।...আমাদের একখানি জাহাজ ডুবিলে আমরা একটি ইংরেজ নগর ধ্বংস করিব।...যুদ্ধের সময় ভাবালুতা

এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা যাহা সামাজিক অপরাধের সমান।" সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থক ও অন্যতম প্রয়োগকর্তা শাইডেমানদের জয়লাভ তোমরা কেমন করিয়া সমর্থন কর বুঝি না ; কেমন করিয়া সমর্থন কর তোমরা সেই এবার্টদের ও নোসকদের যাহারা লুডেনডর্ফের অদৃশ্য অথচ চির-বিরাজমান জেনারেল স্টাফ হইতে আজও প্রেরণা আহরণ করিতেছে। স্পার্টাসিস্টদের ধ্বংস করিতে কেমন করিয়া তোমরা মনার্কিস্টদের সাহায্য আহ্বান করিতেছ! অথচ এই স্পার্টাসিস্টরাই তো শান্তির জন্য, জাতিতে জাতিতে মিলন স্থাপনের জন্য, যুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। হে ইউরোপের বুর্জোয়া গভর্ণমেণ্টগণ! দেশের স্বার্থ অপেক্ষা শ্রেণীর স্বার্থ তোমাদের কাছে বড় (মানবতার স্বার্থের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, উহার সহিত তোমাদের যে কোনো সম্পর্ক নাই তাহা তো সকলেই জানে)।

ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি। উইলিয়াম হার্জগ-এর পত্রিকা দী রেপুবলিক হইতে মোটামুটি এই তথ্য আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সেই রক্তাক্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটা অনাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি ইনি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন! যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমি এই রচনা লিখিতে বসিয়াছি তাহাও সেই দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গী এমন এক মুক্তচেতা বুদ্ধিজীবীর— যাহার জীবনে সত্যের অনুসন্ধানই সবচেয়ে বড় আসক্তি। শ্রমিকশ্রেণীর মিলনের প্রতি তাহার সহানুভূতি রহিয়াছে। দলগত সংকীর্ণতা ও নেতাদের বিদ্বেষ এই সহানুভূতিকে কলুষিত করিতে পারে নাই। কিন্তু উভয় শিবিরের হিংসাত্মক কার্যকে নিন্দা করিলেও তাহার মধ্যে যে সামাজিক সুবিচারের আগ্রহ রহিয়াছে তাহার ফলেই তিনি নির্যাতিত স্পার্টাসিস্টদের সমর্থনে সাহসের সহিত আগাইয়া আসিয়াছেন। কারণ, স্পার্টাসিস্টদের মধ্যেই তিনি, সবচেয়ে আদর্শনিষ্ঠ, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, জনস্বার্থের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যোদ্ধাদের দেখিতে পাইয়াছেন।

৬ই হইতে ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যে যে নাটকের অভিনয় হইয়া গেল, ৬ই, ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বরের রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যেই ছিল তাহার প্রস্তাবনা। এই সংঘর্ষগুলির ফলে অধিকাংশ সোশালিস্টই বিপ্লব হইতে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশালিস্টরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন অধিকাংশ স্পার্টাসিস্টদের নিকট হইতে। (পূর্বোক্তরা স্পার্টাসিস্টদের হিংসাত্মক কার্যাদির জন্য সমালোচনা করিত)। কেন্দ্রীয় পরিষদ হইতে যখন তাহারা ২৮শে ডিসেম্বর প্রতিবাদ স্বরূপ বাহির হইয়া আসিলেন তখন সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা দিবার কেহ থাকিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ কিল-এর শাসনকর্তা "শক্ত" মানুষ নোসককে আমন্ত্রণ করিলেন। ইনি পরে সেই কুখ্যাত জানুয়ারী দিনগুলির রক্তাক্ত নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন।
২রা জানুয়ারী কর্নেল রাইন্‌হাট প্রুশিয়ার সমরসচিব পদে নিযুক্ত হন। বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রতি ইহার কোনোই সহানুভূতি ছিল না। স্ট্রোবেল, কাউণ্ট আর্কো, আডল্‌ফ্‌ হফ্‌মান্‌, কুর্ট রোজেনফেল্ড, ব্রাইট্‌চাইড্‌, পাউল্‌ হফ্‌মান্‌, হকার ও সিমন—প্রুশিয়ার গভর্ণমেণ্টে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের এই কয়জন তখনও ছিলেন, ইহারা এইবার একযোগে পদত্যাগ করিলেন। ৩রা জানুয়ারী তারিখের এক ঘোষণাবাণীতে তাহারা জানাইলেন যে, একটা মিটমাটের জন্য তাহারা সর্বোপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের নিকট দাবী করা হইয়াছিল যে, কর্নেল রাইনহার্ট-এর নিয়োগপত্রে পরীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে স্বাক্ষর দিতে হইবে। কর্মসূচী সম্পর্কে রাইনহার্ট-এর লিখিত বিবৃতিও তাহাদের জানিতে দেওয়া হয় নাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমিতির নীরবতা কিছুতেই ভঙ্গ করা যায় নাই। এইভাবে তাহাদের সহযোগিতাকে একেবারেই মূল্যহীন করিয়া ফেলা হইয়াছে।
বিপ্লব-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে ইতিমধ্যেই

বহুস্থানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ তখন শুরু হইয়া গিয়াছিল। ৩০শে ডিসেম্বর উলস্টাইন-এ রণাঙ্গণ প্রত্যাগত গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যগণের সহিত গণসমিতির সংঘর্ষ হইল ; গণসমিতিগুলি ঐ সৈন্যদেরই সম্বর্ধনা করিতে গিয়াছিল লাল পতাকা লইয়া। ৪ঠা জানুয়ারী কনিগসহুটেতে সৈন্যগণ মজুরদের উপর গুলি চালাইল। পূর্বসীমান্ত রক্ষার অজুহাতে এই বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল। প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারকের দল পূর্বোক্ত জেলাগুলিতে গিয়া আস্তানা পাড়িল। ৪ঠা জানুয়ারী বার্লিনেই বিপ্লব-বিরোধীদের এক সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে কাউণ্ট ভেস্ট্রাপ, ক্যাপ্টেন নের্গের ও অন্যান্য বহু অফিসার যোগ দিলেন। এবং সেখান হইতে তাহারা সম্রাটের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া একটি তার প্রেরণ করিলেন।

অবশেষে ৫ই জানুয়ারী দেশরক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী পুলিশ প্রেসিডেণ্ট আইকহর্নকে সরাইয়া তাহার স্থলে রাশিয়ার পুলিশ বিভাগেরই প্রাক্তন মন্ত্রী আর্নস্টকে বসাইলেন ; কারণ, আইকহর্নের বিপ্লবী মনোভাবের কথা সকলেই জানিত। এই ঘটনাই চূড়ান্ত হইল, স্পষ্ট বোঝা গেল গভর্ণমেণ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা নিঃশেষে নির্মূল করিতে বদ্ধপরিকর এবং রক্ষণশীল দলগুলির সাহায্যে ক্ষমতার একমাত্র অধীশ্বর হইতে সংকল্পবদ্ধ।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টগণ, স্পার্টাসিস্টগণ এবং বার্লিনের বৃহৎশিল্পের মজুর প্রতিষ্ঠানগুলি গণবিক্ষোভের এক আবেদন ঘোষণা করিয়া তৎক্ষণাত এই প্ররোচনার জবাব দিল। স্পার্টাসিস্ট নেতা লাইবনেকৃট্ ও রোজা লুক্সেমবুর্গ এই বিক্ষোভকে আঘাত হিসাবে ব্যবহার করিলেন। ৫ই তারিখের সন্ধ্যাবেলায় ফরভায়েট্র্স্, ভোল্ফ্ অফিস এজেন্সির সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস এবং রাইক্স্-বাঙ্ক স্পার্টাসিস্টরা দখল করিয়া লইল। তাহারা যে হঠাৎ কেন এই হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করিল জানা যায় না, কারণ তাহাদের ডিসেম্বরের ইস্তাহারেও তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল

যে, শ্রমিক সাধারণের সুস্পষ্ট ইচ্ছার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হইলে তাহারা কিছুতেই বলপ্রয়োগ করিবে না।

লাইবনেক্‌ট্‌ ও রোজা লুক্‌সেমবুর্গ নিশ্চয়ই একটা আকস্মিক উত্তেজনায় এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। যে ক্রোধ এতদিন ধরিয়া তাহাদের মধ্যে জমা হইতেছিল এবং যুদ্ধের সাড়ে চার বৎসরের উত্তরাধিকাররূপে যে-মিথ্যার মহামারী বুর্জোয়া সংবাদপত্র-জগতকে আবিষ্ট করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আক্রোশই হয়তো তাহাদের এই ধৈর্যচ্যুতির মূলে ছিল। মিথ্যার এই বেসাতি বিপ্লবের পরে যতখানি নির্লজ্জ আকার ধারণ করিয়াছিল পূর্বে তাহা আর কোনোদিন হয় নাই। যে কারণেই হোক এই সাংঘাতিক নির্দেশ একবার দেওয়া হইয়া গিয়াছে, গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল।

শুরু হইবামাত্রই ভাষা ও উত্তেজনার সমস্ত সংযম ভাঙ্গিয়া উহা হিংস্রতার চরমে উঠিয়া গেল। সীগেসালেতে ৬ই তারিখে জনতাকে লক্ষ করিয়া লাইবনেক্‌ট্‌ বলিলেন ঃ

"আঘাত হানিবার মুহূর্ত উপস্থিত। সমাজতান্ত্রিক রিপাব্‌লিক আজ আর মিথ্যা কথা নহে, উহা বাস্তব সত্যে পরিণত। আজ যে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হইল তাহা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতে থাকিবে। এবার্ট-শাইডেমান-এর গভর্ণমেণ্টকে জনগণ যেন তীব্র ঘৃণার চোখে দেখে।"

ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলারীর বাতায়ন হইতে অনুচরবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া শাইডেমান ঘোষণা করিলেন :

"আজ বার্লিনে যে জঘন্য অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এখন আর কিছু বলা হইবে না। শুধু এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারি যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ

করিতে গভর্ণমেণ্ট কার্পণ্য করিবে না। এই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে হইবে, সাহায্যার্থ গভর্ণমেণ্ট সেনাবাহিনীকে আহ্বান করিবে। জনগণের হাতে আমরা অস্ত্র তুলিয়া দিব। এবং সে অস্ত্র কাঠের অস্ত্র নহে।" ইতিমধ্যে ৬ই জানুয়ারী লাইবনেকৃট্ যখন ভিলহেল্‌মস্ট্রাসের মধ্য দিয়া মোটরে যাইতেছিলেন তখন তাহাকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

নোসককে সরকারী সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হইল। তিনি প্রত্যেক স্থান হইতে সেনাবাহিনীকে আহ্বান করিলেন। রণাঙ্গন হইতে আহ্বান করিলেন গোলন্দাজ বাহিনীকে। কীল হইতে তিনি তাহার প্রিটোরিয়ান রক্ষীবাহিনী "লৌহবাহিনী"কে আহ্বান করিলেন। এই বাহিনী ছিল তাহার পরম অনুগত ১৪০০ সৈন্য লইয়া গঠিত। বুর্জোয়া ছাত্রদের লইয়া একটি শ্বেত রক্ষী-বাহিনী গঠন করিলেন। ফ্রীডরিক-ভিলহেলম্, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ও কর্তৃমণ্ডলী এক সপ্তাহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করিলেন। ছাত্রেরা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে ইহাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। বার্লিনে অন্ধ উত্তেজনার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ৭ই হইতে ১০ই পর্যন্ত রাত্রিদিন গুলির শব্দ ও ভয়ার্তের আর্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি এই সকল ঘটনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। শহরের অভ্যন্তরে গভর্ণমেণ্ট সর্বশক্তি সমবেত করিলেন। শহরের পূর্বপার্শ্বে রহিল বিপ্লবীদের প্রধান দপ্তর। প্রথম সাফল্যের পর তাহারা চের্ল, মসে ও উল্‌স্টাইনের পুস্তক প্রকাশালয়গুলি ও সেখান হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলি দখল করিল, ছোটখাট সংঘর্ষ লাগিয়াই রহিল। উত্তেজনার তীব্রতা এতদূর উঠিল যে ভিলহেল্‌মস্ট্রাসের প্রহরিগণ একদল নিরপরাধ বুর্জোয়া পথচারীর উপর কয়েকটি হাতবোমা ছুড়িয়া মারিল।

প্রথমে লেদবুর ও পরে কাউট্স্কি, অস্কার কন ও ডিটমান ও ব্রাইটচাইড সংঘর্ষের দলগুলির মধ্যে একটা মিটমাটের জন্য আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। ৯ই তারিখ নাবিক সমিতিগুলির স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাবাণীর কয়েক সহস্র পুস্তিকা বিমান হইতে শহরের উপর বর্ষণ করা হইল। ঐ ঘোষণাবাণীতে ছিল: "আর রক্তপাত নহে, আমরা শান্তি চাই। সাফল্য আসিবে বিচার বুদ্ধির দ্বারা, পশুশক্তির দ্বারা নহে।" এই আবেদনের কোনোই সাড়া মিলিল না। ঐ দিনই কেন্দ্রীয় নাবিক-পরিষদ সমস্ত সোশালিস্টদের ও গভর্ণমেণ্টের নিকট একটা আবেগময় ঘোষণাবাণীতে আইকহর্ন, শাইডেমান, এবার্ট, নোসক ও অন্যান্য নেতাদের সশস্ত্র সংঘর্ষ ও কলহ ত্যাগ করিবার জন্য আবেদন জানাইল।

"শাইডেমান, এবার্ট, নোসক, লাণ্ডসবের্গ, আইকহর্ন! জনগণের মঙ্গলের কথা কি এখনও তোমরা ভাব না? তাহাদের ভালোমন্দে কি তোমাদের কিছুই যায় আসে না? তোমরা বিদায় লও, অন্যে তোমাদের স্থান গ্রহণ করুক, দম্ভের দ্বারা পরিচালিত হইও না। তোমাদের ডেপুটির আসনের চেয়ে জনসাধারণের রক্তের মূল্য অনেক বেশি। জনগণের ঐক্য সাধনই তোমাদের সর্বোত্তম কর্তব্য হউক।"

এ আবেদনেরও কোনো ফল হইল না।

১০ই জানুয়ারী বার্লিনের ৪০ হাজার মজুর সোশালিস্ট দলগুলির শ্রমিককে বৃথাই ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। নেতারা যদি যোগ দেন তবে ভালোই, না দেন তবে নিজেরাই তাহারা এই ঐক্য আনিবে। রক্তপাত রোধ করিবার এই সংকল্প তাহাদের কার্যে পরিণত হইতে পারিল না। ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়া বৃথাই তাহারা শোভাযাত্রা বাহির করিল ও সমবেত ভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করিল। সোশালিস্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস্, বিপ্লবীদল, স্পার্টাসিস্ট, সকলকে লইয়া নূতন মৈত্রীর ভিত্তিতে একটা সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা তাহাদের ফলবতী

হইল না। কতকগুলি প্রতিশ্রুতি পাইলে স্পার্টাসিস্টরা তখনও মিটমাট করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেনাবাহিনী সমবেত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই কালহরণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে তাহারা অমানুষিক দম্ভে অটল রহিয়া সর্বপ্রকারের বিরোধিতাকে ধ্বংসের সংকল্প লইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষমতার পাশবিক মোহ মানুষকে এতদূর নিচে নামাইয়া আনে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশ সোশালিস্টদের নিকট তাহাদের নির্দেশগুলিকে আলোচনার জন্য পেশ করাটাই অপরাধ বলিয়া মনে হইল। যাহারা কেন্দ্রীয় নাবিক-পরিষদের ঐক্যের আবেদন-গুলি বিলি করিলেন তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল, প্রহার করা হইল এবং এমন ব্যবহার করা হইল যেন তাহারা "বলশেভিক ডাকাত, খুনে, এবং মিত্রশক্তির অনুচর।" তাহাদের ভয় দেখান হইল, পরে মুখে আঘাত করা হইল। প্রায়ই শোনা যাইত একদল বলিতেছে উহাদের গুলি করিয়া মার, অপরদল বলিতেছে না তাহাদের হ্রদের জলে ফেলিয়া দাও। ১০ই তারিখে সমস্ত সেনাবাহিনী গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আসিল। তাহারা সমস্ত আলাপ আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। চরম সংগ্রাম নিকটে আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া বিপ্লবিগণ সংগ্রামের ও সাধারণ ধর্মঘটের আবেদন জানাইলেন। বাভেরিয়া, ড্রেসডেন, ওল্ডেনবুর্গ ও ব্রুনস্‌ভিক-এর গভর্ণমেণ্টগুলি বৃথাই টেলিগ্রামযোগে গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে হিংসাত্মক নীতি ত্যাগ করিতে আবেদন জানাইলেন।

কুর্ট আইসনার লিখিলেনঃ "যদি সমগ্র জার্মানীর ধ্বংস দেখিতে আমরা না চাহি তবে এ-অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। নিষ্কৃতির একমাত্র পথ হইতেছে এমন এক গভর্ণমেণ্ট যাহা জনসাধারণের আস্থাভাজন এবং যাহার মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা প্রতিফলিত হইবে। যতদিন পর্যন্ত না জয়লাভ হয় ততদিন পর্যন্ত বিপ্লবের পথে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অভিযান পরিচালনা করিবার সংকল্প লইয়া এই

গভর্ণমেণ্টকে চলিতে হইবে। দক্ষিণে সর্বত্রই বার্লিনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।”

উইলিয়ম হার্জগ লিখিলেন: “কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এক চুলও নড়িল না। অমানুষিক নির্দয়তায় সে অটল রহিল। সাম্রাজ্যবাদী প্রাক্তন গভর্ণমেণ্টের মতোই সে সামরিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া রহিল। নোসকে চাহিলেন বিপ্লবে হিণ্ডেনবুর্গের ভূমিকায় অভিনয় করিতে। শোনা যায় লুডেনডর্ফ বার্লিন হইতে মাত্র ২০ মিনিটের পথ দূরে আছেন। শাইডেমান ও এবার্ট-এর দল বিশ্বযুদ্ধের ডিয়স্‌কুরাস-এর সাথে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর।

এই কথাগুলি যখন লেখা হইতেছিল তখন চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। নূতন ভের্সাইয়ে বার্লিনে প্রবেশ করিয়া শহরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ১১ই জানুয়ারি এক সাংঘাতিক দিন। সে দিনটা বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির পক্ষে এক মহা বিজয়ের দিন। তাহারা সংঘর্ষের যে কাহিনীগুলি প্রকাশ করিল তাহা জাতীয় জয়লাভের উচ্ছ্বসিত ঘোষণাবাণীর মতোই শোনাইল! বড় বড় মেশিনগান ও হাতবোমা লইয়া আক্রমণকারী সৈন্যগণ বেল-আলিয়াৎসস্ট্রাসে ও ব্লুশারস্ট্রাসে হইতে অগ্রসর হইল। ফরভায়েট্‌স্‌-এর উপর বর্ষিত হইল কামানের গোলা ঘণ্টায় পঞ্চান্নটি। তারপর সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত সহজভাবেই লিখিল: “হাতবোমা দিয়াই কাজ শুরু হয়; প্রত্যেক সৈন্যের ছিল ১৫টি করিয়া বোমা। ফরভায়েট্‌স্‌-এর ধ্বংসস্তূপের তলে হাতেহাতে মিলিয়া ছিল একশত জন।”

এক জন আহত ক্ষতবিক্ষত লোককে পার্শ্ববর্তী দালানের উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলা হইল। স্পার্টাসিস্টদের যাহারা আত্মরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহারাও আশঙ্কায় হাঁপাইতে লাগিল। তারপর সেকস্‌পিয়ার-এর চিরন্তন জনগণ, সেই হিংস্র জনতা, দুর্ভাগা জনতা, দুর্ভাগা বন্দীদের

উপর পড়িয়া তাহাদিগকে অসহ্য প্রহার করিল। সমস্ত অঞ্চলটা যেন উল্লাসে আত্মহারা হইয়া উঠিল। মহিলারা ও তরুণেরা উন্মাদ হইল সবচেয়ে বেশি। তাহারা ভাবিল দুর্ভাগাদের দুঃখভোগ বোধ হয় এখনও যথেষ্ট হয় নাই। মেয়েদের একটি বোর্ডিং স্কুল ছিল সেই গোলমালের মধ্যে। উইলিয়াম হার্জগ লিখিতেছেন : "টানেনবুর্গ-এর যুদ্ধ জয় ও লুজিটানিয়া নিমজ্জনের পর যে-উল্লাস জার্মানগণের মধ্যে দেখা গিয়াছিল সেই উল্লাস এবারেও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।"

ডয়চ টার্গেৎসাইটুং পত্রিকা লিখিল : "জনগণের এই উদ্দাম আনন্দকে ম্লান করিয়া দিয়াছে মাত্র একটি চিন্তা : লাইবনেকট্ ও রোজা লুকসেমবুর্গ ধরা পড়েন নাই! সর্বত্র সকলে এই কামনা করিতেছি। আশা করি যাহারা নররক্ত পান করিয়াছে তাহারা ল্যাম্প-পোস্টেই ঝুলিতেছে।" ইণ্ডিপেণ্ডেট ওয়ার্কার্স দলের কেন্দ্রীয়সমিতি বন্দীদের দেখিবার জন্য একটি কমিটি প্রেরণ করিলেন। ঐ কমিটি যে একটি চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাহারা লিখিলেন : বুর্জোয়া জনসাধারণের পাশবিক নির্যাতনের পর তাহাদিগকে মিলিটারি ব্যারাকগুলির সংলগ্ন কতকগুলি জানালাহীন আস্তাবলে একসঙ্গে তিনশত লোককে ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে; ব্যারাকের প্রবেশদ্বারে ক্রুদ্ধ সৈন্যগণ উহাদের মধ্যে সাতজনকে গুলি করিয়াছে। যে সৈন্যেরা তাহাদিগকে পাহারা দিতেছিল তাহারা পট্সডাম রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত। লেফট-ন্যাণ্ট প্রিন্স হোহেনৎসোলান এই রেজিমেন্টেরই লোক। "এবার্টকে নিরাপদ করিবার জন্য হোহেনৎসোলান লড়াই করিতেছে।" অলডয়চেন জয়লাভ করিল। ১৩ই তারিখের একটি সভায় ধর্মযাজক ট্রাউব ঘোষণা করিলেন : "স্পার্টাসিস্টদের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি গভর্ণমেণ্ট দেয় নাই, দিয়াছে পট্সডাম-এর শিকারিগণ। বহুলোক আজ প্রাচীন ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া পাইতে চায় (প্রবল হর্ষধ্বনি)। আমাদের

জার্মান সম্রাট উইলিয়মকে সম্বর্ধনা জানাইতে আমরা ভুলিব না। লুডেন-ডর্ফকেও আমরা অভিবাদন জানাইতেছি (প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি)।" প্রিভি কাউন্সিলর হয়েচ বলিলেন: "রাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি ভালোবাসা আমাদের হৃদয় হইতে কেহই মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। বিসমার্কের কীর্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয় নাই; ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে এক নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইবে...আলসেস্-লোরেন-এর কথা আমরা ভুলিব না। সমগ্র জগতকে উচ্চকণ্ঠে আমরা জানাইতে চাই: "আমরা কিছুতেই পরাজয় মানিব না। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)। সম্রাটের পরিবারকে আমরা যে পুনরায় আহ্বান করিয়া আনিতে পারিব—এ-আশা আমি ত্যাগ করি নাই।" (অবর্ণনীয় উত্তেজনা, কয়েক মিনিট ধরিয়া চীৎকার ও হর্ষধ্বনি, কালো, লাল ও সোনালি রংএর পতাকাকে অভিবাদন জানান হইল। 'হাইল ডির ইন সীগেরক্রাম্‌ৎস্,' 'ডয়চ উবের আলেস' সংগীত দুইটি গীত হইল।)

এই অন্ধ উন্মত্ততার মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ফাদার নিকলাই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের জন্য বিষণ্ণকণ্ঠে আবেদন জানাইলেন। রাগে ও দুঃখে তাহার বিচারবুদ্ধিও প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। "সন্ত্রাসবাদ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে, ভ্রাতৃপ্রেম ও মানবতার জন্যে"—এই নামে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। গত নবেম্বর মাসে বিপ্লবের মুখে জার্মানীতে ফিরিবার মুহূর্তে সুইডেন হইতে আমার নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখিলেন: জেলে থাকিবার সময় মানুষের প্রগতিতে আশা ও আস্থাস্থাপন কত সোজা। কারণ, বাহিরে আসিলে মানুষের সহিত যে-সম্পর্কবন্ধন পুনরায় স্থাপিত হয়—বন্দীশালায় তাহার সুযোগ ছিল না। হার্জগ-এর প্রবন্ধগুলি তিক্ত হতাশায় পূর্ণ: "জার্মান জাতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও যুদ্ধের সময়কার মতোই তাহারা প্রতারিত হইয়াছে, ব্যবহৃত হইয়াছে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের

যুপকাষ্ঠে বলি হিসাবে, তথাপি পশুশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা তাহাদের রক্তে রহিয়াছে এখনও। ...পূর্বে যেমন হিণ্ডেনবুর্গ ও লুডেনডর্ফ ছিল তাহাদের দেবতা আজ তাহাদের দেবতা তেমন হইয়াছে তাহাদের নূতন প্রভু এবার্ট ও শাইডেমান। ...সেই পুরাতন ব্যবস্থাই কায়েম রহিয়াছে। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, কায়েম রহিয়াছে প্রাচীন ব্যবস্থার সেই পুরাতন মন্ত্র ঃ "পিতৃভূমির শান্তি ও স্বাধীনতার কল্যাণ।" কিন্তু জাতি রহিয়াছে আগের মতই অন্ধ। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দেশের নিকট আমরা ছিলাম দেশদ্রোহী। ১৯১৯ সালে আমরা হইয়াছি বলশেভিস্ট, স্পার্টাসিস্ট—লুণ্ঠন ও হত্যার সমর্থক। কেন? কারণ, আমরা আমাদের প্রতিবেশী নাগরিকদিগের জন্য সুবিধার দাবী করিয়াছি ; কারণ, আমাদের বিশ্বাস জার্মানীর সমগ্র জনজীবনকে কলুষমুক্ত না করিলে জার্মানী পৃথিবীতে তাহার হৃতগৌরব ও হৃতসম্মানের স্থান ফিরিয়া পাইবে না। কারণ, বণিক-স্বার্থ, হিংসা ও প্রতিক্রিয়ার সহস্রমুখী আক্রমণে সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ আজ বিপন্ন। ...শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। জাতি আর কিছু চায় নাই ; এখনও আর কিছু চায় না। সমগ্র জাতি না হউক, অন্তত জাতির অধিকাংশের পক্ষে একথা সত্য। ইহাদের কোনো সাহায্য দিবার উপায় আমাদের নাই। কোনো রাজনৈতিক চেতনা ইহাদের নাই। ...অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া মিথ্যাচার ও পশুশক্তির অন্ধ উপাসনার পরিণামের সম্মুখে মন হতাশায় ভরিয়া ওঠে...। ১৪ই জানুয়ারি মিউনিকের এক বক্তৃতায় ডিক্‌টেটর নোসকেকে কুর্ট আইস্‌নার তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলেন, "নোসকে-গভর্ণমেণ্ট বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের মতোই বিপজ্জনক। জনগণের পরিষদগুলির মধ্য দিয়াই জনগণের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। আমাদের পক্ষে সমাজতন্ত্রের সাফল্যময় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিতভাবে কার্য করাই উচ্চাভিলাষ।"

১৫ই জানুয়ারি কমিটি অব দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ওয়ার্কার্স অব বার্লিন-এর একটি সভায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হইল। তাহাদের মতে এই গভর্ণমেণ্টের কিছুটা জনতার নিকৃষ্টতম অংশ লইয়া গঠিত, কিছুটা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশ। সুদীর্ঘ অভ্যর্থনার ধ্যে মোলকেনবুর্গ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: "সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে এমন একটি মনোবৃত্তি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালাইতে হইবে স্পার্টাকাশের বিরুদ্ধে লড়াইয়েব চাইতেও তীব্র ভাবে। যে সামরিক প্রতিক্রিয়াকে তাহার শিকারের দিকে লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে আর কিছুতেই থামান গেল না। অফিসারগণ (বহুক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ ব্যাতিরেকে ও নিজেদের কর্তৃত্ববলেই) লেদবুর, মেয়ার, কাউট্স্কি, ডী আকটিয়ন পত্রিকার সম্পাদক ফান্‌ৎস্‌ পফেমফেট, লেখক কার্ল আইনস্টাইন ও শান্তিবাদী ক্যাপ্টেন ফন্‌ বেরফেল্ডকে গ্রেপ্তার করিল। আইনস্টাইন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। (বিয়ার "নূতন পিতৃভূমি" নামক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রকাশ্য সভায় বেরফেল্ড-এর দুঃসাহসী বক্তৃতা সম্প্রতি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি ল্যুমানিতের ১৯১৯-এর ২৭শে জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে)।" বুণ্ড-এর অফিসগুলি পর্যন্ত দখল করিয়া— উহা স্পর্টাসিজম্‌-এর কেন্দ্র এই হাস্যকর অভিযোগে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চূড়ান্ত আঘাত হানিবার সময় তখন উপস্থিত। ১৫ই জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় লইবনেকৃট্‌ ও রোজা লুকসেমবুর্গ-কে হত্যা করা হইল।

ডী রেপুবলিক-এর যে সংখ্যায় সংবাদটি বাহির হইল সে-সংখ্যার রূপ কী গভীর মর্মান্তিক (১৭ই জানুয়ারির পূর্বে অবশ্য সংবাদটি বাহির হয় নাই)। সংখ্যাটির সম্মুখের পৃষ্ঠার সমস্তটি লইয়া হোয়েলডেরলিন-এর একটি বিখ্যাত চিঠি হিপেরিয়ন ও বেলারমিন (১৭৯৮) মুদ্রিত হইল। স্বদেশের বর্বরদের সহিত এই ব্যথিত বিরাট শিল্পীর একটি তিক্ত

বিচ্ছেদ চিঠিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাতাটি উল্টাইলেই চিঠিখানির এই অংশটুকু চোখে পড়িবে ঃ

“নিপীড়িত নির্বোধ জনগণ যে-পাপ আজ করিল তাহার সম্মুখে ঘৃণায় ও লজ্জায় আমাদের রসনা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মানবতা আর বাঁচিয়া নাই মানুষ পশু হইয়া গিয়াছে। তাহার মস্তিষ্কে আজ বিকারের উন্মাদনা।...এই দানবীয় নির্বুদ্ধিতার সহিত সংগ্রাম করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।” ইহার পর ছাপা হইয়াছে বৃহত্তর বার্লিনের শ্রমিক ও সৈনিকদিগের কেন্দ্রীয়সমিতির জনৈক সদস্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ ১৫ই জানুয়ারি রাত্রি ১১-২০ মিনিটের সময় জনৈক লেফটেনাণ্ট কর্তৃক লাইবনেকৃট্‌-এর মৃতদেহ একজন সাধারণ মানুষের মৃতদেহের মত শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে জমা দেওয়া হয়। পরদিন এক ঘণ্টার জন্য দেহটিকে সাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়!

উল্‌এ এজেন্সি যে সরকারী বিবরণী পাঠান তাহাও আমরা দেখিয়াছি ঃ ১৫ই তারিখে বুধবার রাত্রি ৯॥ টায় ভিলমের্‌সৃডর্ফ-এর একজন বুর্জোয়া রক্ষী কর্তৃক ধৃত হইয়া লাইবনেকৃট্‌ অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্‌স্‌ এডেন হোটেলে নীত হন। সেখান হইতে তাহাকে মোবিট বন্দীশালায় প্রেরিত হইবার আদেশ দেওয়া হয়। হোটেলের বাহিরে আসিবামাত্রই সমবেত জনতা তাহার মাথায় গুরুতর আঘাত করে। যে গাড়িতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তাহা টীরগার্টেন-এর মাঝামাঝি ভাঙিয়া যায়; বন্দী যখন রক্ষিগণের সহিত শার্লটেনবুর্গ-আলের দিকে আর একটি গাড়ীর জন্য হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন সেই সময় তিনি পলাইবার চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পৃষ্ঠদেশে বহু বুলেট বিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মত; ১৬ই জানুয়ারি শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষে যাহারা মৃতদেহটিকে প্রথম পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল

তাহারা মাত্র তিনটি ক্ষতের কথা উল্লেখ করে। উহার মধ্যে মুখের বামপার্শ্বের যেটা সেটা গুরুতর এবং তাহাতেই আহতের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় আঘাতটি দক্ষিণ দিকের কণ্ঠাস্থির নিকটে, এবং তৃতীয় আঘাতটি লাগিয়াছে হাতের উপরিভাগে। মিলিটারি পিস্তল দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত নিকট হইতেই তিনটি গুলি করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া লাইবনেকৃট্-এর ভ্রাতা থিওডোরও সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সরকারী তদন্তের প্রতিবাদ করেন তাহার পরিবারের পক্ষ হইতে, কারণ এই ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই জড়িত ছিলেন। পরিশেষে লাইবনেকৃট্-এর হত্যার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত আর একটা নৃশংসতার অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির বিবরণী হইতে ঘটনাটির একটি পূর্ণ চিত্র আমরা পাই।

আধ ঘণ্টা পরে রোজা লুকসেমবুর্গ গ্রেপ্তার হন। তাহাকে এডেন হোটেলে লইয়া যাওয়া হয়। সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে হোটেলের প্রবেশ পথে যাহাতে লোক না থাকে তাহার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং একটা মিথ্যা ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ জনতাকে অন্য দিকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ধাপ্পা ধরিয়া ফেলে। হোটেল হইতে বাহিরে আসিতেই রোজাকে আঘাত করা হয় এবং তাহার অচেতন দেহকে একটি সামরিক মোটর গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিছুদূরে বার্লিনের প্রবেশমুখে একজন পাহারাওয়ালা গাড়িখানাকে থামায়, এই সুযোগে কয়েকজন অজ্ঞাত লোক রোজার দেহ টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

কিন্তু বার্লিনের শ্রমিক ও সৈনিকদিগের কেন্দ্রীয়সমিতির নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে একজন সৈনিক এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ

"১৫ই তারিখে সন্ধ্যায় তিনি এডেন হোটেলে ছিলেন, রোজাকে তিনি বাহিরে আসিতে দেখেন। একজন অসামরিক ব্যক্তিও হোটেলের সম্মুখে

ছিল না। জন পনের কুড়ি সৈনিক—উহাদের মধ্যে অধিকাংশই অফিসার—উত্তেজিতভাবে গাড়িখানির চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যে মুহূর্তে রোজা চৌকাটের উপর দেখা দিলেন সেই মুহূর্তেই দ্বারে দণ্ডায়মান প্রহরী রাইফেল তুলিয়া রোজাকে গুলি করে। রোজা চিৎ হইয়া পড়িয়া যান। সে তখন আর একবার গুলি করে। প্রহরীটি তৃতীয়বার গুলি করিতে উদ্যত হইলে দেখা গেল প্রাণহীন দেহটি ইতিমধ্যে গাড়িতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং গাড়িখানি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সৈনিক পিছন হইতে লাফ দিয়া গাড়িতে গিয়া ওঠে এবং রোজার অচেতন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে কি যেন একটা জিনিস দিয়া আঘাত করে। পত্রলেখকের বিশ্বাস জিনিসটা একটা রিভলভার। গাড়িটি যখন প্রায় একশত গজ গিয়াছে তখন আর একটি গুলির শব্দ শোনা যায়।"

শাইডেমান ১৬ই তারিখে ক্যাসেল-এ ছিলেন। তিনি যখন তাহার রাজনৈতিক শত্রুগণের মৃত্যুর খবর শুনিলেন আনুষ্ঠানিকভাবেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। উপরন্তু এক হিংস্র বক্তৃতায় তিনি তাহার বিরোধীদের তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। সেকস্‌পিয়ারের নাটকগুলিতে দেখা যায় মহান প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মারা যান তখন বিজেতারা তাহাদের মহত্ত্বের প্রতি সহৃদয় সম্মান প্রদর্শন করেন। কোরায়লেনাস নিহত হইবার পর আউফিডিউস তাহার মহত্ত্বকে স্বীকার করিয়া বিপুল সম্মান-সহকারে তাহাকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শাইডেমান সেকস্‌পিয়ারের নায়ক নহেন।

তিনি বলিলেন: "এ-যুদ্ধকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বলা হইয়াছে—না, চোর ও অপরাধীরা আমার ভাই নহে।"

যদিও তিনি লাইবনেক্‌ট্‌ ও রোজাকে বিপজ্জনক উন্মাদ বলিয়া মনে করিতেন তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রমাহাত্ম্যকে স্বীকার করিতে

তিনি রাজী ছিলেন; কিন্তু স্পার্টাসিস্টরা যে বলশেভিজম্-এর বিষে বিষাক্ত হইয়াছে—এই প্রচারটুকু যাহাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাই আধুনিক চিচেরোর মতো তিনি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, দেশকে তিনি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। "জনস্বার্থের কল্যাণেই স্পার্টাসিস্টদের দলন আবশ্যক; জাতির নিকট, ইতিহাসের নিকট, এই কর্তব্য আমাদের পালন করিতে হইবে।"

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি আনন্দে যেন প্রলাপ বকিতে শুরু করিল—ডয়চ ৎসাইটুং লিখিল লাইবনেক্ট্ ও রোজা লুকসেমবুর্গ যে-অপরাধ করিয়াছে কোনো শাস্তিই তাহার উপযুক্ত নহে। ডয়চ টাগেৎসাইটুং লিখিল লাইবনেক্ট্ ভাগ্যবান, বৈধ শাস্তির হাত হইতে ভাগ্য তাহাকে রক্ষা করিয়াছে; যে-শাস্তি সে পাইয়াছে তাহা ঈশ্বরের শাস্তি। কাগজ-খানি ইহাও লিখিল যে, কাপুরুষের মতো পলাইতে গিয়াই নাকি লাইবনেক্ট্ নিহত হইয়াছেন। ক্রয়ৎস ৎসাইটুং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। লোকাল আনৎসাইগের-এর চোখে সমস্ত দোষ লাইবনেক্ট্-এরই: জার্মান জাতি স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির, লাইবনেক্ট তাহাকে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শুধু একটু মহত্ব দেখা গেল ভসিশে ৎসাইটুং কাগজখানির। স্পার্টাসিস্ট নেতা দুইজনকে নিন্দা করিলেও তাহাদের নৃশংস হত্যাকে সে সমর্থন করে নাই। ফরভায়ের্ট্স্ মৃত দুই নেতাকে নিন্দা করিলেও হত্যাকারীদের তিরস্কার করিল। কিন্তু সত্যকার মহত্ব দেখাইল ৮-উর আবেগু ব্লাট। আইনজীবী লাইবনেক্ট্-এর প্রাক্তন সহকর্মী ডাঃ জোহানেস ভেটহাউয়ার মৃতব্যক্তির উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। নিঃস্ব ও নিপীড়িত মানুষের স্বার্থ লইয়া এই হৃদয়বান পুরুষের সংগ্রাম যে কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহার কথা তিনি স্পষ্ট

করিয়াই উল্লেখ করিলেন। নিজের চোখে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহারই কথা তিনি লিখিলেন লাইবনেক্‌ট্‌-এর চরিত্র বর্ণনায়। তিনি লিখিলেন : "সত্যের পতাকাতলে অশ্রান্ত যোদ্ধা, নিঃস্বার্থ, পূতচরিত্র এই মানুষটি দুঃখভারনত মানুষের সেবায় আপনার সব কিছু ঢালিয়া দিয়াছিলেন।"

এই শাঠ্য ও পশুবলের যুগে 'সুবিচার' কথাটা যখন মানুষের রসনায় রসনায় অবিশ্রাম ঘুরিয়া ফিরিতেছে, তখন সুবিচার সত্যই এত বিরল হইয়া উঠিয়াছে যে হত্যার প্রত্যুষেই লাইবনেক্‌ট্‌-এর নৈতিক নির্মলতার পদপ্রান্তে এই হৃদয়বান প্রতিদ্বন্দ্বীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্মৃতির ভাণ্ডারে চিরদিন রক্ষা করিবার মতো জিনিস।

কিন্তু এ বাণীর কোনো প্রতিধ্বনি উঠিল না। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের বিজেতাগণ নির্লজ্জের মতো উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেন। হার্ডগ লিখিলেন: "যে-জাতি একদিন হের্ডের, হোয়েলডেরলিন, কাণ্ট, হুম্বোল্ট ও ক্লাইস্ট কে জন্ম দিয়াছিল সে-জাতি আজ এক মধ্যযুগীয় ব্যক্তির সামনে মাত্র ৫০ বৎসরের সিদ্ধি-পূজার ফলে, এতখানি নিচে নামিয়াছে, মানবীয় অনুভূতি হইতে এত দূরে সরিয়া আসিয়াছে যে, এই হত্যাকাণ্ডকে সে লুজিটানিয়া নিমজ্জনের মতোই ন্যায়ের কথা বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা করে না··· কোনো কথা বলা নিরর্থক। এই মিথ্যার সমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেকে শক্তিহীন মনে হয়।···আমরা আহত, বিপন্ন।···বিভিন্ন দলের সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছি। পশুশক্তির প্রতিনিধিগণ এই চেষ্টাকে অপমানকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; তাহারা তাহাদের নিজেদের ব্যবস্থার কারাগারে নিজেরাই বন্দী।····আমরা ভাবিয়াছিলাম এই বিপ্লবের ফলে মানবতার আদর্শগুলি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, ভাবিয়াছিলাম অপর জাতির ভায়েদের দিকে আমরা হাত বাড়াইয়া দিতে পারিব।···এ-বিপ্লব বিপ্লব নয়, নাবিকদের সশস্ত্র

অভ্যুত্থান মাত্র; ইহার ফলে যে জার্মান জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্তন হইয়াছে এইরূপ ধারণা বিপজ্জনক। মত্ততা বহুদূর গিয়াছে···

"নিজেদের কার্যের পরিণাম দেখিয়া শাসকেরা নিজেরাই আজ শঙ্কিত; কিন্তু পিছু হাটিবার উপায় নাই; যে-জালে তাহারা জড়াইয়াছে তাহা ছাড়াইয়া বাহিরে আসা অসম্ভব। তাই, কৃতকার্যের নির্ভুলতার প্রমাণের চেষ্টা তাহাদের করিতেই হইবে। সমগ্র জাতি আজ জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন এক রোগীর মতো; চিকিৎসকেরা তাহাকে নীরোগ করিতে চাহেন না, ঘৃণা করেন।...একি উন্মাদ দৃশ্য দেখিতেছি। জাতির জন্য যাহারা সর্বস্ব দিয়া সংগ্রাম করিল, জাতিই তাহাদের আজ শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। কারণ, জাতি যে-পথে চলিতে চাহিতেছে তাহারা সে-পথের বিঘ্ন।··· আজ যখন তর্জন, হিংসা ও হত্যা প্রতিদিনের স্বাভাবিক সাধারণ জীবন-যাত্রার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, যখন নাগরিকদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা দ্বিতীয় উইলিয়মের যুগ হইতেও শিথিল, তখন মানবতার কথা তোলা বাতুলতা মাত্র।...সভ্যতার প্রগতি-পথের এই স্থান এখনও যে-জাতি উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্‌পরতার জন্য অপরাপর জাতির গণতন্ত্রগুলি যে তাহাদের মধ্যে স্থান না দিতে পারে এমন ভয় কি তাহার মনে স্থান পায় না?"···

কুর্ট আইসনার-এর তীব্র তিরস্কারের মধ্যে এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে; ২৬শে সন্ধ্যায় তিনি বলেন: "যখন ভাবি দ্বিতীয় উইলিয়ম, যুবরাজ টিরপিট্‌স্‌ ও লুডেনডর্ফ্‌-এর মতো লোক (শেষোক্ত লোকটি তো একেবারে বার্লিনের প্রবেশদ্বারে) বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তখন বার্লিনের এই উন্মত্ত অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। যাহারা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন, দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যাহারা নির্মল নিষ্কলুষ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন—বার্লিনের ক্রুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী আজ

তাহাদেরই বিরুদ্ধে নিজেদের নিয়োগ করিতেছে। ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের পাপাত্মাগণ এখনও বাঁচিয়া। চোখের উপর দেখিতেছি জার্মানীর দেহের মধ্যে সাংঘাতিক এক ব্যাধির ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। জার্মানীর সম্মান আজ বিনষ্ট...।”

প্রতিবাদে হামবুর্গ ধর্মঘট করিল, বন্ধ রহিল সবকিছু, সবকিছুই বহন করিল শোকচিহ্ন; ডুসেলডর্ফ্ গভীর শোকে নিমগ্ন হইয়া রহিল; এই ডুসেলডর্ফ্-এই হইল শবযাত্রা। বার্লিনে পর্যন্ত বড় বড় শিল্পগুলির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল।

২৫শে জানুয়ারি শনিবার লাইবনেকৃট্ ও তাহার সহকর্মীদের সমাহিত করা হইল। গভর্ণমেণ্ট কঠোর আদেশ জারি করিলেন, সৈন্যরা সর্বত্র কামান দিয়া বড় বড় রাস্তাগুলি ও স্কোয়ারটি বন্ধ করিয়া রাখিল; তথাপি ফ্রীড্রিক্স্-ফেল্ড-এর সমাধিক্ষেত্রে যে জনসমাবেশ হইল তাহা মনে রাখিবার মতো। বার্লিনের সমস্ত স্থান হইতে দরিদ্রের দল ভিড় করিয়া আসিল; ৩৩টি শবাধারের পার্শ্বে দৈন্য ও দুর্দশা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ‘গার্ড অফ্ অনার’ রচনা করিল: জীর্ণবেশ পরিহিত রুক্ষ ও বিষণ্ণ তরুণের দল; রুশ বন্দীশালা হইতে সদ্যমুক্ত শহিদের দল; চোখে জল ও পরিচ্ছদে শোক-চিহ্ন বহন করিয়া নারী ও বালিকার দল; সাম্রাজ্যের সর্বত্র হইতে সমাগত শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকের প্রতিনিধিগণ; সমাজতন্ত্রী তরুণ দল; লাল পতাকার সারি; প্লাকার্ডে প্লাকার্ডে মাত্র একটি কথা লেখা “হত্যাকারীর দল”। ৩২ জন স্পার্টাসিস্ট এবং তাহাদের নেতাদের একটি কবরে সমাহিত করা হইল। কোথাও কোনো একটি গুঞ্জনও শোনা গেল না। কিন্তু হৃদয়ের গভীর তলদেশ যেন প্রচণ্ড মেঘগর্জনে কাঁপিয়া উঠিল। তাহাদের নেতা লাইবনেকৃট্ মৃত্যুর পূর্বাহ্নে বসিয়া রোটেফানে পত্রিকার জন্য মরণোন্মুখ স্পার্টাকাশের যে মাল্‌গ্রে তু রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা না জানি কত হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল:

"স্পার্টাকাশকে নিষ্পেষিত করা হইয়াছে। অস্বীকার করি না বিপ্লবী কর্মীদের পিষিয়া মারা হইয়াছে। অস্বীকার করি না তাহাদের একশ শ্রেষ্ঠ বীরদের একত্রে হত্যা করা হইয়াছে ও একশ বিশ্বস্ততম কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এ-সব কিছুই অস্বীকার করি না। ইতিহাসের প্রয়োজনেই তাহারা দলিত হইয়াছে। সময় তখনও আসে নাই...কিন্তু এমন অনেক পরাজয় আছে যাহা পরাজয় নয়, জয়লাভ ঃ এমন অনেক জয়লাভ আছে যাহা বিপর্যয়ের চেয়েও বিষাদময়। জানুয়ারির রক্তাক্ত সপ্তাহে যাহারা পরাজিত হইল তাহাদের লক্ষ মহান। বেদনা-বিহ্বল মানবতার উদারতম বিকাশের জন্য, তাহার ঐহিক ও নৈতিক বন্ধন মোচনের জন্য, সেই বীরের দল প্রাণ দিয়াছে। যে-রক্ত তাহারা ঢালিয়াছে তাহার প্রতি বিন্দু হইতে জন্ম লইবে প্রতিশোধের রক্তবীজদল। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ভিয়া দলোরসা এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। মুক্তির দিন দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। এবার্ট, শাইডেমান, নোস্কে ও অন্য যে সকল পাণ্ডারা ইহাদের পশ্চাতে লুকাইয়া কাজ করিতেছে তাহাদের বিচারের দিন আসিতেছে। লক্ষলাভ পর্যন্ত যদি আমরা বাঁচিয়া না থাকি, বাঁচিয়া থাকিবে আমাদের কর্মনির্দেশ। নূতন মানবতা ও নূতন পৃথিবী চালিত হইবে ঐ নির্দেশেই। সব কিছু সত্ত্বেও মাল্‌গ্রে তু..."

মাল্‌গ্রে তু—ভবিষ্যতের সমাজ সংগ্রামে এই কথাটি আহ্বানবাণীর কাজ করিবে। কোনো রক্তাক্ত নির্যাতনই কোনো দিন ইহার কণ্ঠরোধ করিতে পারিবে না। এই প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত শক্তির পক্ষে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে সংগ্রাম করিতেছে। শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিয়াছে, ফলে এমন এক গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যে এমন একটা উন্মত্ত উদাসীন তিক্ততার সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে যাহার ফল সমস্ত জাতিকে ভোগ করিতে হইবে। এই গৃহ-যুদ্ধের জ্ঞাতি যোদ্ধাগণ কি একথা বুঝিবে না! সর্বসাধারণের স্বার্থের কল্যাণে কি

তাহারা ব্যক্তিগত বাসনা-কমনাকে খর্ব করিবে না। বার্লিনের 'রক্তাক্ত জানুয়ারির' যে-বর্ণনা আমি দিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মজুরেরা তাহাদের নেতাদের চেয়ে অনেক বেশি দেখিতে পায়; সমস্ত মজুরের ঐক্য তাহারা অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা করে। আজ নয়, এ-কথা আমরা বহুদিনই জানি যে, যে-বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমজীবীশ্রেণীর মধ্য হইতে জন্ম লইয়াও তাহাদের সহিত এই জন্মের বন্ধন অস্বীকার করে তাহাদের চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শুভ বুদ্ধি অনেক বেশি। পাঁচ বৎসরের যুদ্ধের কল্যাণে এ-সত্য আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, দম্ভ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাহাদের নেতাদের চেয়ে শ্রমজীবীসাধারণের বুদ্ধির বিচারবোধ বেশি।

১-৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ সাল। রমঁ্যা রলাঁ

ল্যুমানিতে ১৬, ১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯

খাদ্য অবরোধের বিরুদ্ধে রুশ ভ্রাতাগণের জন্য লিখিত

মিত্রশক্তিবর্গ, জার্মানগণ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি অর্থাৎ ইউরোপের সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী মিলিত হইয়া রুশ বিপ্লবকে ধ্বংসের যে আয়োজন করিতেছে তাহাতে এক নারকীয় পাপের পথই প্রশস্ত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এ-ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বলে তাহারা নাকি জার্মান স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু শাঠ্যে ও স্বার্থপরতায় তাহাদের মুষ্টিমেয়শাসিত গণতন্ত্র জার্মান স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে কম নহে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে-যুদ্ধের আগুন জ্বলিতেছে সে-যুদ্ধ যে তাহাদেরই যুদ্ধ, মুষ্টিমেয়শাসিত বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ, সে-যুদ্ধের লক্ষ যেমন একদিকে প্রাচীন রাজতন্ত্রের শেষ দুর্গকে ধ্বংস করা, তেমনি অপর দিকে জাগরমান জাতিসমূহের অধিকারের

দাবিকে স্তব্ধ করা—ইহা আজ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। এই চতুর ব্যবসায়ীশ্রেণীর স্বার্থপরতায় আদর্শের বিন্দুমাত্র উত্তাপ নাই, ভাবাদর্শের কোনো স্পষ্ট রূপ নাই। ইহাই একটা অন্ধ উন্মাদনায় এই যুদ্ধ পরিচালিত করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের বহু পূর্ব হইতে—ফিলিপ দ্য ফেয়ার-এর সময় হইতে—যে-রাষ্ট্রক্ষমতা ইহাদের করায়ত্ত তাহার পরিচালনা হইতেই ইহারা শক্তি আহরণ করিতেছে। কল্পনা ও মিথ্যার দুর্গ খাড়া করিয়া ইহারা চিরদিনই নিজেদের দায়িত্বহীনতাকে আড়াল করিয়া আসিয়াছে। অতীতে এই মিথ্যার বেসাতি করিয়াছিল তাহারা রাজাকে খাড়া করিয়া, আর আজ স্থাপন করিয়াছে সুবিচার, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার পুতুল-মূর্তি। সেদিন যেমন রাজ-আনুগত্যের নামে তাহারা নিজেদের স্বার্থ ও বাসনার চরিতার্থতা খুঁজিয়াছিল, আজ ঠিক তেমনি সেই হিংস্র প্রবঞ্চকের দল গণতন্ত্রের নামে সমস্ত পৃথিবীকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত। বেদনার্ত হৃদয়ে দেখিতেছি কত না নির্মল-হৃদয় শ্রমিক কর্মী, এমন কি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার বহু নিঃস্বার্থ মহাত্মা এই কপটতার ফাঁদে পা দিয়াছেন। যতদিন এই বৃহৎ প্রবঞ্চনার অবসান না হইবে ততদিন কোনো গভীর ও ব্যাপক সামাজিক প্রগতি অসম্ভব, প্রাচীন অচল দুর্নীতিবিষাক্ত সমাজব্যবস্থাকে যতবারই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইবে, ততবারই সে চেষ্টা হইবে শোচনীয়ভাবে নিষ্পেষিত, যে-ভাবে আজ নিষ্পেষিত হইতেছে আমাদের রুশ ভ্রাতাগণের বিশৃঙ্খল ও বিরাট প্রয়াস। কিন্তু ন্যায় ও মানবতার আরো ব্যাপক প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন ব্যবস্থার জন্য মানুষের মনে যে অনন্ত পিপাসা রহিয়াছে জোর করিয়া তাহাকে নিবারণ করা যাইবে না। সে-আকাঙ্ক্ষার শিখাকে হাজারবার নিবাইয়া দাও—একাধিক হাজারবার সে আবার জ্বলিয়া

॥ ল্যুমানিতে, ২৬ অক্টোবর, ১৯১৯ ॥

আঁরি বারব্যুসের সহিত 'চিন্তার স্বাধীনতা' লইয়া বিতর্ক

বারব্যুসের নিকট রলাঁর প্রথম খোলা চিঠি

বুধবার, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯২১

প্রিয় বারব্যুস,

"রলাঁবাদ সম্পর্কে" শীর্ষক আপনার প্রবন্ধটি আমি পাইয়াছি। আমার প্রতি যে ব্যক্তিগত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন এবং বিতর্কের মধ্যে যে উদার ও পরিমিত সুরটি আপনি আনিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, ভবিষ্যতে এই পথ হইতে আমরা বিচ্যুত হইব না; কারণ যাহাই ঘটুক না কেন, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়া শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সর্বদা সম্মিলিত থাকিবই।

আপনার চিঠির ব্যাপক ও বিশদ জবাব আজ দিব না। আমার সময়াভাব এবং এই প্রবন্ধের স্থানাভাব উহার কারণ। পরে যখন সময় পাইব তখন আমার ভাবধারা ও বিশ্বাস সম্পর্কে একটি বিবৃতিতে আপনার সবকথার উত্তর দিব। আজ পর্যন্ত এই ধরনের জবাব আমি দিই নাই। তাহার একটি কারণ, আপনার চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি না করিবার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনি তো জানেন ক্লার্তের মতবাদে আপনাদের বৈদেশিক দলগুলির কোনো কোনো নেতার আস্থা রক্ষা ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। "রলাঁবাদ"-এর উপর আপনি যে-সৌজন্যপূর্ণ আক্রমণ করিয়াছেন তাহার ফলেই আজ আমাকে আমার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইতেছে। ইহার ফল হইবে, যে-'রলাঁবাদ'-এর অস্তিত্ব এতদিন ছিল না তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা। ইহা যদি করিতে হয় তবে দুঃখের সঙ্গেই করিব; কারণ, যাহা কিছু ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে আমি তাহার প্রতি

বিরূপ। তবে আজ এই যে সংক্ষিপ্ত জবাব লিখিতেছি ইহা 'রলাঁবাদীদের' সমর্থন নহে, কেবলমাত্র রম্যাঁ রলাঁর নিজের কথা।

আপনি লিখিয়াছেন যে আমি সংস্কৃতিক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারে আপনাদের দলের সহিত সহযোগিতা করিতে চিরদিনই অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। প্রিয় বারব্যুস্, আপনি আমাকে বিস্মিত করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ক্লার্তের সূচনাকাল হইতেই আমি উহার প্রতিষ্ঠাতাগণের সহিত মতানৈক্য অনুভব করিয়া আসিতেছি। অবশ্য হঠাৎ কোনো স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে আমি চাহি নাই ; তাই নীরবে সতর্কভাবে উহার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করিয়া আসিয়াছি মাত্র।

আমার এই নীরবতাকে আপনি 'নিরাসক্তি' অর্থাৎ সেই অতি-বিখ্যাত 'গজদন্ত মিনারে' আত্মগোপন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত।

যিনি আমাকে জানেন, আমার যে-কোনো একখানি বই পড়িয়াছেন এমন যে-কোনো লোক বলিতে পারেন আমার মূল সুর অনাসক্তি, না জগতের দুঃখ-দুর্দশায় বিদীর্ণ হৃদয় লইয়া আমি করিয়াছি মানুষের কষ্টের উপশম ঘটাইবার চেষ্টা। আমার মতকে তাহারা না মানিতে পারেন, আমার বিশ্বাসকে তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। আমার যৌবনকাল হইতেই সে-বিশ্বাস আমাকে সর্বপ্রকার বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া আসিতেছে, সেই বিশ্বাসে ভর করিয়াই পার হইয়াছি আমি মহা গহ্বর।

আপনার কোনো বন্ধু আমাকে "এ মিস্টিক আঁ দিস্পানিবিলিতে" বলিয়াছেন। আমার চিন্তাধারার বিভিন্ন অংশের মধ্যকার ভারসাম্যের কথা বাদ দিলে বলা চলে যে যদিও এই পরিহাসোক্তি আমাকে আঘাত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে তথাপি 'সৌন্দর্যবাদীর অনাসক্তি' বলিয়া যে আখ্যা আপনি দিয়াছেন তাহার চেয়ে উহার মধ্যে সত্যের ভান

আছে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মের শক্তি (কথাটি যতদূর সম্ভব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি) আজ মানুষের কোনো উপকারেই আসে না এইরূপ ভাবিয়া আপনার বন্ধু অত্যন্ত ভুল করিতেছেন। মানবতার আধ্যাত্মিক জগতে যে বিপুল গোপন-শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, যে প্রবল প্রবাহে আলোড়িত হইতেছে তাহার গভীর অন্তস্থল, আপনার বন্ধু তাহার সংবাদ রাখেন না। আপনাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব নাই। জগতের উপরিভাগেই আপনাদের দৃষ্টি একটু বেশি নিবদ্ধ। জীবনকে বড় বেশি করিয়া আপনারা যুক্তির বন্ধনে বাঁধিতে চান। আপনারা যাহা বলেন তাহা শুনিয়া মনে হয় মানুষের বিবর্তনের রহস্যকে অয়ক্লিডেআউ-র জ্যামিতির একটি সমস্যায় পরিণত করাই ক্লার্তে-দলের মনোবৃত্তি।

কিছু মনে করিবেন না, আপনার প্রবন্ধের একটি স্থান পড়িয়া আমার হাসি পাইল, এ হাসি শত্রুর বিদ্রূপের হাসি নয়। আপনি লিখিয়াছেন ঃ "ক্লার্তের মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজবিপ্লবের যে সংজ্ঞা ও রূপ নির্ধারিত হইয়াছে সেই সমাজবিপ্লবের জ্যামিতির গণনায় ভুল হইতে পাবে না।" মানুষের সম্পর্কে কি অদ্ভুত অবাস্তব এই ধারণা। কত অচেতন ও আদিম শক্তি, কত শৃঙ্খলা ও সংহতির আলোকের উৎস এই মানুষ। রাজার চেয়েও রাজভক্ত আপনারা, যে বিজ্ঞানীদের সহিত নিজেদের তুলনা করেন তাহাদের চেয়েও আপনারা বেশি যুক্তিবাদী ; 'মূল নিয়মগুলির অভ্রান্ততা' সম্পর্কে তাহারা আপনাদের মতো এতখানি নিশ্চিন্ত নহেন।

যাহাই হউক না কেন আমার সম্পর্কে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে আপনাদের 'সামাজিক জ্যামিতির' নিয়মনিচয়ের অভ্রান্ততায় আমি বিশ্বাস করি না, ইহার আহ্বানে আমি সাড়া দিব না।

তাহার প্রথম কারণ, মতবাদের দিক হইতে (সামাজিক ও রাজনৈতিক

ব্যাপারে মতবাদের কি মূল্য আছে? কীর্তিই তো সব) নয়া-মার্কসীয় সাম্যবাদের মতবাদ (যে সুসম্পূর্ণ রূপ বর্তমানে উহাতে আরোপ করা হইতেছে সেই রূপ বিশিষ্ট মতবাদ) মানুষের সত্যকার প্রগতিকে খুব বেশি আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।
(পরে আমি এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিব; প্রসঙ্গটি এত ব্যাপক ও সাধারণ যে কয়েক কথায় ইহাকে সারিয়া দেওয়া যায় না।)
আপনাদের 'সামাজিক জ্যামিতির' নিয়মগুলি আমার না মানিবার দ্বিতীয় কারণ, বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতেছি রাশিয়ায় উহাদের প্রয়োগের ফলে যে শুধু নিষ্ঠুর ও শোচনীয় বহু ভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নহে, (ইউরোপ ও আমেরিকাব বুর্জোয়া গভর্ণমেণ্টগুলির সম্মিলিত শয়তানিই এ-গুলির জন্য সর্বাধিক দায়ী) দেখিতেছি এই 'অভ্রান্ত আইন' প্রয়োগ করিতে গিয়া নূতন ব্যবস্থার নেতাগণ প্রায়ই ইচ্ছা করিয়া বহু উচ্চতম মৌখিক আদর্শকে বলি দিয়াছেন; বলি দিয়াছেন মানবতাকে, স্বাধীনতাকে এবং সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ, সত্যকে। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। আজ অত্যন্ত বেদনার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে রুশ বিপ্লবের অধিকাংশ নেতার নিকটে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতাদের মতোই সব কিছুর উপরে রেজঁ দে'তা।
এক রেজঁ দে'তা-র বিরোধিতা করিয়া অপর একটির প্রতিষ্ঠার সমর্থন আমি করি না। সামরিক শাসন, পুলিসের জুলুম অথবা পশুশক্তির প্রয়োগ—মুষ্টিমেয়চালিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতিয়ার না হইয়া কমিউনিস্ট একনায়কত্বের হাতিয়ার হইয়াছে বলিয়া উহারা আমার চোখে পবিত্র হইয়া ওঠে নাই।
অত্যন্ত দুঃখের সহিত দেখিলাম আপনি লিখিয়াছেন: "হিংসার প্রয়োগ মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা একটি অস্থায়ী বিশেষ ব্যাপার।" বুর্জোয়াব্যবস্থার জাতিরক্ষা বিভাগের কোনো মন্ত্রীও ঠিক এই কথা

বলিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই ইহা মিথ্যা। মানুষের প্রকৃতি যদি একখানি পরিষ্কার শ্লেট অথবা একখানি ব্লাকবোর্ড হয়—যাহার উপর এক টুকরা খড়িমাটি দিয়া যাহা খুশি লিখিতে পারা যায় এবং খুশিমতো মুছিয়া ফেলা যায়, একমাত্র তাহা হইলেই ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু জীবন্ত জীবদেহ অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া তৈয়ারী, সামান্যতম ঘটনাও সেখানে দাগ রাখিয়া যায়; হিংসার দাগ কিছুতেই ওঠে না। এ-কথা স্বীকার করিতে হইবেই যে প্রত্যেক দেশের প্রকৃত বিপ্লবী সৈন্যদের মধ্যে 'সুবিচার ও স্বাধীনতার জন্য' যুদ্ধে গিয়াছিলেন এমন অনেক স্বাধীন-চেতা প্রাক্তন সৈনিক পাওয়া যায়। নাম এখন বদলাইয়াছে, আবার যে বদলাইবে না তাহার প্রমাণ নাই, কিন্তু মনোবৃত্তি তাহাদের আগের থেকে কম বিপজ্জনক নহে কারণ হিংসার পুরাতন অভ্যাসের উপর এক হিংসারই নূতন এক অভ্যাসকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে নূতনতর তীব্রতর হিংসার প্রতি মানুষ আসক্ত হইয়া উঠিবেই।

এই কথাটি স্মরণ করিয়াই আমি ক্লের্ঁবো-তে লিখিয়াছিলাম (এ মত আমার ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে), "উদ্দেশ্য পবিত্র হইলে যে-কোনো উপায়ই পবিত্র, এ-কথা সত্য নহে। সত্যকার প্রগতির দিক হইতে উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়েরই গুরুত্ব বেশি।..." কারণ উদ্দেশ্য (উহা প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, হইলেও অসম্পূর্ণভাবে হয়) মানুষের বাহিরের সম্পর্ককে পরিবর্তিত করে; আর উপায় ঘটায় মানুষের মনের রূপান্তর—ন্যায় অথবা হিংসার আঘাতে আঘাতে। লক্ষলাভের পথ যদি হিংসার পথ হয়, তবে কোনো গভর্নমেণ্টই দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারকে রোধ করিতে পারে না। তাই তো আমি নৈতিক সম্পদগুলিকে রক্ষা করা, বিশেষত বিপ্লবের দিনে রক্ষা করা, একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বিপ্লবের যুগ পুরানো পালক ঝাড়িয়া ফেলিবার যুগ, জাতির মনে পরিবর্তনের দাগ তাই এই সময়েই সব চেয়ে বেশি গভীর হয়।

তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কমিউনিস্ট আদর্শের সেবা আপনারা সব চেয়ে বেশি করিতে পারেন যদি কৃতকর্মের সমর্থন না করিয়া পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সহিত মন খুলিয়া আপনারা নিজেদের কার্যের সমালোচনা করেন। পার্টিতে কেবল একজন আছেন বিচারের স্বাধীনতাকে যিনি পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেন। ইনি লেনিন। কিন্তু এই প্রবল প্রাভাবশালী পুরুষ নিজেই মতান্ধতা ও ক্রেমলীন-প্রাচীরের সংকীর্ণতার (অর্থাৎ ক্ষমতার) মধ্যে বন্দী। তাহার চারিপাশে আইনের শুষ্ক লিপি ছাড়া আর কিছুই তো আমার চোখে পড়িতেছে না। কমিউনিস্টগণ, আপনারা স্বাধীন মানুষ হন। নিজের হাতে গড়া জিনিসটির সংশোধনের চেষ্টা কোনোদিন যেন আপনাদের শিথিল না হয়। ভুলকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিবার ও আদর্শকে অপপ্রয়োগের হাত হইতে রক্ষা করিবার দুঃসাহসের অভাব যেন কোনোদিন আপনাদের না হয়।

যতদিন আমি কোনো পার্টির মধ্যে সত্যের প্রতি এই অনুরাগ ও স্বাধীন সমালোচনার প্রতি সম্মান না দেখিব, যতদিন পর্যন্ত দেখিব ঐ পার্টি যে-কোনো উপায়ে, যে-কোনো মূল্যে লক্ষ লাভ করিতে চাহে, যতদিন দেখিব চিরন্তন ন্যায় ও কল্যাণের সহিত পার্টির স্বার্থের বিরোধ চলিতেছে ; অর্থাৎ এক কথায়, যতদিন বিপ্লবের সেবকগণ সংকীর্ণ এক রাজনৈতিক পরিসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বাধীন বিবেকের পবিত্র দাবীকে 'উচ্ছৃঙ্খলাবাদ' অথবা 'ভাবালুতা' বলিয়া ব্যঙ্গ ও উপেক্ষা করিতে থাকিবেন, ততদিন সংগ্রামের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোহমুক্ত হইয়া আমি দুরেই দাঁড়াইয়া থাকিব। এই দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবার অর্থ নিষ্ক্রিয় থাকা নয়। প্রত্যেকেরই কাজ আছে। আপনারা আশু বিপদ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন (এ জন্য আমি আপনাদের প্রশংসা করি)। কিন্তু আমার মনে হয়, জগতের বর্তমান আলোড়নগুলি মানুষের প্রগতি-পথের এক সুদীর্ঘ সংকটের সূচনা মাত্র ; একটা ভাঙ্গা-গড়ার যুগের ভূমিকা। মনে হয়

সম্প্রতি জাতিগুলি যত আঘাত পাইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি আঘাত তাহাদের পাইতে হইবে। এই লৌহযুগের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি; এ-যুগ চোখে আমরা দেখিব না জানি, কিন্তু আত্মিক শক্তি আমাদের একেবারে ধ্বংস হইবে না বলিয়া আশা করি। যাহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে তাহাদের জন্য যুক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসের শক্তিকে বাঁচাইতে ও সংহত করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে এই লইয়া তাহারা ঝড় কাটাইয়া উঠিতে পারে। আর সেদিন ক্ষণিকের কথা সমাপ্ত করিয়া আপনাদের কমিউনিস্ট বিশ্বাস ধ্বসিয়া পড়িবে (এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ক্ষমা করিবেন) সংগ্রামকালীন অন্যায় অবিচারের পাপের গুরুভারে, ধ্বসিয়া পড়িবে সেই ঔদাসীন্যের আঘাতে যে-ঔদাসীন্য একান্ত-ভাবে রাজনৈতিক জয়লাভের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

আমাকে ভুল বুঝিবেন না, বারব্যুস। আমি আপনার সদৃশ, আপনার আন্তরিকতা, আপনার সর্বব্যাপী আদর্শনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের দুজনের কর্মধারা পরস্পরবিরোধী নহে, পরস্পরের পরিপূরক। একই বিপ্লবের ধারাস্রোতে, মানুষের নবজাগরণের ও চিররূপান্তরণের একই তরঙ্গপ্রবাহে আমরা দুইজনেই ভাসিয়া চলিয়াছি। যে আলোর রশ্মি মাটি হইতে আকাশে উঠিতেছে তাহার পানে চাহিয়া আছি দুইজনেই; যে-মৃত্যুর বেষ্টনী মানুষের জয়যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, আমরা দুজনেই তাহা ভাঙ্গিতে চাহিতেছি। কিন্তু পুরাতন শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া সেখানে নূতন কঠিন শৃঙ্খল পরাইতে আমি চাহি না।

অতীতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি আপনার ও বিপ্লবীদের সাথে আছি। ভবিষ্যতের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমি ভবিষ্যতের অত্যাচারিতদের সঙ্গে থাকিব।

ইন তিরানব (সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে)—শীলারের এই বাণী চিরদিনই আমার ধ্রুবতারা।

(আমি এখানে একটি পরিশিষ্ট যোগ করিতে চাহি। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে জনৈক রুশ-বিপ্লবীকে লিখিত একখানি পত্র হইতে ইহা উদ্ধৃত। পত্রখানিতে আমি বিপ্লবের সময় 'নৈতিক সম্পদগুলিকে' রক্ষা করিবার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি।)

"নৈতিক সম্পদগুলিকে সর্বদা রক্ষা করিতেই হইবে ; রক্ষা করিতে হইবে মানবতার স্বার্থে ও বিপ্লবের নিজের স্বার্থে। কারণ, ইহাদের যে-বিপ্লব উপেক্ষা করে—আজ হোক কাল হোক, পরাজয় তাহার ঘটিবেই। এ পরাজয় শুধু ঐহিক পরাজয় নহে, ইহার সঙ্গে আসিবে নৈতিক অধঃপতন। কারণ, 'যে কোনো উপায়ের' অর্থই—সব চেয়ে বড় অস্ত্র, নৈতিক অস্ত্র খোয়ানো। আর যদি এ-বিপ্লব পরাজিত হয়, তবে যে সে শুধু যুদ্ধেই হারিবে তাহা নহে, তাহার সর্বস্ব যাইবে। 'চারিত্রিক গুণের উপর গণতন্ত্রের ভিত্তি'—মঁতেকিও-র এই বাণী যে কত গভীর তাহা প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। সত্য ও মানুষের বিবেকের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাই ইহার ভিত্তি। এই ভিত্তি শিথিল হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। কারণ, যদি পশুশক্তি, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাই গণতন্ত্রের ভিত্তি হইত, তবে ঐ তিনের প্রশস্ততর প্রয়োগক্ষেত্র তো রহিত অন্য শাসনব্যবস্থার মধ্যে। এই তিন পাপকে যদি বিপ্লব কাজে লাগাইতে চাহে, তবে ইহারা তিনে মিলিয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবেই। তারপর যখন চরম আঘাত আসিবে, বিপ্লব দেখিবে তাহার আত্মদানের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে ; আর আত্মদান ছাড়া তো বিপ্লব বাঁচিতে পারে না।...

আঁরি বারব্যুসের নিকট দ্বিতীয় পত্র

পারি, ২ ফেব্রুয়ারী

প্রিয় বারব্যুস্,

আপনার পূর্ব প্রবন্ধে যে সংযম দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম এবারকার পত্রে তাহার কিছু অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। বিতর্ক-কালে যাহার সহিত মতবিরোধ হয়, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া দেখা বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতি অতিমাত্রায় আইনব্যবসা-সুলভ। মজুরশ্রেণীর নামে যে-সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, সেইগুলির সুযোগ লইবার চেষ্টা আমরা করিতেছি না। এই ধরনের কুসংস্কার জাতীয় কুসংস্কার অপেক্ষা কম নহে। বারব্যুস্, আজ আমরা যে-দুইজন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছি তাহারা এমন দুইজন কর্মী যাহারা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহারা বিপুল দুঃখ-দুর্দশার মূল্য দিয়া নিজেদের স্বাধীনতাকে ক্রয় করিয়াছে, যাহাদের দুইজনই সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। আমাদের কেহই ইহা অপেক্ষা কমও নহে, বেশিও নহে।

আপনাদের চিন্তাধারার সহিত যাহাদেরই মিল হইবে না, তাহারাই যে বিপ্লবের বাহিরে রহিয়াছে, এইরূপ নির্দেশ দিবার কি অধিকার আপনার আছে? বিপ্লব কোনো দলবিশেষের সম্পত্তি নহে। যে কেহ বৃহত্তর মহত্তর মানবোত্তর স্বপ্ন দেখিবে, বিপ্লবের প্রাসাদে তাহারই স্থান রহিয়াছে। আমারও তো তাই সেখানে স্থান রহিয়াছে। আমি শুধু সেখানে উপদলীয় আবহাওয়ায় বাস করিতে অনিচ্ছুক। অথচ এই আবহাওয়ার ভিতরেই বুর্জোয়াশ্রেণী ও কমিউনিস্টগণ আমাদের টানিতে চাহিতেছে। তাই আমি বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছি। নিশ্বাস লইবার

জন্য প্রয়োজন হইলে আমি কাচের জানালা পর্যন্ত ভাঙ্গিতে প্রস্তুত। কারণ, আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাহারা বিপ্লবের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দাবী করেন। অসঙ্গত মনে হইলেও, এই দাবী করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

প্রথম পত্রের মতো এই পত্রে আমার নিজের কথা আর লিখিব না। কারণ এই বিতর্ক আরম্ভ হইবার পর আপনার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ রলাঁবাদীদের মধ্য হইতে আমার আদর্শকে পৃথক করিয়া দেখিতে শুরু করিয়াছেন।

"রলাঁর রলাঁবাদে আপত্তি করিব না। কিন্তু রলাঁবাদীদের পক্ষে রলাঁবাদ সহ্য করা হইবে না।" এই বিশেষ সুবিধা আমি গ্রহণ করিতে চাহি না। প্রথমত, অতীতে যে-সকল অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছে সেইগুলি স্মরণ করিয়া এই বিশেষ সুবিধা আমাকে দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে আরো অনেকেই আমার মতো অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, নিজেদের সমস্ত ভবিষ্যতকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শের পায়ে সঁপিয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই এবং আজও তাহারা কৃতকর্মের ফলভোগ হাসি মুখে করিতেছেন। কিন্তু আজ আর বিশেষ সুবিধাভোগের প্রশ্ন নহে। আজিকার প্রশ্ন অধিকারের প্রশ্ন—চিন্তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ ও সম্পূর্ণ রাখিবার অধিকারের প্রশ্ন। এই অধিকার কোনো ব্যক্তিবিশেষের অধিকার নহে—সর্বসাধারণের অধিকার।

চিন্তাজীবীদের পক্ষে এই অধিকার শুধু অধিকার নহে, কর্তব্যও বটে। কারণ, যে-মতবাদ সহজ পথে বিপদ এড়াইয়া চলে তাহার কি মূল্য আছে? পার্টির মতবাদ, চার্চের মতবাদ, বিশেষ জাতের মতবাদ—নির্যাতনের বিভিন্ন উপকরণ। এই সকল আমরা খুব ভালোভাবেই চিনি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষের মত এই বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। এক এক করিয়া তাহারা থামিয়া পড়িতেছে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও রাজতন্ত্রের বাঁধন খসিয়া পড়িয়াছে। আধুনিক ধর্মসংস্রবহীন গণতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বন্ধন, প্রাচীনতন্ত্র অথবা বিপ্লবের—কালো, সাদা, লাল—সব বিপ্লবের বন্ধন আমরা ছিঁড়িতে চাহি। বন্ধনছেদনই আমাদের প্রথম কাজ। বারব্যুস, আপনি কাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন—কাজ, যে কোনো উপায়ে কাজ। মানুষকে তাহার বর্তমান দুর্গতি হইতে এবং ভবিষ্যতের আরো সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা আপনি লিখিয়াছেন। আপনার এই মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা করি: ঈশ্বর করুন, এই মনোভাব সম্পর্কে নিরুৎসাহকর কিছু যেন কোনোদিন না বলি।

আমি নিজে কিন্তু অনুভব করিতেছি অন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন—কল্পনার চোখে বাস্তবকে আমাদের মনের মতো করিয়া না দেখিয়া, জাগ্রত চোখে বাস্তবের প্রকৃত নগ্ন রূপকে চিনিতে পারা। পরিকল্পনা চমৎকার, যুক্তির বন্ধন কোথাও এতটুকু শিথিল নহে। কিন্তু এ শুধু কাগজের পরিকল্পনা,—বাস্তবের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। যাহাদের জন্য এই পরিকল্পনা কোথায় তাহারা? বারব্যুস, আপনি তো জানেন, ফ্রান্সের অগ্রণী নেতাগণের দিকে চাহিলে আশায় বুক ভরিয়া ওঠে না। আর জনগণ? তাহাদের ঘিরিয়া আছে একটি বিরাট উদাসীন আত্মম্ভরিতা; আর তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে হিংস্র নির্যাতিত এমন শক্তি যাহা সৃষ্টির কাজে লাগিতে চাহে না, ধ্বংস করিয়া ধ্বংস হইতে চায়। নিজেকে প্রতারিত করিবার শক্তি লইয়া আমি জন্মাই নাই; নিজেকে এ-কথা আমি বলিতে পারি না: "তুমি শুধু ইচ্ছা কর, তাহা হইলেই জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।" কারণ, আমি জানি, জগৎ আজ পরিবর্তিত হইতে চাহে না।

পশ্চিম ইউরোপ যেন এক প্রকাণ্ড আহত পশু। সে তাহার ক্ষতস্থানগুলি চাটিতেছে, কিন্তু থামিতেছে না। নূতন ক্ষতের মধ্য দিয়া কি সে তাহার হারানো শক্তি ফিরিয়া পাইতে চাহে? কিন্তু আমার তো ভয় হয়, যেটুকু রক্ত এখনও তাহার শরীরে অবশিষ্ট আছে, নূতন ক্ষত হইলে তাহাও থাকিবে না। বিরাট বিপ্লবের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিপুল শক্তি আছে তাহা আমি জানি এবং জানি বলিয়াই যে-সকল জাতি অবসাদে অসাড় ও প্রচণ্ড আলোড়নের সম্মুখীন, বিপ্লবের মধ্যে তাহাদের বাঁচিবার কোনো পথ আমি দেখি না। আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতারা আজ এই ভীষণ মনস্তাত্ত্বিক ভুলই করিতেছেন। জয়লাভ করিতে হইলে বিপ্লবকে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের জন্য প্রচণ্ড শক্তি; ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে জাতির বলদৃপ্ত স্বাস্থ্য ও হর্ষোজ্জ্বল আশার ঐশ্বর্যে। আজ ইউরোপের জাতিগুলি বিদীর্ণ রক্তাক্ত দেহ কতকগুলি নেকড়ের মতো বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; উহাদের কেহ কেহ মরিতে বসিয়াছে। ইহাদের নিকটে বিপ্লবের উপযোগী শক্তি স্বাস্থ্য ও আশা তো আমি প্রত্যাশা করিতে পারি না।

আপনি আমার বিরুদ্ধে নৈরাশ্যবাদের অভিযোগ আনিয়াছেন। কিন্তু গ্যুস্তাভ দ্যুপঁ্যা-র কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলি, নৈরাশ্যবাদ যদি বাস্তবের মুখের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারে তাহারও কিছু মূল্য আছে। কিন্তু যে-আশাবাদ মুখ ও মুখের উপরের তিক্ত বেদনার অশ্রুকে ঢাকিয়া রাখে তাহা সত্যই বিপজ্জনক। (হে আমার বিপ্লবী বন্ধু, যতোই তুমি তোমার দৃঢ় বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করিয়া তোলো, আমি যে তোমার চোখে অশ্রু দেখিতে পাইয়াছি)।

না, বারবুস, আমি নৈরাশ্যবাদী নই। কারণ, বর্তমানের অথবা আশু-ভবিষ্যতের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমি আমার মনকে আবদ্ধ রাখি নাই।

ইতিহাসের কল্যাণে, বৃহত্তর, ব্যাপকতর বিস্তৃতিকে আমি আমার দৃষ্টির সীমানায় আনিতে শিখিয়াছি। আমি জানি পারি একদিনে তৈয়ারী হয় নাই; আমি জানি মানুষের ঐক্য এক শতাব্দীতে আসিবে না; কিন্তু সে জন্য এ-ঐক্যে আমার বিশ্বাস এতটুকু কম নহে। এমন কি, এ-বিশ্বাস আমার বাড়িয়াছে, কারণ, সাময়িক ব্যর্থতায় আমার এ-বিশ্বাস তো টলাইতে পারে নাই। আমি আমার আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অবিশ্রাম কাজ করিয়া যাইতেছি; হতাশার অন্ধকার একদিনের জন্যও আমার জীবনে আসে নাই।

আমি কি কাজের নির্দেশ দিই সেই প্রশ্ন লইয়া এইখানেই আপনি আমার জন্য ওত পাতিয়া বসিয়া আছেন।

বারব্যুস, মানুষের সমাজে বর্তমানে যে হিংস্র নিপীড়ন প্রচলিত রহিয়াছে তাহা আমাদের উভয়েরই শত্রু। কিন্তু সেই হিংসার বিরুদ্ধে এক বিপরীত হিংসাকে আপনারা অস্ত্র-সজ্জিত করিতেছেন। আমার মনে হয়, এই নীতির ফলে উভয়পক্ষই ধ্বংস হইয়া যাইবে। শত্রুর পথ লইয়াই যদি আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তবে জার্মান ও ফরাসীদের যুদ্ধের মতোই এই সামাজিক যুদ্ধের অবসান হইবে আর এক ভের্সাইয়ে-র সন্ধিতে। কিন্তু ধ্বংস হইয়া যাইব আমরা সকলেই।

ধরিয়া লইলাম আমারই ভুল হইতেছে। তথাপি হিংসার অস্ত্র ছাড়া অন্য অস্ত্র প্রয়োগের দাবীও তো আমি করিতে পারি।

প্রথম অস্ত্রের বিষয় আমি বিশদভাবে কিছু বলিব না। কারণ, ইহা আপনার আমার মতো বুদ্ধিজীবীদেরই বিশেষ অস্ত্র। অপরের কর্তব্যের কথা ভাবিবার পূর্বে মসিব্যবসায়ী আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন প্রথম শুরু করিতে হইবে। যুক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইবে। ক্ষমতাধিষ্ঠিত শক্তির পক্ষে কাজটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া,

বিচার করিয়া—সেই সম্পর্কে নির্দেশবাণী ঘোষণা করিতে হইবে। ইউনিয়ন অব ডেমক্রেটিক কন্‌ট্রোল-এর আমাদের বীর বন্ধুগণ এই আত্মিক সংগ্রামই চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখানেই আমাদের থামিলে চলিবে না। ভল্‌তেয়র ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের হানিতে হইবে নিত্যই বিদ্রূপ, নিষ্ঠুর আঘাত ও তীব্র, তীক্ষ্ণ সমালোচনার শক্তি-শেল। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন তপ্তমস্তিষ্ক বিপ্লবী বাস্তিল দখল করিয়াছিল, রাজতন্ত্র পতনের জন্য তাহাদের চাইতে বেশি দায়ী ভল্‌তেয়র ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টগণ।

কিন্তু আরো শক্তিশালী অস্ত্রের সন্ধান আমি দিতে পারি। শুধু শক্তিশালী নহে—কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ সকলেই ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। অপর জাতি ইতিমধ্যেই ইহার উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত ফ্রান্সের কেহই এই অস্ত্রের কথা উল্লেখ করে নাই। এ্যাংলো-স্যাক্‌সনদের মধ্যে হাজার হাজার "বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধ বিরোধিগণ" এই অস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, এই মহাস্ত্র দিয়াই গান্ধী আজ ভারতবর্ষে ব্রটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিতেছেন। গান্ধীর অস্ত্র—আইন অমান্য আন্দোলন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা আমি বলিতেছি না; কারণ, এই প্রতিরোধের চাইতে আব বড় প্রতিরোধ হয় না। পাপাসক্ত রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা অস্বীকারের মতো এত বড় বীরত্বের সংগ্রাম আধুনিককালে কেহ আর করে নাই। এই সংগ্রামে আপনাকে একাকী নিঃসঙ্গ দাঁড়াইতে হইবে বিশাল রাষ্ট্রের মুখোমুখি; অত্যন্ত সহজে, বিনা দ্বিধায় সেই রাষ্ট্র আপনাকে কারান্তরালে পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারে। এই সংগ্রামে প্রয়োজন হইবে এমন শক্তি ও আত্মত্যাগের, এমন প্রেরণার, যাহা সকলের সাথে একসঙ্গে মৃত্যুবরণের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী। এই নৈতিক শক্তির উৎস মানুষের হৃদয়—প্রত্যেক একক মানুষের। এই শক্তির উৎস সেই বিবেকের আগুন ও সেই সর্ব জীবে

সংস্থিত ব্রহ্মশক্তির ঐশী অনুভূতি, যাহা ইতিহাসের চরম মুহূর্তে বৃহৎ জাতিগুলিকে মলিন মাটির বন্ধন হইতে তারকালোকের ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছে। কিন্তু এই জিনিসটি "আপনারা যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া দেখেন না।" (এই কথাগুলি আমি ব্যবহার করিতেছি কিছুটা বিদ্বেষের ভাব লইয়া ; বিশ্বাস করুন বন্ধুভাবে ইহা করিতেছি ; এই বিদ্বেষের সুর প্রথমে আপনার লেখাতেই পাই, আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, আমাদের অন্তরের বিশ্বাসের প্রতি আপনাদের এই শ্রদ্ধার অভাব আমাকে এবং আমার অনেক সহকর্মীকে কতখানি আঘাত করিতে পারে।) সম্মিলিত শক্তির মোহ আপনাদের অতিরিক্ত মাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ; যদিও এই শক্তির ভীষণ আকর্ষণ সম্পর্কে আপনাদের কারো অপেক্ষা আমি কম সচেতন নহি। এইজন্যই সম্ভবত ব্যক্তিগত বিবেকের যথাযোগ্য মূল্য আপনারা দিতে চাহেন না, এবং মানিতে চাহেন না যে একান্তভাবে আত্মগত ব্যক্তিমানুষের মুক্ত দীপ্ত বিবেকই জগতের ভার ধারণ করিয়া আছে। এই বিবেকের শক্তির স্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলেন আপনাদের মধ্যে একজন—ইনি আপনার ও আমার উভয়েরই বন্ধু হতভাগ্য রেইম-লেফেব্‌র্। বিপ্লবের বীর নায়কগণকে কেন্দ্র করিয়া ইনি এক ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী উপাসনাপদ্ধতি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু একদিনে উহা হয় না। মানুষের মধ্যে গভীর পরিবর্তন আনিতে হইলে দুইটি মহান শক্তির আবশ্যক। প্রথমটি সম্পর্কে আমাদের মতভেদ নাই—ইহা আত্মদান। এবং এই আত্মদানের মধ্য দিয়াই একক মানুষের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, পরিবর্তনের একটা রূপরেখা অঙ্কন সম্ভব হয়। পরিবর্তনের দ্বিতীয় শক্তি, সময়। বহু পুরুষের রক্ত ও যন্ত্রণা দিয়া মহাশিল্পী কাল মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনেন। কত পুরুষ ধরিয়া কত উজ্জ্বল, কত অজ্ঞাত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই না রোমের ভগ্নাবশেষের উপর নূতন খ্রীস্টান জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে,

যে-বিপ্লবের লক্ষ কর্মী মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা, সেই বিপ্লব সুসম্পন্ন হইতে আরো কম সময় লাগিবে ?

বন্ধুগণ, আপনাদের চেয়ে আমার বয়স বেশি বলিয়াই যেন আমার কথাগুলি আগ্রহ্য না করেন। আমার অনুরোধ নিকট ভবিষ্যতের কীর্তিকে আপনারা এত বড় করিয়া দেখিবেন না। এই কীর্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা যেন একটি দিনও নষ্ট হইতে না পারে তজ্জন্য উৎকণ্ঠা আমার চেয়ে আপনাদের বেশি নহে। আমার সহকর্মিগণকে আমি যে-মনোভাব গ্রহণ করিতে বলি তাহা নিরাসক্তি ও বৈরাগ্যের মনোভাব নহে। ঠিক বিপরীত কথাই আমি বলি: "কখনও ঘুমাইয়া পড়িও না। কখনও আপোস করিও না। মিথ্যা ও অবিচারের সহিত কখনও রফা করিয়া ফেলিও না। এক এক করিয়া পুরানো দেবতাগুলিকে নিজ হাতে সরাইয়া দাও যাহাতে নূতন দেবতারা (ইহাদের মধ্যে মানবতাও রহিয়াছে) আসন গ্রহণ করিতে পারেন।" সাহস থাকে তো নিজেকে বলি দিন। স্বার্থত্যাগের সাহস কি আপনার আছে? যদি থাকে তবে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হোন। আপনার দুঃখ যন্ত্রণা বৃথা হইবে না, এ-কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আগামী কয়েক শতাব্দীর জন্য আপনাকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে! লক্ষের নিকটবর্তী হইতেছেন না বলিয়া কোনো অভিযোগ করা চলিবে না। আপনার জীবনী শেষ হইবার পরও অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যে-কাজ চলিতে থাকিবে সেই কাজের একটা অংশ গ্রহণ করিয়া আপনি আনন্দ লাভ করুন। জীবিতকালে অমরত্ব লাভের ইহাই একমাত্র উপায়! ······বারব্যুস, আপনি যখন বলেন "ফ্রান্স আজ মরিতেছে—ও ইউরোপ বিপন্ন" আপনার কথায় আমার মন সাড়া দিয়া ওঠে। ফ্রান্স ও ইউরোপকে আপনি বাঁচান (আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তির নির্মম কণ্ঠস্বরও আমার কানে আসে: "ইউরোপ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; ন্যায়ধর্ম আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেই।") মানুষ নিয়তির

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে তাহার শেষ সম্বলটুকু খোয়াইয়া। অতএব বারবুস, থামিবেন না, আপনি যুদ্ধ করিয়া যান। যাহা আমরা ন্যায় বলিয়া বুঝিব তাহার স্বপক্ষে ও যাহা অন্যায় বলিয়া জানিব তাহার বিরুদ্ধে, মুক্ত মানুষের মতো আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে।

আপনার বিশ্বাসকে, আপনার সাহসকে, আপনার শৌর্যকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনারা যাহা কিছু বিশ্বাস করেন তাহাই বিশ্বাস করিতে আমাদের বাধ্য করিবেন না; আপনারা যে-সকল কাজ করেন, সবকিছুই আমাদের দিয়া করাইতে চাহিবেন না। এই জোর করিয়া আদায় শুধু যে আমাদের কাছে অসহ্য হইবে তাহা নহে, একই লক্ষের অনুগামী প্রত্যেকের উপর একই কর্তব্য চাপাইয়া দিয়া আপনারা এক গুরুতর রাজনৈতিক ভুল করিবেন।

আর শেষ পর্যন্ত দেখিতে গেলে ইউরোপ ও ভবিষ্যতকে রক্ষা করিবার আজও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। সকলেই যদি যুদ্ধ করে তবে শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করিবে কাহারা? যে-সকল নূতন সামাজিক অন্ধবিশ্বাসের আজ আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের প্রভাবে সত্য ও সুন্দরের আদর্শকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া দূরে থাকুক, উহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করিয়া শিল্পী ও পণ্ডিতগণ যদি তাহাদের গবেষণা কার্য চালাইয়া না যাইতেন তবে আপনাদের বিপ্লবের গর্ভ হইতে যে-জগতের জন্ম হইতেছে সে-জগৎ কোন রূপ পরিগ্রহ করিত?

বারবুস, বিশ্বাস বেদনা ও সাময়িক সাফল্যের মধ্যে আজ যে মানুষকে দেখিতেছি, সে তো মানুষের ক্ষণিকের খণ্ডিত রূপ ঃ সে তো নিত্যকালের মানুষ নহে। আমার যে-সকল লেখকবন্ধু, বিশেষ করিয়া আপনি, যাহারা চিন্তাক্ষেত্রের অগ্রগামী সেনাবাহিনী বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন, তাহাদের উদ্দেশে আমি এই কয়টি কথা বলিতে চাই ঃ

আপনারা কি মনে করেন, ১৯১৪ সালের মতো ন্যায়ধর্মের সেনাবাহিনীতে

এবং ১৯২২ সালের মতো সেনাবাহিনীতে যোগদান করা শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাজীবীদের বর্তমান কর্তব্য? আপনাদের কি মনে হয় না মানবতার, এমন কি, বিপ্লবের আদর্শের সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা স্বাধীন চিন্তার অখণ্ড স্বাধীনতাকে রক্ষা করা? আপনারা কি মনে করেন না যে, বিপ্লব যদি ব্যক্তিস্বাধীনতার গভীর প্রয়োজনকে স্বীকার করিতে না চাহে তবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও ঐ স্বাধীনতা রক্ষা করা তাহাদের উচিত? কারণ এই প্রয়োজনকে বিপ্লব যদি স্বীকার করিতে না চাহে তবে বুঝিতে হইবে যে, নবজীবনের উৎসধারা তাহার শুকাইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে প্রতিক্রিয়ার সহস্র-মুখ দানব এক নূতন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে।

রম্যাঁ রলাঁ

পুনশ্চ।—আপনার 'সামাজিক জ্যামিতি' সম্বন্ধে আরো দু-একটা কথা বলিব; আমার 'হাসি'তে আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। সে-হাসির মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। আমি জানি, আপনার মতো এতবড় একজন শিল্পীকে কোনো বিশেষ নিয়ম-সূত্রের সংকীর্ণ নিগড় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। যে নিয়মসূত্র আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, আমি শুধু তাহারই বিপদ সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। নূতনভাবে যে ব্যাখ্যার আপনি আবার অবতারণা করিয়াছেন, বিপদের সম্ভাবনা তাহাতে বিশেষ কমে নাই।

আপনি লিখিয়াছেন: "অবাস্তব অনুমানগুলি যে ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল সে-কথা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদের বাহিরে অভিব্যক্তিসমূহের মধ্যে যে শাশ্বত সম্পর্কগুলি বিজ্ঞান স্থাপন করে তাহা ভঙ্গুরও নহে এবং সহজে পরিবর্তিত হইবার জিনিসও নহে।" আপনার এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের অনুভূতিগুলির কল্যাণে এই বাহিরের সম্পর্কগুলিকেই আমরা

জানি, ইহাদেরই আমরা বলি ঘটনা। কারণ, বিশেষ কোনো একটি অখণ্ড বস্তুর ও তুলনার বিশেষ এক ভিত্তিকেই মাপকাঠি না করিয়া আমরা কিছু বিচার করিতে পারি না ও দেখিতে পারি না। এই অখণ্ড বস্তু ও তুলনার ভিত্তির রূপটি আমরা কোন স্তর হইতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছি তাহার উপরেই নির্ভর করে। তাই বিজ্ঞান শুধু বাস্তব ঘটনারই সন্ধান রাখে এবং বিশেষ এক স্তরে জ্ঞানই সত্য।

কিন্তু আপনি বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিতে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর সত্যতা আরোপ করিতেছেন। দুইটি পৃথক জিনিসকে আপনি এক করিয়া ফেলিতেছেন। যদি ঘটনা হইতে নিয়ম বাহির করা হয়, তবে তাহার অর্থ কতকগুলি মৌখিক অবাস্তব অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত একটি বাস্তব-সংযোগহীন কাঠামোকে কতকগুলি ঘটনার উপর চাপাইয়া দেওয়া, বস্তুত কোনো একটি নিয়ম স্থাপন করিবার অর্থ কতকগুলি বিশেষ ঘটনাসমষ্টি হইতে কতকগুলি বিশেষ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, যাহাতে বাকী সম্পর্কগুলিই শুধু গণনার মধ্যে আসিতে পারে। এই ছাঁটাই স্বেচ্ছাকৃত হইলেও অন্যায় নয় এবং বাস্তব জগতের সংযোগে আমাদের মস্তিষ্কই এই কার্য সমাধা করে।

অতএব এ-কথা বলা চলে না যে "স্থিতি, কাল ও বস্তুর মূল প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ যাহাই হউক না কেন পদার্থবিষয়ক বা রাসায়নিক নিয়মের বাস্তবতা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।" আইনস্টাইনের মতবাদের ফলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও পদার্থের তেজোশক্তির সমস্ত নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। আপনি কি বলিতে চান এই পরিবর্তন বাস্তবতাকে স্পর্শ করে নাই? নিয়মের বাস্তবতার অর্থ কী? প্রকৃতিতে কোনো নিয়ম নাই—সে শুধু আমাদের মধ্যেকার বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কের নির্দেশ দেয় মাত্র। আর আমরা, শুধু আমরাই, নিয়মের জন্ম দিই। আপনি যদি মনে করেন প্রকৃতির পুঁথির মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বাস্তব অস্তিত্ব

রহিয়াছে, তবে হে বারবুস, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি একজন অতীন্দ্রিয়বাদী হইয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু ইহাই সবচেয়ে গুরুতর বিষয় নহে। একমাত্র যাহা লইয়া আলোচনা করিলাম আপনার প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গেরই অব্যবহিত পরে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়া আপনি আপনার যুক্তি শেষ করিয়াছেন।

"ইহার অতিরিক্ত আমি কিছুই বলি নাই, এবং এইটুকুই আমি আবার বলিতেছি। এবং শুধু তাহাই নহে, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে যে ঐক্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা, সে ধারণাও আমার অটুট রহিল।"

এখানে আপনি এক পদবিক্ষেপে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইতে ফলিত বিজ্ঞানে যাইতেছেন এবং অতিরিক্ত বিশ্বাসের বশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে আপনি যে সত্য আরোপ করিয়াছেন সেই সত্যকেই ফলিত বিজ্ঞানে আরোপ করিতেছেন। ধরা যাক পদার্থজগতের (সবচেয়ে নিখুঁত) নিয়মগুলি বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়া যায়। উহাদের একটিকে যখন আমরা প্রয়োগ করি তখন আমাদের প্রয়োগক্ষেত্রে ঐ নিয়মের বহির্ভূত সর্বপ্রকারের ঘটনা ও আন্দোলনকে আমরা নগণ্য বিবেচনা করি।

অতএব আর একবার আমরা বাস্তবতা-সংযোগহীন একটি নিয়মকে গ্রহণ করি। এই গ্রহণ যুক্তিহীন নহে, কিন্তু ঐ নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ অবস্থায় উহাতে কিছু ভুল থাকিয়া যাইবেই (পরীক্ষাকালীন ভুলের কথা ছাড়িয়াই দিলাম)।

অতএব যখন হঠাৎ দ্বিতীয়বার আর এক লাফে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা হইতে সমাজবিজ্ঞানে গিয়া উপস্থিত হই, তখন আর কি বলিব। জীবন্ত প্রাণীকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার উপর পদার্থশাস্ত্র ও রসায়নের নিয়মগুলি প্রয়োগ করাই যখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার তখন জীবন্ত প্রাণীদের উপনিবেশগুলির উপর কেমন করিয়া ইহাদের প্রয়োগ

চলিতে পারে? মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সেখানে যে-বিরাট ভূমিকার অভিনয় করে তাহার স্বরূপ আজও আমরা জানিতে পারি নাই। পৌনঃপুনিকতার নিয়মগুলি (Laws of Frequency) অর্থাৎ মোটামুটি যতটা সম্ভব ভুল সংশোধন ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আর কিছু করিতে পারি না।

আর সম্ভাবনার নিয়মাবলী ছাড়া (Calculas of Probability) অন্য কোনো গাণিতিক নিয়ম আমরা বর্তমানে সামাজিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারি না।

"সামাজিক জ্যামিতি" হইতে আমরা এখনও বহু দূরে রহিয়াছি।

প্রিয় বারব্যুস, আমার ধারণা এক অটল বিশ্বাস আপনার জীবনের মূল ভিত্তি। আমার মুখ-নিঃসৃত এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সমালোচনা নহে। আমারও জীবনের ভিত্তি এক অটল বিশ্বাস। ভালোর জন্য হউক, কি মন্দের জন্য হউক, জানি না, আমার দেবতা ও আপনার দেবতা আজ গণতন্ত্রের রথের চাকায় বাঁধা। আপনার দেবতা সাম্য, আমার দেবতা স্বাধীনতা। রাসিনের সেই বৃদ্ধের মতো আমিও বলি: "এ-দুই দেবতাই শক্তিমান।" কিন্তু সবসময় তাহারা মনের মিল রাখিয়া চলে না। আসুন তাহাদের মধ্যে আমরা সঙ্গতি স্থাপন করি। আর আমার আপনার দেবতার মধ্যে যদি বিরোধের অবসান নাও হয়, তবু আসুন আমরা করমর্দন করি।

আর. আর

বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবিগণ

কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধুকে লিখিত পত্র

পারি, মার্চ, ১৯২২

ক্লার্তের শেষ সংখ্যায় বারব্যুস্ আমার দ্বিতীয় পত্রের জবাব দিয়াছেন। আমার পত্র লা'র লিব্‌র্-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রে বারব্যুস্ কোনো নূতন যুক্তির অবতারণা করেন নাই বলিয়া আমি তাহার কোনো জবাব দিই নাই। কারণ, উভয় পক্ষই যখন নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল তখন অনন্তকাল এই বিতর্ক চালাইয়া যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। মস্তিষ্কের এই সৌজন্যপূর্ণ সংগ্রাম বন্ধ করিয়া আজ আমি বারব্যুসের প্রতি সহকর্মীর সহানুভূতি জানাইতেছি। আমার দিক হইতে বলিতে পারি, মতবিরোধ সত্ত্বেও আমাদের বিতর্ক জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; আর এ মতবিরোধকে মুছিয়া ফেলা যাইবে না।

এখানে যাহা লিখিতেছি তাহা বারব্যুস্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা নহে। ইহা আমাদের কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধুকে লেখা। লা'র লিব্‌র্ কর্তৃক পরিচালিত বিতর্কে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই বন্ধুগণ তিক্ত ও রুক্ষ বিদ্রূপের সুরে তাহাদের নিজেদের কাগজে এই বিতর্কের জবাব দিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে একজন আমার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সহকর্মী।

পত্রিকার ২৫শে মার্চ সংখ্যায় 'বুদ্ধিজীবিগণ ও বিপ্লব' নামক প্রথম প্রবন্ধে তিনি এই বিতর্ক সূত্রপাত হইতে দেখিয়া তাহার নিকট আমি যে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে স্মরণ রাখা ভালো ক্লার্তে-র (৩রা ডিসেম্বর ১৯২১ সাল) একটি

প্রবন্ধ হইতে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। আমার তখনই মনে হইয়াছিল মুক্তচেতা ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের ও বিপ্লবী সাম্যবাদের মধ্যকার যে বিভেদ একদিন গোপন ছিল, এই বিতর্কের অনিবার্য ফলস্বরূপ তাহা এবার প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিবেই। আমাদের সাম্যবাদী বন্ধুটি এই বিভেদ স্বীকার করেন; তথাপি যে সকল স্বাধীনচেতা চিন্তাজীবী কমিউনিস্ট মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় ও মুক্তকণ্ঠে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে তিনি আজ লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাহার লেখার মধ্যে বিদ্বেষ ও আঘাত হানিবার মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট।
তাহার সম্পর্কে ঠিক এই মনোবৃত্তির ভয়ই আমি করিতেছিলাম। যখন দেখি অন্তরঙ্গ বন্ধুরা,বহু-দুর্দিনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সঙ্গীরা ও শ্রদ্ধাস্পদ লেখকেরা কোনো এক বিশেষ স্থানে আসিয়া তাহাদের মত ও পথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বন্ধুত্বের কল্যাণকামনা লইয়া আমাকে কি করিতে হইবে? আমাকে সন্ধান করিতে হইবে বন্ধুদের নূতন অভিযানের পশ্চাতে কোন কোন গুরুতর কারণ রহিয়াছে; এবং সন্ধান করিয়া যদি দেখি সে কারণগুলি ভুল তথাপি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের মতের মধ্যে এমন কোনো সত্যের অংশ আছে কিনা যাহা গণনার মধ্যে গ্রহণ করিলে কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদিগণ ঠিক বিপরীত পথ গ্রহণ করিলেন। আমাদের পক্ষে এই বিতর্কের যে কতখানি মর্মান্তিক গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা আমাদের উপর অভিসন্ধি আরোপ করিলেন।
কমিউনিস্ট বন্ধুগণ, আপনাদের বিপ্লবের সহিত আমাদের বিচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া আমরা খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া কি আপনারা মনে করেন? আপনাদের বিপ্লব বলিতেছি কারণ সত্যকার বিপ্লব হইতে কোনো স্বাধীনচেতা মানুষই বিচ্ছিন্ন নহেন, সেখানে

প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে বাঁচিবার সুযোগ রহিয়াছে। যে-বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব আপনারা করিতেছেন যদিও তাহার উপর অনেক ভরসা রাখি তথাপি বড় বেদনার সহিত তাহা হইতে আমাদের বিচ্ছেদকে স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু এত কথা কেন আপনারা আমাদের বলিতে বাধ্য করিতেছেন? প্রথম আঘাত তো আমরা হানি নাই, আমরা আহত হইয়াছি। আপনাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা চিন্তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতেছি মাত্র। আমরা চিন্তাজীবীরা এই প্রতি আক্রমণ না করিয়া যদি কোনো রাজনৈতিক দলের পায়ে চিন্তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতাম তবে আত্মধিক্কারে আমরা আর মাথা তুলিতে পারিতাম না।

আমাদের বলা হইয়াছে, চিন্তার স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে চিন্তার স্বাধীনতার পরিপন্থী সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবলম্বিত সব কিছুকেই আমাদের সমর্থন করিতে হইবে। ইহা কু-যুক্তি। স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা হরণকারী স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করিবার যুক্তি কু-যুক্তি ছাড়া আর কি হইতে পারে। Et propter vitam vivendi perdere causas.

আপনারা বলেন এ অত্যাচার অস্থায়ী। আজ যখন দেখিতেছি অবিচার ও অসহিষ্ণুতা বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন এ অস্থায়িত্বের কি প্রতিশ্রুতি আপনারা দিতে পারেন? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব জয়লাভের পর তাহাদের চোখ খুলিবে! জয়লাভ কাহারো চোখ খুলিয়া দেয় না, অন্ধকে আরো অন্ধ করিয়া তোলে মাত্র।

অস্থায়ী মিথ্যার কথা যেন আমরা আর না বলি। চিন্তাজীবী মানুষের পক্ষে প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়ায়! সে যাহা চিন্তা করে তাহাই বলিবে, না মিথ্যাভাষণের আশ্রয় লইবে? (এই প্রবঞ্চনা মিথ্যাভাষণেরই নামান্তর)। যদি মিথ্যার আশ্রয়ই সে গ্রহণ করে তবে তাহার আর

রহিল কি! পারি, রোম কি মস্কো— কারো নির্দেশই চিন্তার স্বাধীনতা মানিয়া চলে না। সাম্যবাদী বিপ্লব যদি বিশ্বাস করে যে, সে মানবতার স্বার্থের সেবা করিতেছে তবে চিন্তার স্বাধীনতাও বলিবে সেও তাহার মতো ওই একই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সাবধান, এ-দুইয়ের মধ্যে যেন সংঘর্ষ না বাধে। সংঘর্ষ যদি বাধে তবে ক্ষতি শুধু চিন্তার স্বাধীনতারই হইবে না।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মনাৎ ও মাশেল মাতিনে-র সঙ্গে বন্ধু ভাবেই আমার কথা হইতেছিল। আমরা পরস্পরকে বুঝি না বলিয়াও আমার মনে হইল না। আমি তাহাদের দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম হিংসা ও চিন্তার স্বাধীনতার যুগল সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব কেমন করিয়া তাহার আদর্শের ক্ষতি করিতেছে, মস্কোর বাস্তববাদিগণের বাস্তবতা কত অগভীর।

আমি জানি কি ভীষণ দায়িত্ব তাহাদের বহন করিতে হইতেছে। কি অদম্য শক্তি লইয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ পৃথিবীব্যাপী শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের সম্পদ রক্ষা করিতেছে। এই মর্মান্তিক দুঃখের মহিমা আমাদের চেয়ে বেশি আর কে বোঝে। তাহাদের সম্মুখে আজ চরম দুর্দিন—বহু সাংঘাতিক বিপর্যয়ের একত্রিত গুরুভারে তাহারা অবনত। প্রকৃতিও যোগ দিয়াছে শত্রুর সহিত, সেখানেও তাহাদের অমানুষিক সংগ্রাম। এ অবস্থায় যত বড় দৃঢ় শক্তিমান মানুষই হউক না কেন তাহার মনে হইবে সহনশীলতার শেষ সীমায় আসিয়া শক্তি তাহার ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এই মানুষদের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে সংযমের অভাব দেখি তবে তাহাদের দুঃসহ দুর্দিনের কথা স্মরণ করিয়া কে তাহাদের তিরস্কার করিবে? তাহাদের ভুলভ্রান্তিতে ও হিংসাত্মক কার্যে কে বিস্মিত হইবে। আমরা অমানুষিক মানবতাপ্রেমিক নহি। যে-আদর্শের পূর্ণ চরিতার্থতা অসম্ভব, সে-আদর্শ আমরা কাহারও

নিকট হইতে চাহি না। মানুষকে আমরা মানুষের মতোই দেখি। ত্রুটিবিচ্যুতিতে অসম্পূর্ণমানুষই আমাদের চোখে সম্পূর্ণ মানুষ। কিন্তু দোষকে যেন আমরা কোনো মতেই গুণ বলিয়া গ্রহণ না করি। আমরা শুধু এইটুকুই স্বীকার করিতে চাহি না যে, এই ত্রুটি বিচ্যুতির উপর একটি নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে। অঘটনকে আমরা কীর্তি বলিয়া জাহির করিবার বিরোধী। আমরা এমন কিছুকে সমর্থন করিতে চাহি না যাহা হিংসাত্মক নীতির পথ প্রশস্ত করে; অথচ এই ধরনের সমর্থনই করিতেছেন আপনারা ও আপনাদের মস্কোর আদর্শ পুরুষেরা। জানি আপনাদের এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কোনো কোনো আদর্শবাদীর বিবেক যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহাতে আপনাদের কোনো পরিবর্তন হইবে না, কিন্তু পরম "বাস্তববাদী" হইয়াও এ-কথা কি আপনারা বুঝিতেছেন না যে অতি-অনুভূতিশীল তাপমান যন্ত্রের মতোই ওই বিদ্রোহী বিবেকই পূর্ব হইতেই যুগের মানসিক অবস্থার নির্দেশ দিতেছে? আপনারা কি জানেন না যখন কোনো বিপদ-সংকুল স্থান উত্তীর্ণ হইবার সময় আসে তখন ভবিষ্যত আবহাওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ? সু-উচ্চ পর্বত আরোহণ করিতে গিয়া যদি কোনো অতল গহ্বরের মুখে আসিয়া কেহ দাঁড়ায় তখন বজ্রগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলিকে উপেক্ষা করিলে মঙ্গল হয় না।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আপনারা ইউরোপের উদারনৈতিক ব্যক্তিদের মতবাদকে "পাশবিক হিংস্রতার" সহিত আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। ফল কি হইয়াছে? জেনোয়া সম্মেলনের পূর্বাহ্নে বিপ্লবী সোশ্যালিস্টদের সম্প্রতি যে বিচার হইয়া গেল তাহাতে যে অট্টরোলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কথা একবার ভাবুন। বিষয়টি কতখানি সমর্থনের যোগ্য সে বিষয়ে কোনো মত আমি ব্যক্ত করিতে চাহি না। সমস্ত দলেরই রাজনৈতিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মিথ্যা এত গভীরভাবে প্রবেশ

করিয়াছে যে, অভিযুক্তগণ দোষী কি নির্দোষ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার সাহস আর আমাদের নাই। আমাদের আছে বড় জোর সন্দেহ ও উদ্বেগ। এই উদ্বেগের সুযোগ করিয়া মস্কোর শত্রুরা ইউরোপে এমন সুষ্ঠ ও সফল প্রচারকার্য চালাইয়াছে যে কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও আনাতোল ফ্রাঁসের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি সোবিয়েৎ গভর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়া মস্কোতে তারযোগে এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক-বিরোধীরা সেই বাণীটিকে শানিত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে।

এই কি আপনাদের হিংসাত্মক নীতির সময়োপযোগিতা ? হিংসাত্মক নীতিকে যাহারা সময়োপযোগী বলিয়া প্রচার করেন, বিরুদ্ধ মতকে তাহারা "প্যাতি বুর্জোয়া ভাবালুতা" বলিয়া মনে করেন। নামে কি আসে যায় ? ভাবালুতা যদি জগতের একটি সক্রিয় শক্তি হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা করা বাস্তববাদিতার পরিচয় নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে এই হিংসাত্মক নীতি এবং সর্বোপরি এই নীতির গুণকীর্তনের অক্ষম প্রচেষ্টার অনিবার্য ফলস্বরূপ বারট্রাণ্ড রাসেল, জর্জ ব্রাঁদ ও অতীতের আনাতোল ফ্রাঁস প্রমুখ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল চিন্তানায়কগণ রুশ-বিপ্লব হইতে সরিয়া গিয়াছেন ; যেমন ফরাসী-বিপ্লবের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া বিপ্লব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, কোলরীজ ও শীলারের মতো লোক। এইসব ব্যক্তিকে আপনারা গণনার মধ্যে যদি নাও আনেন তথাপি ইহাদের সমর্থন হারানোর অর্থ এমন বিরাট নৈতিকশক্তির সমর্থন হারোনো জনজীবনের উপর যাহাদের প্রভাব অপরিসীম। আমার ফরাসী বিপ্লবের পতনের কারণগুলির মধ্যে ইহাও একটি। রুশ-বিপ্লবকে এ-বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। হৃদয়ের শক্তিকে যাহারা উপেক্ষা করে তাহাদের ভাগ্যে অশেষ দুঃখ রহিয়াছে।

মনের স্বাধীনতার প্রশ্নের সহিত আমি হিংসার প্রশ্ন অপেক্ষাও বেশি

প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এখানে আমি আমার নিজের মাটিতে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারি। আমি বলিতে চাই, এই আদিম সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া যে-কোনো শক্তির পক্ষেই গুরুতর ভুল। নয়া মার্কসবাদী বস্তুবাদের আবরণে দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেই মানুষ আত্মার দাবীর মধ্যে বুর্জোয়া স্বার্থ ও স্বতন্ত্রবাদী স্বার্থপরতা ঢাকিবার বিপুল প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পারে না। চিন্তার স্বাধীনতা মানবতার একটি মৌলিক শক্তি, ইহাকে জোর করিয়া কিছু করানো যায় না। ইহাকে নির্যাতন করিলে অবশ্য আপনি ঝুঠা বুদ্ধিজীবীদের, সিদ্ধিসর্বস্ব প্রতারকদের এবং কারবার-সর্বস্ব কাপুরুষদের বাহবা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নির্যাতনের মুখে বীরের মত দাঁড়াইবেন, প্রয়োজন হইলে শহিদ হইবেন তাহারাই যাহারা প্রকৃতই চিন্তাজগতের মানুষ। কারণ, তাহাদের দলিতবিশ্বাসের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিবে এক নূতন বিশ্বাসের অগ্নিশিখা। অতএব ভাবিয়া দেখুন। আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। এ আগুনে আপনি নিজে পুড়িবেন। একখানি মাত্র পুঁথির নির্দেশে চালিত হইয়া যিনি প্রকৃতির উপর আপনার অন্ধবিশ্বাসকে চাপাইয়া দিতে চান তিনি নিশ্চয়ই বিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ নহেন। প্রকৃতির মধ্যে বহুবিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী যে সকল বস্তু রহিয়াছে তাহাদের আবিষ্কারের জন্য তাহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে, বুঝিতে হইবে সে সকল বস্তুর প্রকৃতি, বিরোধিতার মধ্যেও মিলন ঘটাইতে হইবে তাহাদের।

আপনাদের দলের উগ্র নবদীক্ষিতদের অনেকেই মার্কসীয় নিয়মাবলীর শিলালিপি হইতে পাঠ গ্রহণ করিয়া আমাদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেন, বলেন এ-বিরোধিতা নাকি একেবারেই নেতিবাচক। তাহাদের ধারণা, তাহাদেরই সমাধানপদ্ধতি যখন একমাত্র ও সুগঠিত মতবাদ, তখন তাহার পায়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ

নাই। কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে চাই অরণ্যে পথ হারাইলে কেহ যদি আমাকে এমন পথের সন্ধান দেয় যে-পথ আমাকে এক জলাভূমির মধ্যে লইয়া যাইবে, তখন কি আমি অন্য কোনো পথের সন্ধান জানা নাই বলিয়া সেই পথেই চলিব? বিপথ বলিয়া এই পথটিকে চিনি বলিয়াই এ-পথে চলিতে আমি চাহি না, সহিষ্ণুতার সহিত অন্য পথের সন্ধান করিতে চাহি।

এই অন্য পথের সন্ধান আমরা আজও পাই নাই বটে কিন্তু কোনদিকে ইহার সন্ধান করিতে হইবে তাহা আমরা জানি। আমাদের সংগ্রাম যে শুধু নেতিবাচক এ-কথা সত্য নহে। এই সংগ্রামের ফলে আমরা এমন একটি বিপুল সত্যের সন্ধান পাইয়াছি যে-সত্যকে আপনাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা উপেক্ষা করে: মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে যে একাধিক বিভিন্ন ব্যবস্থা একত্রে রহিয়াছে এ-কথা আমরা জানিয়াছি। "সামাজিক সমস্যার তিনটি দিক" নামক কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকায় রুডলফ্ শ্টাইনের দেখাইয়াছেন তিনটি ব্যবস্থা (মস্তিষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাক) লইয়া মানুষের দেহ গঠিত, এই ব্যবস্থা তিনটি পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করে বটে কিন্তু কেহ কাহারো অধীন নহে। সমাজদেহকেও তিনি এমন তিনটি ভাগে ভাগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন যে-তিনটি ভাগ অনায়াসে পরস্পরের সহিত সহায়তা করিবে! অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন (ইহার পরিচালনাভার বিশেষভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে) এবং পরিশেষে চিন্তার জীবন। শেষোক্তটির মধ্যে থাকিবে ব্যক্তি-মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক গতি যেদিকে সেই দিকের আলোচনা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজদেহের সর্বপ্রকার সম্পর্কের বিষয়।

এই ব্যবস্থাকে এখানে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ব্যবস্থা বলিয়াই ইহার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে এবং যে-ব্যবস্থার পরিবর্তে ইহাকে

প্রবর্তন করিবার কথা উঠিয়াছে তাহার মতোই ইহা অসম্পূর্ণ। এ-ব্যবস্থায় আমি খুশি নই, কিন্তু ইহার একটা ভালো দিক হইতেছে এই যে, মার্কস্‌বাদী গোঁড়ামির সংকীর্ণতাকে ইহা প্রসারিত করিতে পারে এবং সমাজনির্মাণকারীদের মতবাদের মধ্যে কিছুটা জীবনের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য প্রবেশ করাইতে পারে। এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিপ্লবী মতবাদ আজ যথেষ্ট সচেতন নহে। অর্থনৈতিক বস্তুবাদে ইহার দিগন্ত বড় বেশি সীমাবদ্ধ। যান্ত্রিক পদ্ধতি ও ধনতন্ত্রের বিপুল গতিবেগ সমন্বিত বিবর্তন তাহাদের সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মানুষের মনের মহাবিবর্তনকে তাহারা দেখিতে পায় নাই।

এনসাইক্লোপিডিস্টদের আত্মতুষ্ট যুক্তিবাদ, এমন কি, ওগ্যুস্ত কঁৎ-এর পজিটিভিজ্‌ম্‌কেও আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি। মন আজ প্রকৃতির শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের বিপ্লবীরা ইহা লইয়া বেশি মাথা ঘামান না। তাহাদের ঘড়ি ও আমাদের ঘড়ির কাঁটা একস্থানে নহে। তাহারা চাহিতেছেন এমন এক ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক একক ব্যবস্থা যাহা অন্য সমস্ত দেহাংশকে গ্রাস করিবে অথচ উহাদের ছাড়া সমাজদেহের সমস্ত গতিই থামিয়া যাইবে। এই সমস্ত দেহাংশের সব চেয়ে মূল্যবান অংশ, মানুষের অগ্রগতির সব চেয়ে বড় হইতেছে মন। মন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। ইহা নিজের নিয়মে চলে। মানুষের সাধারণ জীবনের সহিত সহযোগিতা করিয়াও ইহা আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সবসময়ে রক্ষা করিয়া চলে। সহকারী শক্তিগুলির স্বাধীন বিকাশের মধ্যেই ভবিষ্যতের বিপ্লবের পথ খুঁজিতে হইবে। কিন্তু যদি তুমি উহাদের প্রত্যেককে তাহার স্ব স্ব স্থান ছাড়িয়া না দাও তবে আহত প্রকৃতি তোমার বিরাট অথচ ভঙ্গুর নির্মাণকার্যকে ধ্বংস করিয়া আপনার অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিবে

ফ্রান্স ও জার্মানির মিলনের উদ্দেশে

লণ্ডনের পি. ই. এন ক্লাবের উদ্দেশে (আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য)

১লা মে, ১৯২৩

একটি অপ্রীতিকর ঘটনা এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গুরুত্ব কমাইয়া দিয়াছে এবং ইহার রূপও বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাদেশস্থিত একটি বিশেষ দল, সি ই বি, (বেলজিয়ান লেখক সঙ্ঘ) বিশেষ ক্ষমতাবলে জার্মান শাসনকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

ফ্রান্সের পক্ষ হইতে, পি. ই. এন-এর কেন্দ্রীয়শাখার পক্ষ হইতে আমি জানিতে চাই সকলপ্রকার রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বাহিরে ও উর্ধ্বে চিন্তাজগতের সার্বজনীনতা রক্ষা করাই পি. ই. এন-এর উদ্দেশ্য কিনা। ইহা কি স্পষ্টত, প্রকাশত এবং সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক কথাটি এখানে "আন্তঃ মিত্রশক্তি" অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে? যদি ওই অর্থেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে, মস্তিষ্কজীবীদের বিশ্বসঙ্ঘের এই ধরনের কোনো সীমা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে আমি উহার মধ্যে থাকিতে চাহি না। রাজনীতির উন্মাদ স্বেচ্ছাচারের পায়ে আমি আমার চিন্তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে পারি না।

আপনারা হয় তো বলিবেন কোনো জাতিকেও বাদ দেওয়া হয় নাই, বাদ দেওয়া হইয়াছে ওই জাতির কয়েকজন প্রতিনিধিকে। বাদ দেওয়া হইয়াছে কাহাকে? গেরহার্ড হাউপ্ট্‌মান। তাহার অযোগ্যতার কারণ কি? ৯৩ জনের ইস্তাহার! এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর দানের জন্য তিনি নাকি আজও অনুশোচনা করেন না!

হাউপ্ট্‌মান ও এই ৯৩ জন স্বাক্ষরকারীদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য ১৯১৪ সালের অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলাম। আমি প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিকতার শপথ গ্রহণ করিয়াছি; জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে যুদ্ধের নূতন ধর্মের চোখে আমি বিধর্মী, কারণ আমার বিশ্বাসের বিশ্বজনীনতাকে আমি কোনোদিন বিসর্জন দিই নাই। রাষ্ট্র বা জনমতের স্বেচ্ছাচারের সম্মুখে নতজানু হইবার মতো বিদ্রোহী আমি নই। যে ৯৩ জন জার্মান বুদ্ধিজীবী উদাত্ত অথচ অর্থহীন কণ্ঠে "Es ist nicht wahr" এই বাণী ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে কঠোর কিছু বলিবার ও করিবার অধিকার আমারই আছে।

কিন্তু মিত্রদেশগুলির স্বদেশপ্রেমিক আপনারা, আপনাদের এ-অধিকার কোথা হইতে জন্মিল? আপনারা নিজেরা কি গত নয় বৎসর ধরিয়া নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারকে চোখ বুজিয়া সহ্য করেন নাই। নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের উদ্ধত উপদেশের সুরে সুর মিলাইয়া আপনারা কি এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করেন নাই! বিজিত দেশ সমূহের নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদকে এই ঐকতানে আপনারা কি চাপা দিতে চান নাই? আমার চোখে এ সাংঘাতিক অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধ স্বীকার না করিয়া হাউপ্ট্‌মান কি একজন "সাঁচ্চা দেশ-প্রেমিকের" কাজই করিতেছেন না? নিজের দেশের ভুল স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া তিনি কি মিত্রদেশগুলির দেশপ্রেমিকদিগের পদাঙ্কই অনুসরণ করিতেছেন না? মিত্র রাষ্ট্রগুলির অপরাধ ও দায়িত্ব সম্পর্কে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও রাশিয়ায় যে রাশি রাশি নজির ও দলিল প্রকাশিত হইয়াছে ১৯২৩ সালেও সে-সবগুলিকে আপনারা কি উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন না?

ইউরোপীয় সভ্যতার জাগরণের অন্তরালে অপরাধ ও নির্বুদ্ধিতার যে

পর্বতপ্রমাণ স্তূপ এতদিন ঢাকা পড়িয়াছিল গত দশ বৎসরে তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এ-অপরাধের দায়িত্ব প্রত্যেক জাতেরই রহিয়াছে, রাগ করিয়া লাভ নাই। নিজেদের দিকে তাকাইয়া দেখুন, আর কিছু না করুন বিচারকের আসনে বসিবেন না। ইউরোপে আজ সাম্য বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। পাপের চেয়ে পুণ্যের ভণিতা সেখানে বেশি। এখানে বসিয়া বিচারের কথা যেন আমরা না বলি। মৃত্যুই এখানে একমাত্র সুবিচার, একমাত্র মৃত্যুই আনিবে সাম্য।

আজ আর ভাবিবেন না যে পরস্পরকে দূরে রাখিবার নীতি দ্বারা আপনারা লোককে বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন। ক্ষমাশীল হইবার চেষ্টা করুন। ক্ষমা যদি করতে না পারেন ভুলিতে চেষ্টা করুন, কারণ, ক্ষমা করার চেয়ে ভুলিতে পারাটা সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন বেশি। বিস্মৃতির পরম কল্যাণকর যাদুস্পর্শে শোক ও লজ্জা মুছিয়া যায়, পরকে সহ্য করিবার, এমনকি নিজেকে বহন করিবার, ক্ষমতাও জন্মে! ভুলিয়া যান! বিশ্বাস করুন এ ভুলিয়া যাওয়ায় লাভবান হইব আমরা সকলেই কারণ যদি প্রত্যেক অপরাধেরই প্রতিশোধ লইতে হয় তবে আগামী শতাব্দীর মধ্যে আমাদের এই ইউরোপে একটি পাথরও খাড়া থাকিবে না।

(১৯২৩ সালের ৫ই জুন, "আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন" নামে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত)

রুর অধিকার সম্পর্কে

জুলাই, ১৯২৩

রুর সম্পর্কে বিজয়ীদের নীতির আশু পরিণাম যাহাই হউক না কেন উহার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। কবে জানি না, তবে একদিন না একদিন এই নীতির ফলে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবেই এবং সে যুদ্ধে চতুর্গুণ ঘৃণার আগুনে দুইটি দেশই পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। বিজয়ী ও বিজিত উভয়কেই আমি অনুকম্পা করি। কৃষ্ণ ও শ্বেত জাতিগুলির যে বিপুল সংঘর্ষের অগ্নি-শিখায় আজ দিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মতো কোনো সামাজিক বা জাতিগত আলোড়নই একমাত্র এই ভবিতব্যকে অন্য লক্ষে চালিত করিতে পারে।

যে রাষ্ট্রনায়কগণ এই শোচনীয় নীতি পরিচালনা করিতেছেন আমাদের উত্তরপুরুষেরা তাহাদের নাম ঘৃণার সহিত উচ্চারণ করিবে। একান্ত অনাসক্তভাবে আমি এই কথা উচ্চারণ করিতেছি, দুঃখবোধও পর্যন্ত করিতেছি না। মঃ পোয়্যাকারে-র বিরুদ্ধে আমার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। আমি তাহাকে একজন গভীর দেশপ্রেমিক ও নির্মল-চরিত্রের রাষ্ট্রনেতা বলিয়াই জানি। জানি কতবড় দায়িত্ব তাহার মাথায়, কি বিরাট সমস্যাবলীর সম্মুখে তাহাকে দাঁড়াইতে হইতেছে। কিন্তু এক অন্ধ ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি যে ভুল করিয়াছেন তাহা, যে-দেশকে তিনি ঘৃণা করেন তার চেয়ে যে-দেশকে ভালোবাসেন তার পক্ষেই, মারাত্মক হইবে বেশি।

(কাউন্ট সুচিদি সম্পাদিত রাসেনা ইন্তেরনাৎসিওনালে-র জন্য লিখিত)

জার্মানির দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ফরাসীদের নিকট আবেদন

৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৩

লোকের সম্মুখে বিজয়ী বা বিজিত উভয়েই সমান।

শবযাত্রা দেখিলেই মৃতের জীবন যাহাই হউক না কেন মস্তকাবরণ খুলিয়া তাহাকে সম্মান দেখানো আমাদের জাতির পবিত্রতম প্রাচীন প্রথাগুলির একটি। চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী ও সেবাব্রতিনীদের অর্থাৎ মানুষের দুঃখ মোচনের কাজে যাহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার পথ তাহাদেরই মত ঐকান্তিকতা লইয়া দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

ফ্রান্সের রহিয়াছে এই সহজাত প্রবৃত্তি পরিপূর্ণভাবে। তাই ফ্রান্সের নিকট আমাদের আবেদন :

জার্মান জাতি না খাইয়া মরিতেছে। যুদ্ধরূপ মহামারীর দণ্ড দিতেছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ। তাহাদের শাসকশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ ও স্বার্থপরতার জন্য তাহারা যদি দায়ী হয় তবে মহামারীর জন্যও তাহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। অক্টোবরের শেষে বার্লিনে লাইপৎসিগ ফ্রিবুর্গ-এ রোজকার রুটির দাম ৭ হইতে ১০ মিলিয়ড মার্ক পর্যন্ত ওঠে। এই দামের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম বুদ্ধিজীবী কর্মীর মাসিক মাহিনা। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল ও ইঞ্জিনিয়ার সকলেই রুটি কিনিবার জন্য বই ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রয় করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পল্লী অঞ্চলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। বার্লিনে শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে কিছু না খাইয়াই স্কুলে যাইতেছে। ইহাদের অনেকেরই ভাগ্যে গরম সুপ জোটে দুইদিনে মাত্র একবার।

হাজার হাজার পরিবার উপবাসে জীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, তারপর ক্ষুধার কষ্টের সহিত মিশিয়াছে ঠাণ্ডা। শীতকাল শুরু হইয়াছে সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ মহামারী লইয়া। যে-ফ্রান্সের শেষ শক্তিমান প্রতিনিধি ছিলেন ভিক্টর য়্যুগো, পুরাতন যুগের সেই মহানুভব ফ্রান্স একদিন রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নির্জীব শত্রুর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিত, সযত্নে বাঁধিয়া দিত ক্ষতস্থান। আজ চার বৎসর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। শুনিতে পাই নূতন জীবনের শ্যামল ফসলে রণক্ষেত্রগুলি ভরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পরাজিতের দুর্দশা আজও শেষ হইল না। আজ সে মরিতেছে, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। দল ও মত নির্বিশেষে সমস্ত জাতির নিকট আমাদের এই আবেদন। নানা উন্মাদনায় আজ ফরাসী জাতির ঐক্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তো আমরা সুবিচার করিতে পারি। মিলিতে পারি আমরা সেইখানেই যেখানে দাঁড়াইয়া সকলেই আমরা ফ্রান্সকে শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি তার নৈতিক মহত্ত্বকে, স্বীকার করি সে নৈতিক মহত্ত্বের রক্ষার প্রয়োজনকে। আসুন, এ ঐক্যের প্রমাণ আজ আমরা জগতকে দেখাই। জগত জানুক ফরাসীদের হৃদয়হীন ঘৃণার স্থান নাই, স্থান নাই অপরের দুর্দশার প্রতি ঔদাসীন্যের ; বিজয়ী ফ্রান্স আজও করুণার দেশ।

হৃদয়ের মহত্ত্বই জয়লাভের একমাত্র প্রমাণ। করুণার মতো এতবড় শক্তি আর পৃথিবীতে নাই।

একদিন সে যাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল আজ তাহারই প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য ফরাসী জাতিকে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানাইতেছি। জার্মানির দুর্ভাগা জনসাধারণের জন্য আমরা একটি সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছি। এবং চাঁদার তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছি।

লেনিনের মৃত্যু

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪

লেনিনের ও রুশ বলশেভিকবাদের মতবাদ আমি স্বীকার করি নাই। আমি এতখানি স্বতন্ত্রবাদী ও আদর্শবাদী যে মার্কসবাদী বস্তুতান্ত্রিক অদৃষ্টবাদ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসই আমাকে বিরাট ব্যক্তি-পুরুষদিগের ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া গণ্য করিতে শিখাইয়াছে; তাই লেনিনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রহিয়াছে। এ-শতাব্দীর ইউরোপে লেনিনের চেয়ে শক্তিমান পুরুষ জন্মিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। গলিত মানবতার ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে তাহার ইচ্ছাশক্তির অর্ণবপোত যে গভীর পথ রাখিয়া গেল তরঙ্গাভিঘাতে তাহা মুছিয়া যাইতে দীর্ঘদিন লাগিবে। জাহাজখানি আজ সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে নূতন জগতের পানে। এতখানি ইস্পাত-কঠিন ইচ্ছাশক্তি লইয়া নেপোলিয়ঁর পরে ইউরোপের ইতিহাসে আর কেহ আসেন নাই। প্রাচীন যুগের পর ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের মধ্যে বিশ্বাসের এই অটলতা আর দেখা যায় নাই। সর্বোপরি মানুষের উপর মানুষের এতখানি প্রভুত্ব, নিঃস্বার্থ প্রভুত্বও চোখে পড়ে নাই। জীবন দিয়া কালের বুকে যে নৈতিক প্রতিমূর্তি তিনি স্থাপন করিয়া গেলেন তাহা কোনোদিন ম্লান হইবে না।

ইতালীয় ফাশিজমের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে

ফরাসী লীগ অফ দি রাইটর্স অফ দি ম্যান-এর সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতা। ত্রিপোলিতে মুসোলিনীর সামরিক শোভাযাত্রার পরদিন লিখিত

১৯শে এপ্রিল, ১৯২৬

আর একবার যুদ্ধ হইলে ইউরোপ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে এ বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় যুদ্ধের আঘাত সে কিছুতেই সামলাইতে পারিবে না। সমগ্র পশ্চিম মহাদেশ ব্যাপিয়া নামিয়া আসিবে অন্ধকার।

অতএব যুদ্ধের প্ররোচনা দান অথবা যুদ্ধ বন্ধের জন্য করণীয় সব কিছু না করা, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে, ইউরোপের মর্মবাণীর বিরুদ্ধে অমার্জনীয় অপরাধ। আজ প্রকাশ্যে প্রবলকণ্ঠে এ-কথা ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে যে, এই পাপেরই আয়োজন চলিয়াছে, এই পাপেরই স্বপ্ন দেখা হইতেছে। পাপীর অভাব নাই, ইউরোপের প্রত্যেক দেশের নাগরিকদের মধ্যেই তাহারা বর্তমান। এই পাপীদেরই একজন আমাদের এক বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে বসিয়া প্রকাশ্যেই শান্তিকে বিদ্রূপ করিতেছেন এবং এই শান্তিকে ভঙ্গ করিবার বাসনা দম্ভভরে ঘোষণা করিতেছেন। সারা দেশব্যাপী অতি-উত্তেজিত তরুণ তরুণীর দল উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিয়া আছে। এই ইঙ্গিত পাইবা মাত্রই তাহারা সংহারের সিংহদ্বার খুলিয়া দিবে, পাপকে ছাড়িয়া দিবে পৃথিবীতে স্বেচ্ছা-বিচরণের জন্য।

ইউরোপের দুর্ভাগ্য একের নির্বুদ্ধিতায় সকলেরই ভবিতব্য দুলিয়া ওঠে। তাই ইউরোপকে শ্যেন-দৃষ্টি লইয়া শান্তিকে পাহারা দিতে হইবে। এ তাহার বড় ভঙ্গুর সম্পদ। কিন্তু এ তাহার সবচেয়ে বড় সম্পদ, এ তাহার জীবন। ইহাকে যে নষ্ট করিতে চায় সে মানুষই হউক কি জগতই হউক—সে যেন নিজে ধ্বংস হইয়া যায়।

2. Vita Sine Libertate, Nihil.

২৩শে এপ্রিল, ১৯২৬

ইতালীয় ফাশিজমের নীতির উপর যে-শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি সে-শাসন ব্যবস্থা মানুষের বিবেকের নিকট অপমানজনক। মানুষের ভয়ের প্রবৃত্তির সুযোগ লইয়া তাহাকে মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করিয়া মানুষের পবিত্রতম ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া এই শাসনব্যবস্থা আপনার অস্তিত্বকে কায়েম রাখে।

ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রত্যেক প্রয়াসই একটি অপরাধ। এ অপরাধ স্বাধীন যুক্তির দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। যে স্বাধীন জাতি একদিন বিপ্লব আনিয়াছিল এ-অপরাধ তাহারই বিরুদ্ধে; এ-অপরাধ স্বাধীন আত্মার বিরুদ্ধে।

কোনো হত্যাকেই আমি ক্ষমা করি না। সব হত্যারই আমি প্রতিবাদ করি। কিন্তু যে স্বাধীনতাকে হত্যা করে সে হত্যাকারীর পাপের তুলনা নাই।

Vita Sine Libertate, Nihil

(ফরাসী ফাশিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে
সংঘর্ষ সম্পর্কে আঁরি তরেসকে লিখিত পত্র)

৩। ফিলিপ্পো তুরাতিকে লিখিত পত্র

১১ই মে, ১৯২৭

প্রিয় ফিলিপ্পো তুরাতি,

আপনাকে ও আপনার বন্ধুদের অভিনন্দিত করিয়া আমি আমাদের পরম প্রিয় বৃহত্তর স্বাধীন ইতালির বিশ্বস্ত ও নির্যাতিত প্রতিনিধিদেরই অভিনন্দন জানাইতেছি, আর অভিনন্দন জানাইতেছি দুর্ভাগা ইতালিকে, শহিদের দেশ ইতালিকে। শাশ্বত ন্যায় ও মানুষের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে গিয়া যাহারা জীবনে চরম যন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের কত রক্ত, কত অশ্রুজলই না সে পান করিয়াছে। এমন কোনো বিদেশী শাসন নাই যাহা তাহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ যখন সমস্ত বিদেশী শৃঙ্খল সে ছিড়িয়া ফেলিল তখন দেখিল সব চেয়ে কঠিন শৃঙ্খল কোথায় যেন তাহার জন্য জমা ছিল। স্বদেশের এক স্বেচ্ছাচারীর লৌহ শৃঙ্খলের অসম্মান আজ তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। আভ্যন্তরিক আলোড়ন ও আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণে আপনাদের শ্রমশীল উত্তর দেশ এইভাবেই তো যুগে যুগে অভিভূত হইয়া আসিতেছে।

আদিম মৃত্যুশক্তির বিরুদ্ধে আসুন আবার আমরা যুক্তির সংগ্রাম শুরু করি। যে-সংগ্রাম আজ আপনারা চালনা করিতেছেন সে-সংগ্রাম শুধু কোনো বিশেষ একটি নির্যাতিত অপমানিত ও নিষ্পেষিত মহান জাতির মুক্তিযুদ্ধ নহে, এ-যুদ্ধ সমগ্র জগতের মুক্তিযুদ্ধ। আজ প্রশ্ন, কে জিতিবে? যে পশুশক্তি মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে, সে? না— যে মননশক্তি মানুষের চিত্তাকাশকে আলোকিত করিয়া সমস্ত শৃঙ্খলকে পুড়াইয়া দেয়, সে?

(সোশালিস্ট ডেপুটি ফিলিপ্পো তুরাতি লিপারি দ্বীপপুঞ্জ হইতে পলাইয়া যখন পারি-তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন ঠিক সেই সময়ে চিঠিখানি লিখিত। ১৯২৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তুরাতি রলাঁর নিকট পারি-র নির্ধারিত ইতালিয়ানদের মুখপত্র লা লিবেরতা-য় প্রকাশের জন্য একটি বাণী চাহিয়া পাঠান, উপরের চিঠিখানি সেই বাণী।)

ফ্রান্সে ইন্দোচীনের ছাত্র ও মজুরদের প্রতি

১৭ই মে, ১৯২৬

ফ্রান্সে ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকগণ! আপনারা আমার সৌভ্রাত্রমূলক সহানুভূতি গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের সহিত গুয়েন-আন-নিন্এর মুক্তি দাবী করি।

স্বদেশবাসীর অধিকার রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজের কর্তব্যই সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ব্যভিচারকে আক্রমণ করিয়া তিনি শুধু ইন্দোচীনেরই কল্যাণ করেন নাই। ফ্রান্স ইহাতে উপকৃত হইয়াছে।

কারণ, সত্যকে জানা ফ্রান্সেরও নিজের স্বার্থ। কী ভুল ও কী অন্যায় সে করিতেছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা তাহার পক্ষেই মঙ্গলকর। যে অপব্যবহারের ফলে তাহার নাম কলঙ্কিত হইতেছে, তাহার সম্মুখেই অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা করাতেও ফ্রান্সই উপকৃত হইবে। ইন্দোচীন

ফ্রান্সে ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকদের মুখপত্র পারি হইতে প্রকাশিত ভিয়েৎনাম হোন নামক মাসিক পত্রিকার অনুরোধে এই পত্রখানি লিখিত। ইন্দোচীনে ফ্রান্স নামক পুস্তকের লেখক ইন্দোচীনের নেতা গুয়েন-আন-নিনকে কোচিন চীনের গভর্ণমেণ্ট তখন রাজদ্রোহের অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ও ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে যদি সহযোগিতার বন্ধন স্থাপিত হয় তবে তাহাতে ফ্রান্সেরই স্বার্থ রক্ষা হইবে।

ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকগণ, আপনাদের নিকট আমাদের আবেদন: এই সহযোগিতা স্থাপনের প্রচেষ্টায় আমাদের সহিত আপনারা যোগ দিন। দাম্ভিক জাতিপ্রেমের যে নির্বোধ কুসংস্কার ইউরোপ ও এশিয়ার জাতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বমানবের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, আসুন আমরা তাহার বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রাম করি। এই ধ্বংসাত্মক জাতিবিদ্বেষের জন্য বিজেতা ইউরোপীয়গণই প্রধানত দায়ী। কিন্তু এশিয়াবাসীদিগকেও একেবারে নির্দোষ বলা চলে না। আজ চোখের উপর এশিয়ার বহু দেশকে দেখিতেছি, যেখানকার জনসাধারণ নিজেরা দীর্ঘদিন নির্যাতিত হইয়াও যে মুহূর্তে স্বাধীনতালাভের মুখে আসিয়া দাড়াইতেছে, সেই মুহূর্তেই জাত্যভিমান, জাতি-বিদ্বেষ ও দাম্ভিকতার কুসংস্কার তাহাদের পাইয়া বসিতেছে। নির্যাতনকারীদের কুসংস্কারের চেয়ে এ-কুসংস্কার কম নহে। মনুষ্যজাতির এ একটা ব্যাধি। মানুষকে ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের জাতি ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট কাজ করিতে হইবে।

দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা, অজানাকে জানিবার কৌতূহল, দিগ্বিজয় ও সম্পদ আহরণের লোভ, সাম্রাজ্য লিপ্সা—যে কারণেই ইউরোপীয়রা এশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকুক না কেন, অকল্যাণ হইতে কল্যাণ আসিতে পারে ; এবং কল্যাণের একটা সুস্পষ্ট সম্ভাবনা মানুষের সামনে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দুইটি শক্তিশালী সভ্যতার সম্মেলন হইয়াছে। স্বেচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, পরস্পরকে তাহাদের জানিতে হইবেই। তাহারা যেন একে অন্যের গভীরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করিতে পারে।

বিচ্ছিন্ন সভ্যতার যুগ শেষ হইয়াছে। সৌন্দর্যের অসামান্য বিকাশ এই

যুগে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পবিত্র স্মৃতি আমরা রক্ষা করিব। কিন্তু অতীতকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যেন আমরা না করি। এ চেষ্টা পণ্ডশ্রম হইবে। আমাদের সম্মুখে আজ অন্য কাজ, অনেক বড় কাজ আমাদের রহিয়াছে। আসুন আমরা একত্রে কাজ করি। এই কাজে আমাদের সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও আমরা শান্তভাবে নিষ্ঠার সহিত আমাদের উভয়েরই মঙ্গলকর একক কর্তব্য আমরা যেন করিয়া যাইতে পারি।

কিন্তু অধিকার ও কর্তব্যের সাম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িবার চেষ্টা না করিলে শক্ত স্থায়ী কিছুই গড়িয়া তোলা যায় না। আমি সর্বপ্রধান অধিকারগুলির মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং যাহা সত্য বলিয়া জানি ও বিশ্বাস করি তাহা লিখিবার অধিকার দাবী করি। এ দাবী আমি করিতেছি ফ্রান্সের নামে। এ দাবী আমি জানাইতেছি সুবিচার ও শুভবুদ্ধির নামে। বাক্যের স্বাধীনতাকে যে-শক্তি কণ্ঠরোধ করিতে চাহে, সে শক্তি আপনার নির্বুদ্ধিতা ও পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় মাত্র। যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা শত্রুপক্ষের সমালোচনা ও নিন্দা হইতেও কি করিয়া লাভবান হওয়া যায় তাহা জানেন। কারণ, শত্রু আগামীকাল সহযোগী হইয়া দাঁড়াইবে।

আনামের ছাত্র ও শ্রমিকগণ, আপনাদের দিকে আমি হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছি; আমাদের উভয়েরই শত্রু এক। এ শত্রু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও তাহারই অন্তরালে আত্মগোপনকারী হীন স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। "বৃহত্তর ইউরোপ ও বৃহত্তর এশিয়া আমাদের সহযোগিতা কামনা করিতেছে।"

আপনাদের বন্ধু ও ভ্রাতা,

আর. আর

আমেরিকার প্রতি

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ একটি বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে। বিরাট অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং যুদ্ধের জন্য দেশে দেশে যে বিপুল ধ্বংস তাহাই তাহার কারণ। নিঃস্ব ইউরোপের সর্বাঙ্গ হইতে আজ অবিশ্রাম রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তাই আজ শ্বেতসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইচ্ছা না থাকিলেও সে আজ মানবসমাজের একটি অংশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য। এই প্রবেশের অধিকার যেমন তাহার জন্মিয়াছে তেমনি জন্মিয়াছে অধিকারের চেয়েও বড় জিনিস—কর্তব্য। এই কর্তব্যের আহ্বানে তাহার মন, বিবেক ও বুদ্ধি কী ভাবে সাড়া দিবে, তাহার উপর পৃথিবীর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। আমেরিকার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাহার চরিত্রগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া যে ভয় আমার মনে জাগিয়াছে, বিদেশীয় দুঃসাহস লইয়া তাহা আমাকে বলিতেই হইবে।

আমেরিকার গর্বিত বলিষ্ঠ মানব প্রকৃতির মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্থান নাই। যাহা তাহার ভালো লাগে তাহার সবটুকুই ভাল লাগে; যাহা সে বিশ্বাস করে তাহা সর্বান্তকরণেই বিশ্বাস করে। তাহার প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেমন কোনো ফাঁকি নাই, তেমনি একবার বাঁকিয়া বসিলে তাহাকে ফিরানো অসম্ভব। অন্যজাতির মানসপ্রকৃতিকে বুঝিবার ক্ষমতা তাহার একেবারেই নাই। অন্য জাতির মনস্তত্ত্ব তাহার নিকট দুর্বোধ্য। তাহাদের মন, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের চাওয়া পাওয়ার স্বরূপ সে

কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার নিজের পক্ষে যাহা সত্য, যাহা কল্যাণের, পৃথিবীর অপর জাতির পক্ষেও তাহা সত্য ও কল্যাণের এই ধারণাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছে। যদি অন্য জাতিগুলি তাহার চোখে জগৎ দেখিতে না পারে তবে সে দোষ তাহাদেরই এবং নিজেদের পৃথিবীর স্বার্থে তাহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার তাহার আছে। এই ধরনের চিন্তার মধ্য দিয়াই মানুষের মধ্যে পৃথিবীজয়ের বাসনা জাগিয়া ওঠে। লোভ ও প্রভুত্বের সহজাত প্রবৃত্তির সহিত সংকীর্ণ নীতিবাদ মিলিয়া যে ছদ্ম আবরণ রচনা করে, তাহাই আড়াল করিয়া বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন গড়িয়া ওঠে।

ইহার চেয়ে বিপদজনক আর কিছু হইতে পারে না। জগতে যুক্তরাষ্ট্রের যত বেশি কাজ করিবার আহ্বান আসিবে তত বেশি করিয়াই তাহাকে জগতের অন্যান্য জাতির সত্যকারের প্রকৃতি, প্রয়োজন ও ভাবাদর্শের সহিত পরিচিত হইবার দায়িত্ব বাড়িবে ; কারণ, দুর্বলকে তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে যাইতে বলপূর্বক বাধ্য না করিয়া তাহাকে আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলাই শক্তিমানের কর্তব্য। যদি একটি জাতি বা একটি রাষ্ট্র, সে যত সহজে হউক না কেন, এই বিচিত্র সুন্দর পৃথিবীর উপর তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যহীন সাম্যের রূপ চাপাইয়া দেয় তবে সর্বমানবের পক্ষে তাহা এক দারুণ বিপর্যয়ের কথা। এ-বিপর্যয়ের হাত হইতে ঐ জাতি ও ঐ রাষ্ট্র নিজেও অব্যাহতি পাইবে না। কারণ, নির্যাতিতের মধ্যকার দুর্দমনীয় শক্তি একদিন প্রভুজাতির উপর প্রতিশোধ লইবেই। ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে আমেরিকার বাহিরে নহে, আমেরিকার অভ্যন্তরেই আজ নির্ভীক ও দূরদৃষ্টিবান এমন নাগরিকের প্রয়োজন যাহারা জাতির চোখে আদর্শ পুরুষরূপে প্রতিভাত হইয়া জাতিকে তাহার স্বরূপ চিনাইতে পারেন, দেখাইতে পারেন কোথায় তাহার মহত্ত্ব, কোথায় তাহার দুর্বলতা, কোথায় তাহার উৎকর্ষ,

কোথায়ই বা বিচ্যুতি; কী তাহাদের নাই, আছে অন্য জাতির, যাহা গ্রহণ করিয়া সে নিজে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

আইনের অস্ত্রে সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তির হত্যা সম্পর্কে মার্কিন বন্ধুকে লিখিত পত্র

২৪শে অগাস্ট, ১৯২৭

আইনের ফাঁস পরাইয়া সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তিকে যে-ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহাতে অভিভূত হইয়া আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আপনিও যে আমার মতোই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তথাপি আমার মনের কথা এই ভাবিয়াই আজ জানাইতে চাই যে আপনার নিজের দেশে হয়তো তাহা কিছু কাজে আসিতে পারে। আমার কথার কিছু মূল্য হয়তো থাকিতে পারে; কারণ, রাজনৈতিক দলগুলি হইতে দীর্ঘদিন নিজেকে দূরে রাখিয়া আমি বর্তমানের সাময়িক উন্মাদনার প্রভাব হইতে মুক্ত মনে চিন্তা করিবার অভ্যাস অর্জন করিয়াছি। আইনের তকমা-আঁটা হত্যাকারীরা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরিয়া নিঃশব্দ মন্থর নির্যাতনে বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত শোষণ করিয়া যে দুই হতভাগ্যের জীবনাবসান ঘটাইল গত সন্ধ্যায় তাহাদের মৃত্যুই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সবচেয়ে সাংঘাতিক দিক নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বহির্বিশ্বের জনগণের মধ্যে এই মহাপাপ আজ যে অতলস্পর্শ গহ্বরের সৃষ্টি করিল সমস্ত ট্র্যাজেডির সেইটাই সবচেয়ে দারুণ দুর্ঘটনা।

এই দুই অপরাধীর অপরাধহীনতা যদি কোনোদিন প্রমাণিত ও প্রচারিত হয় তবে সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সরকারী সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই; তথাপি সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তির অপরাধের প্রশ্ন আজ গৌণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অপরাধী কি নিরপরাধ এ-প্রশ্ন আজ লোকের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। লোকের চোখে আজ তাহারা

এমন দুটি দুর্ভাগা মানুষ যাহারা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এমন এক অতি সূক্ষ্ম, অতি সভ্য নিষ্ঠুরতার নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে যাহা জগতের সবচেয়ে বর্বর জাতির চোখেও কাপুরুষতা ও অমানুষিকতার চরম অভিব্যক্তি। একটি সহজ সমাধানের দাবী জানানো হইয়াছিল—করুণা। মানুষের সহনশীলতার শেষ সীমা পর্যন্ত নিপীড়ন সহ্য করিয়া তাহারা তাহাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। এই দুই হতভাগ্যের ভগ্ন পঞ্জরের মধ্য হইতে শেষ নিশ্বাসটুকু টানিয়া বাহির করা পর্যন্ত যাহাদের শান্তি হয় নাই তাহাদের বর্বরতার পরিমাপ করিব কি দিয়া।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে এত বর্বর থাকিতে পারে তাহা আমি জানিতাম, এবং জানিতাম বলিয়াই এই বর্বরতায় মোটেই বিস্মিত হই নাই। আমরা এ-দেশে ড্রেইফ্যুস্ কলঙ্কের মধ্যে এই একই বর্বরতার প্রমাণ পাইয়াছি। সামরিক কি অসামরিক মহা মহা বিচারকেরা সকলেই এই দলের। একবার বিচারের বাণী উচ্চারিত হইবার পর সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলেও তাহারা কিছুতেই ভুল স্বীকার করেন না। এক নিষ্ঠুর, নির্বোধ, নিশ্চল দানবীয় দম্ভে চোয়ালে চোয়াল চাপিয়া নিজেদের ভুল তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। যদি নরক বলিয়া কিছু থাকে তবে সেখানকার সবচেয়ে উঁচু আসন যেন এই দাম্ভিকদের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু যে-পাপ ইহারা করিতেছে সে-পাপ ইহাদেরই। তাহাদের জাতি ও সম্প্রদায় এই পাপে সংশ্লিষ্ট নহে। জাতির কর্তব্য এই পাপ হইতে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত রাখা। ড্রেইফ্যুস্ কলঙ্ক হইতে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ অংশ এইভাবেই নিজেকে বাঁচাইয়াছিল। বহু বৎসরের সংগ্রাম ও দুঃখভোগের পর অত্যাচারীর কবল হইতে এই ফ্রান্সই অত্যাচারিতদের ছিনাইয়া লইয়াছিল। সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তির মুক্তি ও প্রাণরক্ষার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সেই কাজই তাহারা করিয়াছে।

সফল হইতে তাহারা পারে নাই বটে, কিন্তু কৃতিত্ব তাহাদের কম নহে।

কিন্তু মার্কিন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারেন এমন একজন পদস্থ সরকারী ব্যক্তিও মানবতার নামে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না: জগতের চোখে এই কলঙ্কময় নাটকের ইহাই সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তিকে যখন হত্যা করা হইতেছিল ঠিক সেই সময়টাই কুলিজ তাহার এক সপ্তাহের বাৎসরিক ছুটি লওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলেন (তাহাকে বিরক্ত করিবার চিন্তাও যেন কাহারও মনে না আসে!) যে দুটি লোককে শুধু মাত্র হত্যা করা হইতেছিল টাফ্‌ট তাহাদের জন্য কষ্ট করিয়া আর ক্যানাডা হইতে ফিরিতে চাহিলেন না। বোরার চরিত্রবলের কথা বহুদিনই শুনিয়া আসিতেছিলাম। তিনি বলিলেন (যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়) এই দুইটি লোক সম্পর্কে যে সমস্যা তাহা সুবিচারের সমস্যা নহে, বিদেশ হইতে যে উদ্ধত চীৎকার আসিতেছে তাহার জবাব দেওয়াই আসল সমস্যা।

এইভাবে জাতীয় দম্ভের অশ্লীল প্রকৃতি মানবতাকে পদদলিত করিল।

আমরা জানি বিদেশীদের মুখ হইতে উপদেশ ও বক্তৃতা শুনিতে কোনো জাতিরই ভালো লাগে না। আমরা ইহাও জানি—শুধু জানি না ইহার জন্য দুঃখিতও যে, বহুস্থানে জনসাধারণের ক্ষোভ ও বেদনা বিদেশে হিংসাত্মক কার্য এবং ভীতি ও অসম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু মার্কিনবাসী আপনারা এ-কথা সকলেই ভালোভাবে জানেন যে আইনের ছদ্মবেশে আমেরিকা আজ যে অপরাধ করিল তাহাতে ইউরোপে যাহারা সবচেয়ে ব্যথিত হইয়াছেন তাহারা হিংসা-পথের পথিক নহেন। তাহারা মধ্যপন্থী, তাহাদের মধ্যে লিবারেলরা আছেন, ক্রিশ্চিয়ানরা

আছেন, আছেন ইউরোপের ধীর, শান্ত, সুবিবেচক সকলেই। যে-সকল প্রতিবাদ আপনাদের কাছে আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই আসিয়াছে আমেরিকার ঐকান্তিক সুহৃদদের নিকট হইতে। যে মহান জাতিকে এতদিন তাহারা ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন, যখন দেখিলেন তাহার সুনাম এত বড় এক অপরাধ কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছে, যখন দেখিলেন যে-জাতিকে লইয়া তাহারা মনোমন্দিরে এক বিরাট আদর্শের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে, তখন বেদনাবিদীর্ণ কণ্ঠে তাহারা আপনাদের নিকট আর্ত প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

যে-গভর্ণমেণ্টের শক্তি আছে, হৃদয় আছে, মহানুভবতা আছে সে নিজের ও জগতের কল্যাণে বাহিরের ভীতিপ্রদর্শনে কর্ণপাত করে না; কিন্তু শুভাকাঙ্খী বন্ধুদের অনুরোধ ও উপদেশকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া নিজের উদ্যোগেই এই দুই দুর্ভাগাকে তাহার মুক্তি দেওয়া,বা প্রাণদণ্ডের স্থানে যাবজ্জীবনকারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা, উচিত ছিল। যদি সে ইহা করিত তবেই জাতীয় দুর্ঘটনার পর্যায়ের একটা সাংঘাতিক ভুলের বিপদ হইতে আত্মরক্ষার সংস্থান করিতে পারিত।

মার্কিন গভর্ণমেণ্টের পদস্থ অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের এই চরম হৃদয়হীনতায় সমগ্র জগত ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রশ্নটিকে তাহারা এইভাবে উপেক্ষা করিল সে প্রশ্ন তো সুবিচারের প্রশ্ন নহে। সে প্রশ্ন সহজ সাধারণ মানবতার প্রশ্ন। ইহাই যে আমেরিকার প্রকৃত রূপ—গত দশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ একটি ধারণা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে; আমেরিকার উপর একটা বিদ্বেষ সমস্ত জাতির মনে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। এই তরঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছি, আমরা জানিতাম আমাদের মতো আপনাদের মধ্যেও রহিয়াছে দুইটি প্রকৃতি, দুইটি আমেরিকা। আমরা মহত্তর আমেরিকার উপরই ভরসা রাখিয়াছিলাম।

ড্রেইফ্যুস্ কলঙ্ক যেমন শুধু ফ্রান্সের কলঙ্ক নহে, আপনাদের এ-কলঙ্কও তেমনি শুধু আমেরিকার নহে; এ কলঙ্ক, এ ট্রাজেডি সমস্ত জগতের। দেখা গেল আমেরিকার যে-অংশ নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুর তাহার প্রবলতা অপরাজেয়, তাহার আধিপত্য সর্বগ্রাসী, দূর হইতে মনে হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত নাই। এই আমেরিকার হৃদয় নাই, মানবতার আবেদনের কোনো সাড়া তাহার মধ্যে জাগে না। সে শুধু জানে আইন, বর্বর দানবীয় আইন, এ-আইনের শাসনে দণ্ডদাতা প্রথম বিচারকের উপরেই পুনর্বিচারের ভার পড়ে, কপটতার সহিত হৃদয়হীনতাকে সংযুক্ত করিয়া এ-আইন বিচারকে প্রহসনে পরিণত করে।

কিন্তু আজ কর্তব্য কি? ব্যবধানের প্রাচীর উঠিয়াছে। ইউরোপের জাতিসমূহের প্রকৃতি আমি ভালোভাবেই জানি; যে-যন্ত্রণায় আজ তাহাদের বুক ভাঙিয়া যাইতেছে তাহার সন্ধানও আমি রাখি। দেখিতেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের আজ হইতে এক নৈতিক সংগ্রাম শুরু হইল। ছয় বৎসরই হোক, বিশ বৎসরই হোক, পঞ্চাশ বৎসর অথবা এক শতাব্দীই হোক, বাস্তব অবস্থার মধ্যে এ-সংগ্রাম একদিন রূপ পরিগ্রহ করিবেই। কারণ বিশ্বের বিবেকে আজ আঘাত লাগিয়াছে। আর যতদিন পর্যন্ত এ-আঘাতের প্রায়শ্চিত্ত না হয় ততদিন বিশ্বের বিবেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি আঘাতের কথা লেখা থাকে ইতিহাসের খাতায়।

এই হত্যার ফলে নিঃস্ব নগণ্য দুইজন ইতালীয়ানের * সভ্যজগতের

---

* ইহারা নগণ্য নহে। আমি ইহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই চিঠি যখন লিখি তখন তাহাদের নৈতিকশক্তির কথা আমি বেশি জানিতাম না। পরে তাহাদের চমৎকার পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ায় উহা জানিতে পারিয়াছি।

আর. আর

শহীদের মধ্যে আসন পাকা হইয়া গেল। কালাস ও সিবুভেনের নামের মতো সাকো ও ভান্‌ৎসেত্তির নামও লোকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উচ্চারণ করিবে। কিন্তু সাকো ও ভান্‌ৎসেত্তির জন্য আমেরিকার কোনো ভল্‌তেয়র দেখা দিল না।

আমি আমেরিকান নই, কিন্তু আমেরিকাকে আমি ভালোবাসি। আইনের নিরাপদ আশ্রয়ে অপরাধ করিয়া পৃথিবীর চোখে আমেরিকাকে যাহারা হেয় করিয়াছে, আমেরিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে আমি তাহাদের অভিযুক্ত করিতেছি। বিচারের জঘন্য প্রহসনের দ্বারা মানুষের পবিত্রতম অধিকারকে তাহারা ধ্বংস করিয়াছে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সমর্থনে

বালমঁ! বুনিন! আপনাদের বেদনা, তোমাদের তিক্ততা আমি বুঝি, অনুভব করি। যে-জগতকে মানুষ ভালোবাসিয়াছে যখন দেখে সে-জগত চিরদিনের মতো ধুলায় মিশিয়া যাইতেছে, নিরানন্দ নির্বান্ধব নির্বাসনে যখন চারিপাশে স্বার্থপর ঔদাসীন্য অথবা অনাত্মীয়ের অনুভূতিহীন করুণা ছাড়া আর কিছুই তাহার চোখে পড়ে না, যখন দেখে তাহার দুঃখের কাহিনীতে বিরক্ত হইয়া সকলেই মুখ ফিরাইয়া আবার নিজের কাজে মন দিতেছে, তখনকার চেয়ে বড় দুঃখ তার আর কি হইতে পারে? গত অক্টোবর মাসে বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে রুশজনগণের উদ্দেশে আমি এক বাণী প্রেরণ করি। এই উৎসব আপনাদের কাছে এক বিগত যুগের মৃত্যুর ঘোষণার মতো। তাই আমার এ-বাণীতে আপনারা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছেন। এই বাণীতে আপনাদের মনে আমার প্রতি যদি ঘৃণাও জাগিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইব না; আর যদি কোনো বিদ্বেষের ভাব আপনাদের চিঠিতে ফুটিয়া না উঠিয়া থাকে তবে সত্যই আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও বুঝিব এ-মহানুভবতার

মূলে রহিয়াছে আপনাদের অটুট মনোবল; আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া যাইবে। আমার জবাব আপনাদের আঘাত করিতে পারে জানিয়াও, আশা করি, এই মনোবল লইয়াই ধীরচিত্তে আপনারা আজ আমার কথাগুলি শুনিবেন। না, আমি কখনও ভুলি নাই যে বিপ্লবের দশটি বৎসরে রাশিয়া অনেক কিছু খোয়াইয়াছে। তার পর্বত-প্রমাণ দুর্গতির পরিমাণ আমি জানি। এ ক্ষতির কথা ভাবিতে বসিলে প্রায়ই আমি অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু বিপ্লবের রাশিয়ার সহিত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির যে দ্বৈরথ-সংঘর্ষ আজ শুরু হইয়াছে তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি আর ইতস্তত করিতে পারি না। বালমঁ, বুনিন, নির্বাসিত রুশ সম্প্রদায়ের মধ্যমণিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আপনারা মানব মহত্ত্বের যে প্রতীকই হউক না কেন আপনাদের স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আপনারা দেখিতে পাইতেছেন ইউরোপ হইতে যাহারা আসিয়া আপনাদের সহিত হাত মিলাইতেছে তাহাদের আদর্শ ও আপনাদের আদর্শ এক নহে। আপনাদের নূতন বন্ধুর দল আসিতেছে বুর্জোয়া নৈতিক ব্যবস্থার ও বণিকসাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়ার স্তর হইতে। আপনারা তাহাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে, যে-রাশিয়াকে আপনারা ভালোবাসেন তাহার হাতে পায়ে আবার দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া জগতের অন্যান্য দুর্বল ও প্রতিরোধঅক্ষম জাতিগুলির মতো তাহাকে শোষণ করাই ইহাদের সোবিয়েৎ বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ। নূতন ও পুরাতন মহাদেশের যে সকল রাজনৈতিক তস্কর শাশ্বত নীতি ও আদর্শের নামে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অথবা গোপনচুক্তির বৈঠকে পৃথিবী লুণ্ঠনের বাঁটোয়ারা লইয়া আলোচনা বা কলহ করিতেছে তাহাদের প্রচারিত আদর্শবাদের পশ্চাতে যে কী গূঢ় অভিসন্ধি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে আমাদের ও আপনাদের কাহারও তো বাকী নাই। আর ওদিকে রাশিয়ায় দেখিতেছি অবর্ণনীয়

দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যে দাড়াইয়া একটা জাতি কী ভাবে এক নূতন ব্যবস্থার জন্ম দিতেছে। মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যবিচ্ছিন্ন মানবশিশুর মতোই এই নূতন ব্যবস্থার সর্বাঙ্গে রক্ত ও ক্লেদ। বিরক্তিতে মন ভরিয়া যায়, ভয়ে শিহরিয়া উঠি, গভীর বিচ্যুতি ও ভীষণ অপরাধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি— তথাপি থাকিতে পারি না। ছুটিয়া যাই সেই নবজাতকের পাশে। দুহাতে তুলিয়া লই তাহাকে বুকের কাছে। সে-যে আশা, সে-যে মানুষের ভবিষ্যতের বড় দীন বড় দুর্বল আশা। বালম্‌, বুনিন! এ শিশু তোমাদেরই। তোমরা দূরে ঠেলিয়া দিলেও ইহার মধ্যে তোমাদের রক্ত রহিয়াছে। তোমরা অস্বীকার করিলেও এই শিশুই বড় হইয়া একদিন নিজের মধ্যে তোমাদেরই প্রতিচ্ছবি দেখিবে। কিন্তু আজ তোমাদের ও তাহার মধ্যে একটা রক্তের পরিখার, একটা অতল-স্পর্শ গহ্বরের ব্যবধান। সে ও তোমরা আজ পরস্পরকে অস্বীকার করিতেছ। এই নূতন ব্যবস্থার কিছুই তোমরা জানিতে চাহ না। যে পরিবেশের মধ্যে তোমরা আবদ্ধ সেখান হইতে এ দেখা ও জানা সম্ভব নহে। আপনারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এ-ব্যবস্থার আমি কী জানি ও কেমন করিয়া জানি। আমি যাহা জানিয়াছি—তাহা সংবাদপত্র পড়িয়া নহে। কাগজ যে দলেরই হউক না কেন—সকলের সংবাদই পক্ষপাতদুষ্ট। আমি কোনো দলে নই। আপনারা কি জানেন না যে রাশিয়া বহির্জগতের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পর্যটকদের আনাগোনার আর বিরাম নাই? যদিও আমার ছোট বাড়িটি যেখানে অবস্থিত সেখানে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা তথাপি এমন একটি মাস যায় না যে মাসে বিনা আমন্ত্রণেই এই প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন না একজন আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে ফরাসী আছেন, ইংরাজ আছেন, জার্মান আছেন, আমেরিকান আছেন। সমস্ত জাতি ও মতবাদেরই লোক আছেন; আছেন অধ্যাপক, লেখক, চিকিৎসক প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসায়েরই লোক।

ইহাদের তিনভাগের দুইভাগ লোকেরই কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি কোনো অনুরক্তি নাই। অন্য সকলের মতো তাহারাও নিজেদের দ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা প্রতারিত হইতে পারেন না। কিন্তু তাহারা সকলেই কপটতা, কুসংস্কার হইতে মুক্ত। কাহারও আছে উচ্চ আদর্শ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। যেমন, দ্যুয়ামেল, দ্যুরতঁ্যা, ইস্টমান, স্কটনিয়ারিং, গুইজো মিল্লিওলি, হায়া দেল্লা তোরে। যতই স্বাধীন ভাবে তাহারা বিচার ও সমালোচনা করুন না কেন তাহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি প্রাথমিক পুনর্গঠন ও প্রবল নবজাগবণের রূপ ও প্রকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হন নাই। তাহাদের কথা আমি শুনি, লিখিয়া লই, তুলনা করি। তুলমূল বিচার করিয়া দেখি। যে সকল ভ্রমণকারী দুদিন ঘুরিয়াই ফিরিয়া আসেন, রাস্তার ঘটনা ও দৃশ্যের বাহিরে তলাইয়া দেখিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, সাধারণত তাহাদের ধারণাকে আমি গণনার মধ্যে আনি না। অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক শিক্ষাব্রতী প্রমুখ যে সকল ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ প্রতীকচিহ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ পড়িতে অভ্যস্ত তাহাদের কথাই আমি বেশি করিয়া শুনি, সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞদের এই মিলনের ফলেই দেশের ব্যবধান উপেক্ষা মাত্র করিয়া আধখানা কথার মধ্যে দিয়াই তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে পারে। বালমঁ, বুনিন! এই প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আপনাদের স্বদেশবাসীও আছেন। তাহারা দেশ ছাড়েন নাই এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের ভক্ত। আপনারা কি জানেন না যে, বলশেভিকদের সহিত মতবিরোধ সত্ত্বেও বহু রুশপণ্ডিত মস্কো ও লেনিনগ্রাদের হাসপাতালে ও গবেষণাগারে কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই মতবিরোধের কথা সকলেই জানে। তাহারাও অস্বীকার করেন না। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক কাজে পশ্চিমে আসেন, তিনি রাশিয়ায় ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন; বলেন তাহাদের কাজের সুবিধা সেইখানেই সব চেয়ে

বেশি। 'ইউরোপ' পত্রিকায় সম্প্রতি ল্যুক দ্যুরতাঁ্যা র কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, দ্যুরতাঁ্যা-র বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর কোনো দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে। এই প্রবন্ধগুলি পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে ফ্রান্সের বিজ্ঞানসাধকেরা যখন সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে নৈরাশ্য ও অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন তখন রাশিয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কর্মোন্মাদনার কী প্রবল জোয়ারই না আসিয়াছে। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রই বা কতভাবেই না তাহাদের গবেষণাকার্যে সাহায্য করিতেছে! আপনারা কি জানেন না বিজ্ঞান সেখানকার নূতন দেবতা? মার্শেলিন বার্থেল-এর যন্ত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া একদিন আমাদেব যে অসীম আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই আশাই বিজ্ঞানপূজারী রাশিয়ার বুকে। জানি অন্যসকল দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক মতবাদ সম্পর্কে একথা খাটে না। তথাপি অনভিজ্ঞ হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সেখানে এক প্রতিভাশালী তরুণ লেখকদলের সৃষ্টি হইয়াছে, আজ সেখানে তাহাদের অধ্যয়ন ও রচনার পরিমাণ ফ্রান্সকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। জানি সেখানে সেন্সর-ব্যবস্থা স্বাধীন রচনাকে পদে পদে ব্যাহত করে। এবং একবার নহে দশবার আমি ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। ইউরোপ পত্রিকার ১৫ই অক্টোবরের সংখ্যা যদি আপনারা খুলিয়া দেখেন তবে দেখিবেন লিবেরতেয়র পত্রিকায় লিখিত এক পত্রে ও লুনাচারস্কির নিকট লিখিত আরেকখানি পত্রে আমি লাল, সাদা ও কালো সর্বপ্রকার অত্যাচারীর বিরুদ্ধে চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতাকে কি অটল দৃঢ়তায় সমর্থন করিয়াছি। কণ্ঠরোধকারীদের বর্ণবিচার আমি করি না। কিন্তু বালমঁ! আমাদের কাছে সেন্সর-প্রথার কথা বলা মার নিকট মাসিমার গল্প বলা। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে নিজ দেশে আমায় বন্ধ করিয়াই এই প্রথা ক্ষান্ত হয় নাই। আমার বন্ধুদের নিকট হইতে আমার পক্ষসমর্থনের অধিকার হরণ করিয়া আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অবাধ সুবিধা এই

প্রথাই করিয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপে আজ দুর্দিনের জন্য হয় তো সে একটু অবসর লইয়াছে, কিন্তু অধীর হইবেন না, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। সেক্ষর প্রথায় সোবিয়েৎ রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিকার নহে। রাশিয়ার পক্ষ হইতে এ ধরনের দাবী করিলে হয়তো নিস্তব্ধ ইতালীর বুকে প্রহরায় দণ্ডায়মান ডুচে-র আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।......এই নিষ্ফল আলোচনা এখানেই শেষ হোক। আজ সর্বত্রই চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন; যে পারিতেছে সেই তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিতেছে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে যে যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে, তাহার প্রথম আঘাত নামিবে স্বাধীন চিন্তাজীবী আমাদেরই উপর। আমাদের রুশ সহযাত্রীরা যে আজ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই চলিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাদের ভাগ্যে বিস্মিত হই নাই। সাহিত্যিক সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন আমরা করিব বটে কিন্তু সেই সাথে এই মিথ্যা দম্ভও আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে যে আমাদের নিজেদের স্বার্থ ও সমগ্র সমাজের স্বার্থ এক নহে। আপনাদের রাশিয়ার জনসাধারণের শতকরা নব্বুই জন কৃষক মজুর। বুনিন আপনি নিজে এবং আপনার পূর্বে অনেক রুশ লেখকই তো আমাদের চোখের সম্মুখে রুশজীবনের প্রকৃত রূপ খুলিয়া ধরিয়াছেন। আপনাদের আঁকা ছবিতেও দেখিয়াছি: রাশিয়ার জনসাধারণের জীবন বিষবাষ্পাচ্ছন্ন বদ্ধজলার মত—দেহে মনে মন্থর মৃত্যুর অভিশাপ বহন করিয়া সে যেন দুর্দিনের শেষ ধাপটি কোনো-মতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু আপনাদের বেদনার্ত হৃদয়ের এই করুণায় তাহাদের মুক্তির পথ এতটুকুও তো সুগম হয় নাই। আজ হয় তো জানিয়া থাকিবেন অপনার সেই বদ্ধজলার এখন কি অবস্থা! গুইদো মিল্লিওলি লিখিত 'সোবিয়েৎ গ্রাম' নামক পুস্তকখানি পড়ুন। এ বই এমন একজন লোকের পাকা দলিলের সাক্ষ্য যাহার রাশিয়া ও কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরক্তি নাই। ইনি ইতালীর

প্রতিনিধি পরিষদের একজন সভ্য। ক্যাথলিক ও উদারনৈতিক সাম্যবাদের বিপরীত প্রান্তে তাহার স্থান কিন্তু কৃষককুলে তাহার জন্ম। শৈশবকাল হইতেই কৃষকদের অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত বলিয়াই তিনি রুশ কৃষকদের অবস্থা জানিবার জন্য রাশিয়ায় যান। তিনি দুইবার রাশিয়ায় যান এবং এক বছর থাকিয়া ইউরোপীয় রাশিয়ার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। এই অনুসন্ধানের ফল আপনাদের চোখের সম্মুখেই, তাহার সহিত বোঝাপড়া করুন।

তাহার কথা যদি সত্য হয়, যদি সত্যই রাশিয়ায় এমন এক নূতন কৃষক-শ্রেণী দেখা দিয়া থাকে যে বহুযুগ সঞ্চিত জড়তার নাগপাশ ছিন্ন করিয়াছে, যে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞানের শিক্ষাকে যে কাজে লাগাইতে শিখাইয়াছে এবং যে নিজের সহিত জাগাইয়া তুলিয়াছে রাশিয়ার মাটিকে—যদি সত্যই এমন এক নূতন ধরনের কৃষক সংগঠন সেখানে গড়িয়া উঠিয়া থাকে, সমষ্টিকল্যাণের প্রবল বাসনা ও আত্মশক্তি সম্পর্কে যথাযথ চেতনাই যাহার প্রেরণার উৎস, তবে বিপ্লবের পায়ে সাময়িকভাবে উৎসৃষ্ট বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দুর্দশা বিপ্লবের এমন কিছুই বেশি মূল্য নহে। একা মিল্লিওলি-ই ইহা দেখেন নাই। গত অক্টোবর মাসে মস্কোতে যে নিখিল রুশ কৃষক সম্মেলন হয় তাহাতে সমস্ত দলের বৈদেশিক দর্শকদের মধ্যেই যে কি উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহা আপনি ধারণা করিতে পারিবেন না। বিশাল সোবিয়েৎ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অঞ্চল হইতে, সুদূর প্রাচ্য ও মুসলমান অঞ্চল হইতে, হাজার হাজার নারী এই সম্মেলনে যোগ দেন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে জাতির মানসক্ষেত্রে ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে কী প্রচণ্ড প্রগতি সাধিত হইয়াছে এই সম্মেলন হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আপনাদের জাতির মধ্যে এ সকল জাতি সুস্থ ছিল। ইহারা সোবিয়েৎ-গুলির সৃষ্টি নহে সোবিয়েৎগুলির প্রেরণাতেই ইহারা বিপুল প্রাণাবেগে

জাগিয়াছে। আপনাদের ভলগার মতোই প্রচণ্ড ও বিশাল প্রাণধারা—যে-ধারার একটি স্রোত আপনার প্রতিভা—সেই প্রাণধারার সম্মুখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতে কি আপনার অপমান বোধ হয়? আপনারা শিশুদের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা জারশাসনের উত্তরাধিকার এবং প্রায় সাত বৎসরব্যাপী বিদেশী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পরিণাম। এই যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শুধু গ্রামের পর গ্রাম নহে, জেলার পর জেলা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আপনাদের চোখে পড়িয়াছে শুধু সেই গৃহহীন শিশুর পাল, বিপ্লবের পূর্বে দেশের নানা বিপর্যয় যাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে এবং বিপ্লবের কয়েক বৎসরের মারাত্মক সঙ্কটও যাহাদের পিষিয়া গিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য যে সকল প্রয়াস সেখানে শুরু হইয়াছে—জার্মানির, সুইজারল্যাণ্ডের, এমন কি, যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত যাহা লক্ষ করিতেছেন আপনারা তাহার খবর রাখেন না। আমাদের দিক হইতে শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, জীবনমরণ বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াই সোবিয়েৎ রাশিয়া যে, রাষ্ট্রের ব্যয়-বরাদ্দের এক পঞ্চমাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেছে এবং দেশের সর্বত্র, এমন কি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি শ্রমিক-কেন্দ্রে, স্কুল ও লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছে—এ ঘটনার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া। অনেকে রাশিয়ার যৌন-ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত দিয়া আনন্দ পান। সেখানে কতকগুলি দুঃসাহসী আইনের বলে নরনারীর সম্পর্কের প্রাচীন ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই আইনের সুযোগ লইয়া কিছু যৌন-ব্যাভিচারও দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ-আইনগুলির উদ্দেশ্য শিশুকে রক্ষা করা। নরনারীর সম্মেলনের রূপ যাহাই হউক না কেন—শিশু পবিত্র। আর সোবিয়েৎ সমস্ত শিশুর সমানাধিকার স্বীকার করিয়াছে। ফল হয় তো অনেক সময় উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় না। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া হয় তো অনেক সময় সংস্কারের প্রয়োগ ও

পদ্ধতির উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে-সীমাহীন বিশৃঙ্খলা রাশিয়ার বুকে রাজত্ব করিয়াছে তাহার ফলে জনশিক্ষা, নীতিবোধ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সব কিছুই নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে, তার উপর গত দশ বৎসরের মধ্যে সোবিয়েৎ গণতন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ বাহিরাক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের জন্য বারবার আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমার যেসকল বন্ধু রাশিয়া পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে (দ্যুরতঁ্যা ও দ্যুয়ামেল-কে আমি সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করিতেছি) সকলেরই চোখে পড়িয়াছে শিশু ও কিশোরদের আনন্দ এবং তরুণদের স্বাস্থ্য ও হর্ষোচ্ছলতা। অন্যদের কমবেশি আহুতি দেওয়া হইয়াছে। যার বয়স চল্লিশ, গত দশ বৎসরের জীবন ধারণের সাংঘাতিক সমস্যায় সে আজ অকাল বার্ধক্যে অবসন্ন। সব কিছুই সেখানে ভবিষ্যতের জন্য, শিশুর জন্য পরিকল্পিত হইতেছে। আমি জানি আমার এ চিঠিতে আপনাদের মতের পরিবর্তন হইবে না। যে আঘাত আপনারা পাইতেছেন তাহার ক্ষত আপনাদের দেহে এত গভীর হইয়াছে যে, কোনো কিছুর ভালো দিকটা আর আপনাদের চোখে পড়িতেছে না। আপনাদের দুর্ভাগ্য যদি আমাকে ভোগ করিতে হইত, তবে আমিও আপনাদের মতোই হইতাম। যদি কখনও আমি একটি নির্দোষ মানুষকে শাস্তি ভোগ করিতে দেখি, তবে সে সমাজব্যবস্থা যতোই মহান হউক না কেন তাহার অপরাধ ভুলিতে কি ক্ষমা করিতে পারিব না। আপনাদের যুগের মতো একটি যুগের মানুষের সহিত আমি বহুদিন মানসজীবন যাপন করিয়াছি। বালমঁ! আপনাদের চিঠিতে আপনি আমাকে আমার থিয়েটার অব রেভলিউশনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহার রচনা আজও আমি বন্ধ করি নাই। যে সকল মহাপ্রাণকে বিপ্লবের আগুন আহুতি গ্রহণ করিয়াছে, নূতন রচনার জন্য আমাকে তাহাদের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হইবে।

শাঁফর, ব্রিভেরল, শেনিয়ে, লাভোয়াজিয়ে ও কঁদরসে-র বেদনা বিদ্বেষ ও শোকের অংশ আমি মনে মনে গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা কি মনে করেন শেনিয়ে-র মস্তক যদি আমার চোখের সামনে ছিন্ন হইত তবে কি সেই হত্যাকারী-রাষ্ট্রকে আমি অন্তরের সমস্ত ঘৃণা লইয়া আক্রমণ করিতাম না? আপনারা কি মনে করেন নির্বাসিত মহাপ্রাণদের নিহত জিরঁদ্যার ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করিতে লোভ হইত না? কিন্তু সেণ্ট জাস্ট ও রোবেসপিয়র-এর মতো হত্যাকারীদের দৌলতেই যে নূতন জগত গড়িয়া উঠিয়াছিল আজিকার ইউরোপের লিবারেলগণ তাহাতে গর্ব অনুভব করেন এবং যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদিগণ রুশবিপ্লবকে ঘৃণা করেন তাহারাই হাসিমুখে ফরাসী বিপ্লবের সুবিধা ভোগ করেন। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে মানুষের প্রগতি কিনিতে হয়। অথচ এই প্রগতি সৃষ্টির কাজে যাহাদের পরস্পরের সহযোগিতা করিবার কথা, এক মর্মান্তিক দৃষ্টিহীনতার ফলে তাহারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া মরে।

তথাপি মানুষের জগত আগাইয়া চলে। আজও সে আগাইয়া চলিয়াছে। চলিয়াছে আপনাদের উপর দিয়া, আমাদের উপর দিয়া।

আর. আর

রাশিয়ার নির্যাতন সম্পর্কে লিবেরতেয়র পত্রিকাতে লিখিত চিঠি

২৮শে মে, ১৯২৭

আপনারা যে-সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমি জানি না। যে-সকল সূত্রে উহা জানিতে পারি তাহাও যে কতখানি নির্ভরযোগ্য জানি না। তবে ঘটনাগুলি আমি অবিশ্বাস করি না। স্পেনবাসীদের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা আছে, 'দুঃসংবাদ সব সময়েই সত্য।' এতদূর অবশ্য আমি বলিতে চাহি না, তবে গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ-বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে প্রচণ্ড অস্থিরতা ও আলোড়নের যুগে রাজনীতিতে এমন অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া থাকে যাহা অন্য সময়ে কল্পনাতেও আসে না। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ফাশিস্ট কি কমিউনিস্ট যে ধরনের গভর্ণমেণ্টই হউক না কেন, ঠিক সেই সবই তাহারা করিতে শুরু করে যাহার জন্য একদিন বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাহারা আক্রমণ করিত; এবং এইভাবে তাহারা নিজেদের ও নিজেদের ভাবাদর্শকে ধ্বংস ও ব্যর্থতার পথে লইয়া যায়। ক্ষমতার এই অপব্যবহারকে আমি চিরদিনই আক্রমণ করিয়া আসিয়াছি, আজও আবার করিতেছি। বিশেষত দুঃখ বরণে ও আত্মত্যাগে অতীতে একদিন যাহারা সঙ্গী ছিল তাহাদের বিরুদ্ধেই এই আঘাত আরও ঘৃণ্য। তথাপি ইউরোপের সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, স্বাধীনতার সম্মুখে আজ সাংঘাতিক দুর্দিন উপস্থিত এবং এক দুরূহ

* সোবিয়েৎ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এনার্কিস্ট ও রেভলিউশনারী সোশালিস্টদের নির্যাতনের প্রতিবাদ ছাপাইবার জন্য লিবেরতেয়র পত্রিকা আপন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

দায়িত্বকে তাহাদের অবিলম্বে বরণ করিয়া লইতে হইবে। স্মরণ করাইয়া দিতে চাই একটি কথা—রাশিয়া বিপন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপে আজ পৃথিবীতে সোবিয়েৎ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিসমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে।

সমস্ত বিচ্যুতি, সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অদুরদর্শিতা সত্ত্বেও রুশ বিপ্লবের মতো এত বিরাট, এত শক্তিমান, এত সম্ভাবনাময় সামাজিক প্রয়াস বর্তমানে ইউরোপে আর হয় নাই। যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু পৃথিবীর সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি হইবে। এই পবিত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল্‌শেভিকরা নির্বোধের মত সংগ্রাম চালাইয়াছে বটে, কিন্তু এই স্বাধীনতাই তো বল্‌শেভিক রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু। নূতন রাশিয়া ধ্বংস হইয়া গেলে পৃথিবী কয়েক স্তর পিছাইয়া যাইবে। এবং এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ধনিকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী পরিচালিত এক দানবীয় যুদ্ধের নাগপাশে ইউরোপের সমস্ত জাতিগুলি ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতে থাকিবে।

অতএব, এই ভ্রাতৃঘাতী বিতর্কের আপাতত অবসান হোক। আমি আশা করি এনার্কিস্টদের, সোশাল রেভলিউশনারীদের ও অন্যান্য মতবিরোধী বন্ধুদের রুশগভর্ণমেণ্ট কারাগার হইতে মুক্তি দিবেন এবং তাহারাও শুভবুদ্ধি ও হৃদয়ের ঔদার্যের বলে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অতীতের শত্রুর পাশাপাশি আসিয়া দাড়াইবেন।

এই মিলনের কার্যে আমরা যেন সাহায্য করিতে পারি। শত্রু দ্বারে সমাগত। সাম্রাজ্যে-সাম্রাজ্যে যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ইউরোপের স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।

আর. আর

(১৯২৭ সালের ১৫ই অক্টোবর ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত)

লুনাচারস্কির সহিত পত্র-বিনিময়

রলাঁর নিকট লুনাচারস্কি

মস্কো, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

'বিপ্লব ও সংস্কৃতি' নামে আমরা একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রাভদার' সহিত একত্রে ইহার সম্পাদনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ যদি আপনি প্রথম সংখ্যাগুলির একটির জন্য লিখিতে পারেন তবে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। সম্পাদকদের মতের সহিত মূলনীতির পার্থক্য থাকিলেও ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। এই যে অনুরোধপত্র আপনাকে লিখিতেছি ইহা হইতেই আপনি বুঝিতে পারেন আমাদের সম্পাদকগণ আপনাকে কী গভীর শ্রদ্ধা করেন। আমাদের মতানৈক্য সত্ত্বেও আপনার সহযোগিতায় আমাদের জনগণ বিশেষ উপকৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লিবেরতেয়র পত্রিকার জবাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াই আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন এমন অনেক বুদ্ধিজীবীর দ্বিধাদুর্বলতা অপেক্ষা আপনার বাস্তবনিষ্ঠ অনাসক্ত বুদ্ধি কত বড়। এ-কথা অবশ্য আমি বলিতেছি না যে ঐ জবাবে যাহা কিছু আপনি লিখিয়াছেন সব কিছুর সাথেই আমার মতের মিল আছে; তবে আপনার জবাবের মূল রাজনৈতিক সুরটি ন্যায় ও নীতির দিক হইতে সত্যই গভীর ও মহান।

লুনাচারস্কি,
জন-শিক্ষা-সচিবের দপ্তর.

লুনাচারস্কির নিকট রলাঁ

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

প্রিয় লুনাচারস্কি,

আপনার চিঠি পাইয়াছি। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যদিও বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত আছি তাহাতে কোনো পত্রিকার সহিত নিয়মিতভাবে সহযোগিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত একমত হইয়া আমি আপনাদের পত্রিকায় লিখিতে প্রস্তুত আছি।

সর্বোপরি আমি একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাই। আন্তর্জাতিক বণিক স্বার্থের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির অবিশ্রাম প্ররোচনার ফলে বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজ যখন সমগ্র জগত জুড়িয়া একটা উদ্ধত জনমত সংহত হইয়া উঠিতেছে তখন স্বাধীন ফরাসী হিসাবে আমারও কর্তব্য আছে। যে প্রবঞ্চক প্রতিক্রিয়াশক্তি সারা ইউরোপের সমস্ত জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং রুশবিপ্লবের অস্বস্তিকর মশালকে নিবাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে আবার আমি আঘাত হানিতে চাই।

রুশ বিপ্লবের সহিত কোথায় যে আমার বিরোধ তাহা আমি কখনো গোপন করি নাই। যে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে এই বিপ্লব ধ্বংস করিতে চাহে বিপ্লবের মধ্যে তাহারই কতকগুলি নিকৃষ্টতম অভিব্যক্তিকে—মতবাদের সংকীর্ণতা ও একনায়কত্বের মনোবৃত্তিকে—আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমার এই বিতৃষ্ণা আমি গোপন করি নাই, রুশ বিপ্লবের হিংস্রতা ও দুমুখো নীতিকে প্রথম হইতেই আক্রমণ করিয়া

আসিতেছি। যাহারা প্রথম হইতেই এই বিপ্লবের মহত্ত্ব ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, আমি তাহাদেরই একজন। এ উপলব্ধি আমার কোনোদিনই ক্ষীণ হইবে না। আমার বিশ্বাস, রুশবিপ্লব সমগ্র মানবসমাজের শক্তিমান অগ্রগামী অংশ।

বিপ্লবের কল্যাণেই আমি বিপ্লবের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করিতে পারি নাই। যে-সকল সুসময়েরবন্ধু দুর্দিনের আভাস পাইবামাত্রই রুশ-বিপ্লবের পার্শ্ব হইতে পলাইয়া গিয়াছে, আমার বিশ্বাস তাহাদের চেয়ে আমার বন্ধুত্ব গভীর ও আন্তরিক। ইহার প্রমাণ আজ আপনারা পাইতেছেন। আপনাদের পার্টির পত্রিকায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য আজ আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।

যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে সুস্থ স্থায়ী কোনো রুশ প্রতিষ্ঠানের বিকাশলাভের পক্ষে স্বাধীন আলোচনা একান্ত অপরিহার্য, যদি বুঝিয়া থাকেন যে শুধু এই আলোচনার দ্বারাই কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জন-সাধারণের শিক্ষা হইতে পারে, তবেই আপনারা পৃথিবীর স্বাধীনচেতা মনস্বীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন। যে-সকল তেজোদ্দীপ্ত মনস্বী কোনো মতবাদকেই অন্ধভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন এবং দক্ষিণপন্থীদের হউক বা বামপন্থীদের হউক সর্বপ্রকারের ফাশিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যারা বদ্ধপরিকর তাহাদেরও পূর্ণ সমর্থন আপনারা পাইবেন। আজ পৃথিবীতে মিথ্যা ও পাশবিক নৃশংসতার অবাধ শাসন চলিয়াছে। ইহারই বিপুল বিরোধীশক্তিকে আপনারা যদি উজ্জীবিত করিতে না পারেন তবে জয়লাভের কোনো আশাই আপনাদের নাই। জ্ঞান ও স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা আপনারা তুলিয়া ধরুন; যত আঘাতই আসুক না কেন পৃথিবীতে পরিশেষে আপনারাই জয়ী হইবেন।

রম্যাঁ রলাঁ

অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে
ভক্স্‌-এর নিমন্ত্রণের উত্তরে লিখিত। (সোবিয়েৎ
ইউনিয়নের সহিত বহির্জগতের সাংস্কৃতি সম্পর্ক
স্থাপনের প্রতিষ্ঠানকে 'ভক্স্‌' বলা হয়।)

সোবিয়েৎবাসীদের প্রতি

১৪ই অক্টোবর, ১৯২৭

হে আমার রাশিয়ার ভ্রাতা ভগ্নিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, আপনাদের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম। কিন্তু স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব হইল না। দেহে না হউক, মনে আপনাদের সঙ্গে রহিলাম, আপনাদের সমস্ত কমরেডদের নিকট আমি আমার এই বাণী পাঠাইতেছি। জগত যখন তাহাকে স্বীকার করিতে চাহে নাই তখন হইতেই, তাহার দুর্দম সংগ্রামের সূচনাকাল হইতেই, রুশবিপ্লবকে ইউরোপে যাহারা অভিনন্দন জানাইয়া আসিতেছেন, আমি তাহাদেরই একজন। এই বিপ্লবের সহিত আমার মতবিরোধকে আমি আন্তরিকভাবে বারংবার ঘোষণা করিয়াছি বটে, তথাপি বিপ্লবের প্রতি আমার আসক্তিকে আমি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আজ যখন দেখিতেছি, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত ফাশিজম্‌, সর্বপ্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংবাদপত্র-জগত ও জনমতকে আপনাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছে, যখন দেখিতেছি এইসকল অকল্যাণের শক্তি স্বর্ণ-স্বার্থের ক্রীড়া-পুত্তলিকা দেশের গভর্ণমেণ্টগুলির উপর রুশবিপ্লব ধ্বংস করিবার জন্য চাপ দিয়া সফলকাম হইতেছে তখন পশ্চিম ইউরোপের যে সকল শিল্পী ও মনস্বীদের আমি বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি তাহাদের পক্ষ হইতে ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ঘোষণা করিতেছি।

জাতি ও পরিবেশের প্রভেদ যতই থাকুক না কেন আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি ও আপনারাও আমাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন বিচিত্র পথে আমরা একই লক্ষ্যপথে চলিয়াছি। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ যে আমাদের মিলন ঘটাইয়াছে তাহা নহে, আমরা মিলিত হইয়াছি কর্মের উন্মাদনায় ; এই কর্মের, এই শ্রমনারায়ণের আমরা সেবা করি ও পূজা করি। ইহাই পৃথিবীর রক্ত, ইহাই আমাদের নিশ্বাস-বায়ু, ইহাই জীবনের মূল শক্তি। ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা সকলেই সমান, সকলেই ভাই! সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ গণতন্ত্র সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে ইহারই রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাই কামনা করি ইহা যেন চিরজীবী হয়!

ভ্রাতৃগণ, আসুন আজ আমরা এমন দিনে বিশ্বপতি কর্মের স্তবগান করি। মনের শ্রমিক দেহের শ্রমিক সকলে মিলিয়া যেন সমগ্র সফল কর্মধারার মধ্য দিয়া শ্রমজীবীসমাজের এক বিরাট মধুচক্র রচনা করিতে পারি। আমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ মৌমাছি থাকিতে পারিবে না। এই মানুষ মৌমাছিদের বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র যেন তাহাদের পাখার সংগীতে ও মধুর সুরভিতে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে।

আর. আর

সমাজইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বার্ষিকী উপলক্ষে অভিনন্দন বাণী

৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৭

উনিশ শো সতেরো সালের ৭ই নভেম্বরকে আমি ফরাসী বিপ্লবের গৌরবময় দিনগুলির পর সমাজইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন বলিয়া মনে করি। ফরাসী বিপ্লব নূতন জগতকে প্রাচীন হইতে যতখানি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, বর্তমানকে অতীত হইতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন করিয়াছে মানুষের এই নূতন বিপুল পদক্ষেপ।

রুশ বিপ্লব যে অনেক ভুল ও অপরাধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।
কিন্তু সেজন্য তাহাকে তিরস্কার করিবার অধিকার ফরাসী বিপ্লবের এবং আজ যাহারা সেই বিপ্লবের নামে শপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদের নাই। কারণ রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি ও অনেক মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে ফরাসী বিপ্লব নিজে।

উভয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপের সমবেত শক্তি হিংস্র-ভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এবং উভয় বিপ্লবেই প্রতিপক্ষের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে ইংলণ্ড। রুশ বিপ্লব আজ গণ-পরিষদ ও গণ-সম্মেলনের স্তর কাটাইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আজ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে—সতর্ক হইতে হইবে ধনিক সম্প্রদায় ও সমর-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। ফরাসী বিপ্লব অপেক্ষা রুশ বিপ্লবের দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা বেশি। তাই বহির্জগতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের লোভ তাহাকে সংবরণ করিতে হইবে। তাহাকে নিজের গৃহ অর্থাৎ শ্রমজীবীর গণতন্ত্রকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নূতন গৃহের গঠনকার্য যেদিন সমাপ্ত হইবে সেদিন সে দেখিবে ইউরোপের এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক স্থানে তাহার বিনা হস্তক্ষেপেই বহু পুরাতন পচা বাড়ি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কারণ দিনের অভ্যুদয়েই রাত্রির মৃত্যু।

সেদিন আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না। কিন্তু গল্‌দের মোরগের মতো আমি উষার অভ্যুদয় ঘোষণা করিতেছি।

আর. আর

নিখিল-ইউরোপ সঙ্ঘ

২৮শে জানুয়ারি ১৯৩০

কাউণ্ট কণ্ডেনূহোভে-র নিখিল ইউরোপ সঙ্ঘের সহিত নিজের নাম জড়িত করিতে আমি অস্বীকাব করিযাছি। নিখিল-ইউরোপ সঙ্ঘের আববণের মধ্যে যতই আন্তবিক কল্যাণকামনা ও আদর্শবাদেব মাহাত্ম্য থ ক না কেন, ভবিষ্যতেব পক্ষে উহার মধ্যে আমি বহু কুচক্রী স্বার্থ ও বহু বিপদেব ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি। আমাব এ ভয অমূলক নহে যে, এই সঙ্ঘের প্রথম লক্ষ ইউরোপেব বাহিবেব সমস্ত পৃথিবীকে শোষণ করা এব' পরিশেষে অপর শক্তিব বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত হওযা।

আমাদেব দুর্ভাগ্য, আমাদেব শাসকগণের প্রতি আর আস্থা নাই। আরও দুর্ভাগ্য, এই অবিশ্বাস আমাদের কানায কানায পূণ হইযাছে। কারণ এই শাসকেবাই একদিন আমাদেব ভাগ্যে যুদ্ধ আনিযাছিল এবং ইহাদেব যে পরিবর্তন হইযাছে তাহারও কোনো প্রমাণ নাই। পরিবর্তন হইযাছে শুধু তাহাদেব অস্ত্রের। কাল তাহারা যেমন যুদ্ধকে ব্যবহাব কবিযাছিল আজ ঠিক তেমনি শান্তিকে ব্যবহার কবিতেছে মুনাফাশিকারেব কাজে।

আমবা যেন কথাব ফাঁদে পা না দিই, , সভ্য নামেব তালিকার পরিবর্তন না করিযা শুধু মাত্র "জাতীয" শব্দটিব স্থানে "আন্তজাতিক" শব্দটি বসাইযা দিলে কিছুই আসে যায় না। স্বেচ্ছাচাবী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপেক্ষা আন্তর্জাতিক আর কিছুই নাই। পাশ্চাত্য ইউবোপের বড় বড় শিল্পপতি ও ফাশিস্ট বুর্জোযা মহারথীদের পবিত্র মিলন আজ পৃথিবীর সবচেযে সাংঘাতিক বিপদগুলির একটি।

ইউরোপের এই ঘনায়মান বিপদের বিরুদ্ধে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছি। এই বিপদের প্রথম লক্ষণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

যে-ইউরোপ সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে সমগ্রভাবে স্বীকার না করে সে-ইউরোপকে আমি স্বীকার করি না। ভুল সে করিয়াছে সত্য কিন্তু এ ভুল তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যে দানবীয় শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে তাহার জন্য রাখিয়া গিয়াছে দৈন্য, দুর্নীতি, অজ্ঞতা ও ধ্বংসের এক দুঃসহ গুরুভার উত্তরাধিকার; এই বিশালায়তন দেশের চারি পাশে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের দল। ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া সে যে ভুল করিয়াছে তাহার নগণ্যতায় বিস্মিত হইতে হয়। ভুল সে করিয়াছে স্বীকার করি, প্রথম অভ্যুদয়ে যে বিপুল স্বপ্ন সে আনিয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই স্বীকার করি, তথাপি লেনিনের দুঃসহ নির্মল আদর্শে অনুপ্রাণিত সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আজও ফাশিজমের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই ফাশিজমই কত বিচিত্র রূপেই না সমাজে ও রাষ্ট্রে তার বিষক্রীড়া শুরু করিয়া দিয়াছে।

সাবধান, যে-শান্তির প্রতিশ্রুতিই তাহারা দিক না কেন আপনাদের চারি পাশে কোনো দিনই যেন সতর্ক প্রহরীর অভাব না ঘটে। তথাকথিত বিশ্বস্ত মানুষদের বিশ্বাস করিয়া এই প্রহরীদের কোনো দিন বিদায় দিবেন না। সুস্থ গণতন্ত্রের নিজেকে নিজেরই রক্ষা করিতে হইবে।

মনে রাখিবেন, গতযুদ্ধ যাহারা শুরু করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, চিরদিনকার মতো যুদ্ধ শেষ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সে যুদ্ধ। আগে আমি বেলিপ্যাসিফিজম্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। সাবধান, আজ যেন আমাদের প্যাসিবেলিজীম্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে না হয়।

সতর্কবাণী

৯ই এপ্রিল, ১৯৩০

আন্তর্জাতিক বণিকস্বার্থের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র জগতে আজ কয়েকমাস ধরিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম উপায়ে জনমত উত্তেজিত করিয়া তুলিবার এক কাপুরুষ অভিযান শুরু হইয়াছে। জনমতকে উত্তেজিত করিয়া গভর্ণমেণ্টগুলিকে রুশ-বিরোধী নীতি গ্রহণে বাধ্য করানোই এই অভিযানের উদ্দেশ্য; আর ঐ নীতি গ্রহণের জন্য গভর্ণমেণ্টগুলিও তো প্রস্তুত হইয়াই আছে।

আপনারা জনমত জাগ্রত করিতে চান? ভালো কথা, কিন্তু সাবধান! জনমত যেন আপনাদেরই বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়া না ওঠে। আজ আর মতবিরোধের প্রশ্ন নহে। আমাদের মধ্যে অনেকেই (লেখক নিজেও) কমিউনিস্ট নহেন। ইউরোপের কমিউনিস্টদের অনেকেই আবার মস্কোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানিয়া চলেন না। কিন্তু এ সমস্ত বিরোধ আজ আপাতত থাক। স্বতন্ত্রবাদী অথবা সাম্যবাদী, সোশালিস্ট অথবা সিণ্ডিকালিস্ট, আসুন সকলে আমরা আজ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হাতে হাত মিলাইয়া দাঁড়াই। ন্যায়, ধর্ম ও সভ্যতার মুখোশ পরিয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যে জঘন্যতম বিকৃতি বণিকের স্বর্ণ-লালসা, সমরলিপ্সুর হিংস্র হুঙ্কার ও স্বৈরাচারী শাসকের নির্বিবেক নির্যাতনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া পশ্চিম মহাদেশকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে এবং রুশ বিপ্লবের মিত্র-জাতিগুলিকে ও তাহাদের বিপুল সৃষ্টিপ্রয়াসকে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদের জনগণকে নিয়োজিত করিতে চাহিতেছে তাহাকে আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। আমরা ভালোভাবেই জানি, সোবিয়েৎ

ইউনিয়নের এই সৃষ্টিপ্রয়াসে আপনারা শঙ্কিত। তাহাদের সাফল্যে আপনারা যদি ভীত না হইতেন, তবে পাগলের মতো আপনারা তাহাদের ধ্বংসের পরিকল্পনায় মাতিতেন না। তাহাদের পুনর্গঠনের এই বিরাট পরিকল্পনাকে বাধা দিবার আপনাদের আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, আপনারা জানেন, এই পরিকল্পনাকে তাহারা যদি বাস্তবে পরিণত করিতে পারে (যাহা তিন বৎসরের মধ্যেই সম্ভব হইবার কথা) তবে সর্বহারার এই গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিশাল আয়তন লইয়া ইউরোপের বুকের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইবে এবং দাঁড়াইবে আপনাদের সর্বপ্রকারের আঘাতকে উপেক্ষা করিয়াই। আর ব্যর্থ করিয়া দিবে আপনাদের সমগ্র পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিবার পরিকল্পনা। তখন আর সময় থাকিবে না। এ কথা আপনারা জানেন...

কিন্তু একথা আমরাও জানি। তাই আপনাদের মুখ হইতে আমরা মুখোশ ছিনাইয়া লইয়া জগতের কাছে আপনাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে চাই। চক্রান্তকারিগণ! নিজেদের ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন কর। যে হাত তুলিয়াছ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহা নামাইয়া লও!

(১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল মর্দঁ পত্রিকায় প্রকাশিত ও মস্কোর 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত)

এউজেন রেলজিস্ এর পত্রের জবাব

[বুখারেস্টের লেখক এউজেন রেলজিস্ ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে রলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট আন্তর্জাতিক শান্তি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। নিম্নে উদ্ধৃত চিঠিতে রলাঁ তাহার জবাব দেন।]

২০শে অক্টোবর, ১৯৩০

প্রিয় রেলজিস্,

আপনার প্রশ্নগুলি পড়িলাম।

অনেকগুলি প্রশ্নই (১, ২, ৩) এমন এক ইউরোপ সম্পর্কে যাহাকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে। আমি স্পষ্টভাবে আপনাকে জানাইয়া দিতে চাই, এ-পথে আপনার সহিত সহযাত্রা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এমন কোনো দলবন্ধনের কথা চিন্তা করিতে পারি না যাহা শুধু ইউরোপের মধ্যেই আবদ্ধ। এ-কথা অবশ্য বলি না যে, সম্মুখস্থ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বিবর্তনের এরূপ কোনো স্তর হইতে পারে না, অথবা জাতির অগ্রগতির পথে এরূপ কিছুর প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি এ-স্তর উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি, আর কখনো ফিরিয়া যাইব না। পরিষ্কার দেখিতেছি, ইউরোপীয়-বাদের ছদ্মআবরণে, প্যান-ইউরোপা, ইউরোপীয়ান ফেডারেশন প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া এক নূতন ধরনের সাংঘাতিক জাতীয়তাবাদ মাথা তুলিতেছে। সর্বগ্রাসী স্বার্থের শোষণশক্তির এই বৃহত্তম সমবায় বাকি পৃথিবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা শুরু করিয়াছে। এ-ধরনের সঙ্ঘগঠনের অর্থই শান্তি বিপন্ন এবং এ-ধরনের সঙ্ঘগঠনের ঘোষণামাত্রেই দেখা দিবে ইহারই দুই তিনটি দানবীয়

প্রতিদ্বন্দ্বী দল ঃ দেখা দিবে প্যান-এশিয়া প্যান-আমেরিকা এবং তারপর নিশ্চয়ই দেখা দিবে প্যান-আফ্রিকা ইত্যাদি। ইউরোপের অধিবাসীদের নিকট এই কপট আবেদনের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে দশটি জাতির নিজেদেরই সৃষ্ট এক বিরোধী-জগতের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জার আবেদন।

আমি ইহার সমর্থন করিতে পারি না। আমি ইহার বিরোধিতা করি। আমি এমন কোনো সঙ্ঘ স্বীকার করি না, যাহার দ্বার সমগ্র জগতের নিকট উন্মুক্ত নহে। আপনার মতো একজন স্বাধীন মনস্বী যে, ইউরোপ এশিয়া অথবা আমেরিকা এই মহাদেশগুলির কোনো একটির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারেন, (আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে ইহাই আপনি করিয়াছেন) ইহাকে আমি দুর্লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছি যে প্রত্যেক দেশে একই প্রকৃতি ও একই ধারার চিন্তা প্রবাহিত হইতেছে। বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় বিচার-বুদ্ধি আর কাহারো নাই, এইরূপ মনে করা কুপমণ্ডুক প্রাচীন ইউরোপের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে।

সম্প্রতি কতকগুলি বই-এ আমি দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষের ও ক্যাথলিক ইউরোপের রহস্যবাদের উৎস একই, তাহাদের অভিব্যক্তিও প্রায় একই প্রকৃতির। যুক্তিবাদ চীনা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ, এবং এমন কি ভারতবর্ষেও (ভারতবর্ষ কুড়িটি বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত একটি ইউরোপের সমান) এই যুক্তিবাদ কয়েকটি মহান জাতির মানস-প্রকৃতিতে রহিয়াছে। মানুষের এই মানস-স্রোতকে আর দুইটি বিভিন্ন ভূখণ্ডে পৃথক করিয়া রাখা চলে না; আজ সর্বপ্রকারের ভাবধারাই আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ইউরোপ, এশিয়া, ও আমেরিকার মধ্যে আজ অব্যাহত চলিয়াছে বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মগত ভাবধারার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আদান প্রদান।

কলিকাতার স্তার জে. সি. বসুর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরকে যদি আমি সালেৎ-এর গবেষণাগারের সহিত তুলনা করি, তবে কেমন করিয়া আপনি ইউরোপের ভাবধারাকে প্রত্যক্ষবাদ ও এশিয়ার ভাবধারাকে রহস্যবাদ বলিবেন? বুদ্ধিজীবীরা আজ অন্ধের মতো এই যে ঝুটা মাপকাঠির প্রচলন করিতেছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে মহাদেশে মহাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষের পথই প্রশস্ত হইতেছে। এ মাপকাঠি আমাদের বিসর্জন দিতে হইবে। মানুষ সর্বত্রই এক। তারতম্য যাহা কিছু তাহা অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের জন্য।

যে তুর্কী ও তাতার জগতকে আমরা গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মৃত ও নিস্তব্ধ ভাবিয়া আসিতেছিলাম সেখানে আজ কী দ্রুত পরিবর্তনই না শুরু হইয়াছে। একদিকে এক প্রতিভাবান একনায়কের শাসনে নবীন তুর্কী জাগিয়া উঠিতেছে, অপরদিকে অদম্য সোবিয়েৎ প্রচারকার্যের ফলে এবং কৃষিবিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌দের অক্লান্ত পরিশ্রমে মধ্য-এশিয়ার গভীর অর্থ নৈতিক পবিবর্তন শুরু হইয়াছে, মাথা তুলিতেছে অসংখ্য বিশাল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। গতির আবেগে কাঁপিতেছে সমস্ত জগত। একটা ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে সর্বত্র। এ-জগতকে আমরা যেন কয়েকটি অতি-জাতিতে, কয়েকটি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়া এই বিপুল সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করিয়া না দিই। যে আন্তর্জাতিকতা বিশ্বজনীন নয়, তাহার অস্তিত্ব আর থাকিতে পারিবে না।

তারপর রাজনীতির সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণের ইঙ্গিত আপনি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আমার মত ও মনোভাব আমি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেছি। চার-পাঁচটি প্রশ্নে বিভিন্নভাবে আপনি ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার সমস্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে ঐ একই মনোভাব নিহিত রহিয়াছে! প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়া রাজনীতির প্রতি আপনার একটা ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিয়াছে; মনে হয়

রাজনীতিকে যেন আপনি আপনার চিন্তার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিতে চাহেন।

আজকাল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই মনোভাব খুব প্রবল; কিন্তু এ-দৃষ্ঠিভঙ্গী হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। 'সংগ্রামের উর্ধ্বে'র মধ্য দিয়া আমি যে আবেদন জানাইয়াছিলাম তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। তাই, আপনার প্রশ্নাবলীর জবাবের সুযোগ লইয়া আজ আমার মত ব্যক্ত করিতে চাই।

ফরাসী লেখক জুলিয়ঁ বেদাঁ মিথ্যার বেসাতিতে সিদ্ধহস্ত। দশ বছর আগে অন্য সকলের সাথে যুদ্ধের জোয়ারে ইনি গা ভাসাইয়াছিলেন। সহকর্মীদের প্রতি যে সকল বুদ্ধিজীবী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের লইয়া দশ বছর পরে আজ ইনি আবার দল গড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। সম্প্রতি ইহার একখানি বই-এ বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইনি নিজের জন্য এক বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন। মন এই বিগ্রহ। এ-বিগ্রহ চিরদিনই নিরাপদ, কারণ পাছে গায়ে সংগ্রামের আগুন লাগে এই ভয়ে বাস্তবজীবন হইতে এ-বিগ্রহ দূরেই থাকিবে। প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ হইতে বহু উর্ধ্বে এক অবাস্তব ভাবরাজ্যে এই মনের অবাধ সঞ্চরণ। রাজনীতির বল্‌গা যাহাদের হাতে এ 'মন' তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে না; তাহারাও ইহাকে ইচ্ছা করিয়াই উৎসাহ দেন। কারণ 'অপ্রযুক্ত' বুদ্ধির নির্লজ্জ বেসাতি যাহাদের পেশা এবং কলাশাস্ত্র গবেষণা যাহাদের বিলাস তাহাদের এই জনমনোরঞ্জনের আয়োজনের দিকেই নির্বোধেরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে অথচ বহির্জগতের বিশাল রণ-প্রাঙ্গনে বিশ্বের জাতিপুঞ্জের ভাগ্যের যে-ওঠাপড়া চলিয়াছে সে-দিকে তাহারা তাকায় না।

এ খেলার মধ্যে আমি নাই। 'মসীকৌলিন্যের' বিশেষ সুবিধাভোগের লালসা আমার নাই। 'সংগ্রামের উর্ধ্বে'র' আবেদন আমি যখন প্রচার

করি তখন আমার সতীর্থদের দুঃখভোগকে আমি অস্বীকার করি নাই; তাহাদের ভুলগুলিকে দেখাইয়াছিলাম এবং ঐ ভুল ভাঙিতে চাহিয়াছিলাম। সফল হইতে পারি নাই। সে ভুল তাহাদের আজও আছে; কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নাই। কর্মজগতের অবিচারকে আমি কোনো দিনই সহ্য করিব না, সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নপ্রয়াসও আমার কোনো দিনই থামিবে না।

আপনার কাছে রাজনীতি 'পরাশ্রয়ীর কাজ'। যে ভাগ্যান্বেষীর দলকে 'রাজনীতিজ্ঞ' বলা হইয়া থাকে, জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতির সুযোগগ্রহণ যাহাদের পেশা, এ-কথা শুধু তাহাদের বেলাতেই খাটে। সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের দৈনন্দিন অন্ন আহরণ ও বণ্টনের জন্য মানবস্বার্থের সংগঠন এবং কোনো দেশের, অথবা কয়েকটি দেশের, অথবা সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ স্বার্থ-শক্তি সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করাই রাজনীতি। *panem quotidianum* বলিতে আমি বুঝি জীবনধারণের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন সব কিছুই: অন্ন, জীবিকা, স্বাধীনতা…

আপনার কি মনে হয়, এসকল ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীর উদাসীন থাকা উচিত? এ উদাসীনতার ভান করা তাহার পক্ষে সাজে না, কারণ সমাজের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির সহিতও এখানে তাহার পার্থক্য নাই—এ-সকল না হইলে তাহার একদিনও চলে না। অমর্ত্য মানসলোকের নামে মর্ত্যজীবনের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই, কারণ এই বাস্তবতাই তাহার মানসজীবনের প্রথম উপাদান। যদি ব্যক্তিমানুষ হিসাবে ইহলৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে মনের স্বাধীনতা সে ক্রয় করিতে চাহে, তবে বলিব বিপুল জনগণের নিকট হইতে এই সন্ন্যাস জীবন-যাপনের ক্ষমতা চাহিয়া লইবার অধিকার তাহার নাই, কারণ জীবনের দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো, তাহার মতো মনের

এতখানি শক্তিসম্পদ সাধারণ মানুষের নাই। তাই, সর্বাগ্রে সাধারণ মানুষের দুঃখ মোচনের কথাই আমাদের ভাবিতে হইবে।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী, ভারতের ফ্রান্সীস আসিসি, আমার প্রিয়তম মহর্ষি ঠাকুর রামকৃষ্ণের দুঃসাহসী ঘোষণা আমার কানে বাজিতেছেঃ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' মনের কাজও খালি পেটে হয় না। রামকৃষ্ণের শক্তিমান শিষ্য ভারতের সেণ্টপল বিবেকানন্দের বিজয় পতাকায় লেখা ছিল এক বিষণ্ণ মহীয়সী বাণী—'দরিদ্র নারায়ণ'। তিনি বলিতেন, 'যতদিন আমার দেশে একটি কুকুর ক্ষুধিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে খাওয়ানোই হইবে আমার একমাত্র ধর্ম।'

আমার ধর্মও তাই। ক্ষুধিত, নিপীড়িত, নির্যাতিতের সেবক আমি। আমার মনের ঐশ্বর্য তাহাদেরই জন্য, কিন্তু সর্বাগ্রে আমার কাছে তাহাদের দাবীঃ অন্নের, সুবিচারের, স্বাধীনতার। বুদ্ধিজীবীর বিশেষ সুযোগ সুবিধার অংশভুক আমি, সমাজকে সক্রিয় সাহায্যদানের ক্ষমতা আমার আছে। আর ক্ষমতা আছে বলিয়া কর্তব্যও আছে। তাই আমাকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে, সমাজপ্রতারকদের মুখোশ খুলিয়া দিতে হইবে। যদি পারি তবে সমাজকে দিতে. হইবে নির্ভুল পথের সন্ধান, সতর্ক করিয়া দিতে হইবে বিপদ সম্পর্কে। না, রাজনীতির দিক হইতে মুখ ফিরাইলে আমার চলিবে না; চিন্তা ও কর্মের মহাসমন্বয়কারী গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমি ঐ দু-এর মিলন ঘটাইতে প্রয়াসী হইব।

এ-কথা কেমন করিয়া মানিব যে বর্তমানের জন্য, যে-যুগে বাস করিতেছি সে-যুগের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করিলে ভবিষ্যতের প্রতি এবং 'সর্বমানবের শাশ্বত স্বার্থের' প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে? বর্তমানের প্রতি উদাসীন থাকাই তো ভবিষ্যতের প্রতি, সর্বমানবের চিরন্তনস্বার্থের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা করা। চিন্তাক্ষেত্রের একটা অর্থহীন ভাববাদ দ্বারা কর্মের বিরোধিতা করা আজকাল বিলাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সত্যকার সামাজিক সুবিচার ও মানবিকতার চিরন্তন মূল্যের সহিত জাতির প্রকৃত স্বার্থের কোনোদিনই কোনো বিরোধ হইতে পারে না। সমরতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আমি যে সংগ্রাম করিতেছি তাহা ভাববাদী বুদ্ধিজীবী হিসাবে নহে। বাস্তববাদীর দৃষ্টি লইয়াই দেখিতেছি সমরতান্ত্রিকতা ও জাতীয়তাবাদ জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু, দেখিতেছি জাতির শত্রুরা জাতির বুদ্ধিকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, আর তার ফলে ভয়ে অন্য জাতিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দেখিতেছি কি-ভাবে হত্যার স্থির লক্ষ নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সভ্যতার সমগ্র বিপুল প্রয়াস নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। যে-কেহ মানুষের ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাকে নামিতে হইবে রাজনীতির ক্ষেত্রে, কিন্তু নামিতে হইবে মনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কারণ এই স্বাধীন দৃষ্টির ফলেই সে সমগ্র রণক্ষেত্রকে প্রভাবিত করিতে পারিবে।

'অবশিষ্ট সমগ্র দেহের সহিত মস্তিষ্কের যে সম্পর্ক' বুদ্ধিজীবিগণ অবশিষ্ট সমগ্র সমাজের সহিত নিজেদের সেই সম্পর্ক বলিয়া প্রচার করিতে চান। (বুদ্ধিজীবী বলিতে কাহাদের বুঝায় তাহা আগে জানা দরকার। 'কায়িক শ্রমজীবী' হইতে স্বতন্ত্র ধূলিবিমুক্তদেহ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে তাহাদের দেখা চলিবে না। যদি সেইভাবে দেখিতে চান, তবে আমি কোনো এক ৪ঠা অগাস্টের রাত্রির কথা তুলিব, যে-রাত্রে বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটাইয়া তাহাদের কায়িক শ্রমজীবীদের দলভুক্ত করা হইয়াছিল।) সত্যই যদি বুদ্ধিজীবীরা এই অভিমান এখনো পোষণ করিয়া থাকেন তবে মানেনিয়াস আগ্রিপা-র গল্পের কথা তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। এই

'মস্তিষ্ক' দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাড়া কি ভাবে চলিতে পারে। অতএব দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যেন উহাদের সহিত সহযোগিতা করে।'

'বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ' ও 'মনের সেবকগণে'র কথা আপনার প্রশ্নাবলীর মধ্যে রহিয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দাম্ভিকতা হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার দাম্ভিকতা তাহাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কর্মী-মানুষের বৃহৎ সঙ্ঘের একটা অংশ ছাড়া তাহারা আর কিছুই নহে; সমস্ত শ্রমজীবী লইয়া যে সেনাবাহিনী গঠিত তাহারই একটি বিশেষ অস্ত্র তাহারা (প্রতিভার মতো)। তাহাদের রমণীয় কর্তব্য তাহারা যেন একাগ্রমনে সম্পন্ন করিয়া যায়, কিন্তু এ গর্ব যেন কোনো দিন তাহাদের মনে না আসে যে, অপর সহকর্মীদের কাজের চেয়ে তাহাদের কাজের গুরুত্ব বেশি। সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি যে-সকল বিপুল সামাজিক আন্দোলনের প্রত্যেকটিরই লক্ষ সাধারণ মানুষের একই সাধারণ স্বার্থের সেবা। লক্ষ তাদের একই— মুক্ততর ও বৃহত্তর এক সমাজ সৃষ্টি; শুধু পদ্ধতি তাহাদের বিভিন্ন! কর্মক্ষেত্রে তাহারা প্রায়ই লক্ষের জন্য উপায়ের নির্মলতা বিসর্জন দেন। যাহারা কাজের জগতে নামিয়া আসেন, কাজের উন্মাদনায় তাহারা প্রায়ই ভাসিয়া যান। আন্দোলনের ধূলিধূম্রজালের মধ্যে লক্ষবস্তুকে বিস্মৃত হওয়া নেতাদের চলে না। কিন্তু 'নেতা' বলিতে আমি শুধু পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের কথা বলিতেছি না। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাহাদের যে-টুকু ক্ষমতা তাহাতে নেতৃত্ব চলে না; গত যুদ্ধেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের জোয়ারের জন্য সকলের চেয়ে বেশি ভাসিয়া গিয়াছিল তাহারাই। নেতৃত্ব প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইহাকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। সমাজের

কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ইহা আবদ্ধ নহে ; সব শ্রেণীর মধ্য হইতেই নেতৃত্ব আসিতে পারে। কিন্তু কোনো শ্রেণীতেই নেতা খুব বেশি জন্মায় না। সর্বপ্রকারের কর্মক্ষেত্রেই নেতার সংখ্যা খুব কম। জরেস, লেনিন, কামাল ও গান্ধী প্রকৃত নেতা। যে-সকল বুদ্ধিজীবী ইহাদের প্রতি বিরূপ, তাহারা যেন ইহাদের সম্মুখে অবাস্তব ভাবরাজ্যের দুর্গম পর্বতমালা খাড়া না করিয়া মনঃশক্তিতে আরো শক্তিমান এমন কর্মবীরদের নেতারূপে প্রকাশ করিতে পারেন, বাস্তব জগতের দুর্গম হইতে আরো দুর্গমে যাহারা তাহাদের পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। যদি তাই তাহারা করিতে পারেন, তবে তাহাই তো হইবে সর্বাঙ্গসুন্দর সুস্থ 'রাজনীতি'।

'যুবশক্তির প্রতি আমার বাণী' (আপনার ১৩ নম্বরের প্রশ্ন) ঃ

'চিন্তাকে কখনো কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না। কাজ আছে দুই ধরনের ; এক, সম্মুখবর্তী কর্তব্য ও দ্বিতীয় দূর-ভবিষ্যতের। দ্বিতীয়টিতে মনোযোগ দিতে গিয়া যেন প্রথমটিকে অবহেলা না করা হয় এবং প্রথমটিতে আত্মনিয়োগ কবিতে গিয়া যেন চিন্তারাজ্যের বিস্তীর্ণ দিকচক্রবাল হইতে দৃষ্টি সরিয়া না যায়। যে-মানুষের মনঃশক্তি সক্রিয় সে যেন তার চিন্তাধারাকে বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের বুকের উপর দিয়া সুদূর ভবিষ্যতের বিশাল পটভূমিকায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারে। যে-চিন্তা সক্রিয় নহে, সে চিন্তা চিন্তাই নহে, সে চিন্তার অসাড়তা, সে মৃত্যু। যে নিষ্ফল, নিষ্প্রাণ কলা-উপাসনার অন্ধকূপে এ যুগের একদল মস্তিষ্কবিলাসী আত্মগোপন করিয়া 'চিন্তার জন্য চিন্তার সাধনা'র নেশায় মাতিয়া থাকিতে চাহিতেছে, তাহারা তো এক অতলস্পর্শ গহ্বরের একেবারে মুখের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দেহ হইতে শবের গন্ধ বাহির হইতেছে। যাহা কাজ করে, তাহাই শুধু জীবন্ত। ইন আউফাং ভার ডী টাট...

তাই আমি তরুণদের নিকট শক্তিসঞ্চয়ের জন্য অবিশ্রাম আবেদন জানাইতেছি। শক্তির এত প্রয়োজন বোধ হয় আর কোনো যুগেই হয় নাই। এ এক হিংস্র, নিষ্ঠুর ধ্বংসের যুগ। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যে রহিয়াছে বিপুল সৃষ্টির সম্ভাবনা। এ যুগ প্রলয়ের, এ যুগ নবজীবনের। গৃহকোণে বসিয়া নিষ্ফল ক্রন্দনের সময় ইহা নহে। নূতন যে আলো জগতে নামিতেছে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার সময় আসিয়াছে। এ যেন দেবদূতের সহিত জেকবের সংঘর্ষ। নূতন ঊষার অভ্যুদয় পর্যন্ত ইহা চলিবে।...

দেবদূত বলিল: "আমাকে ছাড়ো, প্রভাত হইয়াছে।" জেকব বলিল: "আমাকে আশীর্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না।" দেবদূত বলিল: "তুমি ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছ। তুমি আরো শক্তিমান হইয়াছ।"

আজ আমাদের সংগ্রাম ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে; আমাদের সংগ্রাম প্রাচীন ভাবধারার বিরুদ্ধে, মুমূর্ষু ও হিংস্র দেবতাদের বিরুদ্ধে আর ঐ কবন্ধ দেবতাদের লক্ষ লক্ষ অন্ধ পূজারীদের বিরুদ্ধে। আমরা গড়িব নূতন দেবতা ও নূতন মানবতা। প্রচণ্ড শক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মাহুতি ভিন্ন ইহা সম্ভব নহে। ঈশ্বর করুন, এ কাজে আমরা যেন অযোগ্য প্রমাণিত না হই।...ভীভ লাকসিয়ঁ...ভীভ লা পেষ...

পরিশেষে আমার চিন্তাগুরু স্পিনোজার মহাবাণী স্মরণ করি:

"যুদ্ধ না থাকিলেই শান্তি হয় না,
আত্মার বীর্যে যে মহাগুণের জন্ম তাহাই শক্তি।"

আর. আর

ইউরোপের প্রতি

(গাস্ত্ঁ রিয়ঁ-র জবাব)

জানুয়ারী, ১৯৩১

নুভেল রেভ্যু মঁদেল পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা গাস্ত্ঁ রিয়ঁ-র প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে যে-সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাজীবীদের পক্ষে খুব বেশি। যদিও বর্তমানে আমি রোগশয্যায় তথাপি অবিলম্বে ইহার জবাব দেওয়া কর্তব্য মনে করি।

আমার সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি যে মৈত্রী ও সৌজন্য দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য গাস্ত্ঁ রিয়ঁ-কে ধন্যবাদ। কিন্তু, আমার স্বভাব ও কর্মধারা সম্পর্কে তাহার ধারণা একেবারেই ভুল। পশ্চিম মহাদেশের অন্তর্লোকে যে রহস্যময়, সংগীতময়, অবচেতন মহাশক্তি ঘুমাইয়া আছে তাহার আদিম ও গভীর উৎসকে আমি আমার সাহিত্যিক কর্মজীবনে আলোড়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছি সত্য, সত্য আমি স্বপ্নের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি, কিন্তু সেজন্য আমাকে বাস্তববিমুখ, সপ্নসঞ্চারী, ভাবতন্দ্রালু ভাবিবার অধিকার কাহারো নাই। ঐতিহাসিক গবেষণা শুধু আমার পেশা নহে, আমার স্বভাব। এ-ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টি মোহমুক্ত, মানুষের শাশ্বত দুষ্কৃতি ও অধঃপতনের ছবি দেখিতে আমার চোখ অভ্যস্ত, রাজনৈতিক মিথ্যায় আমি বিশ্বাস করি না, যে পবিত্র নীতিগুলির আবরণ সর্বদেশের, সর্বকালের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের পবিত্র আত্মম্ভরিতা ঢাকিয়া রাখে, তাহা আমাকে প্রতারিত করিতে পারে না।

আমার কতকগুলি পুস্তকের সম্ভবত কিছুটা অসঙ্গত সাফল্যের ফলে

জনসাধারণ আমার নিকট হইতে নির্দেশের প্রতীক্ষা করে। তাহাদের প্রতি আমার যে নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা পালন করিতে গিয়া তাহাদের গ্রহণশক্তি অনুযায়ী সমগ্র সত্যের একাংশ মাত্র আমি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে সুবিধা আমি দিব না। কারণ, এ-রচনা লিখিতেছি আমি আমার বুদ্ধিজীবী সতীর্থগণকে লক্ষ করিয়া। আজ প্রচণ্ড সংঘর্ষের মুখে তাহারাই তো ইউরোপের গণতান্ত্রিক মনস্বিতার সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ। অতএব, পূর্ণ সত্য গ্রহণের জন্য তাহারা প্রস্তুত থাকুন।

কাউণ্ট কণ্ডেনহোভে-কালের্গি-র প্যান-ইউরোপার সহিত ও মঃ ব্রিয়াঁ-র পরিকল্পনার সহিত (ব্রিয়াঁ-কে গাস্ত রিয়ঁ তাহার আবেগোদ্বেল অন্তরের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন) নিজের নাম জড়িত করিতে যখন আমি অস্বীকার করি তখন এমন কোনো অলীক স্বর্ণস্বর্গের কল্পনা আমার মনে ছিল না যাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সম্ভব হইতে পারে অথবা মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। আমার এই অস্বীকৃতির কারণ ছিল অত্যন্ত বাস্তব। যে-ভূমিখণ্ডের উপর আমরা পা রাখিয়াছি, যে-বেষ্টনীর মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি সেখানে চারিপাশ হইতে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে; সেনাবাহিনীরা প্রস্তুত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে যে আঘাত আমাদের উপর নামিবে, আমরা কি-ভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করিব, আমাদের সম্মুখে আজ সেই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স-ইউরোপ লীগের বুদ্ধিজীবীরা এ বিপদ সম্পর্কে সচেতন নহেন। আমি যদি তাহাদের সতর্ক করিয়া দিই, তবে আশা করি তাহারা ক্ষুব্ধ হইবেন না। যদি মাঝে মাঝে আমার কথা তাহাদের কাছে কঠোর ও তিক্ত মনে হয় তবে যেন তাহারা আমাকে ক্ষমা করেন। কারণ তাহাদের মতো আমিও ১৯১৪ সালের শেষ কয়েক মাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্ধ ছিলাম ও প্রতারিত হইয়াছিলাম এবং তারপর হইতে সেই ভীষণ প্রবঞ্চনাকে আমি

ধরিয়া ফেলিয়াছি। তাই আশা করি, তাহাদের চোখ খুলিয়া দিবার অধিকার আমার আছে।

শ্বেত স্বাধীনতার পতাকাবাহী ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাশাসনের অবসান হইয়া যেদিন হইতে গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেদিন হইতে ধূর্ত রাজনীতির পঙ্কশক্তি তথাকথিত 'জনগণের বাসনার' ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। এই 'জনগণের বাসনা' নিরূপণে কোনোদিনই জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় না, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের নেতাদের ভাবাদর্শের দ্বারা তাহারা চিরদিনই বিভ্রান্ত হয়। সত্যকথা বলিতে গেলে, স্বৈরতন্ত্রের দিনেও ব্যক্তিগত লালসাকে ঢাকিবার জন্য শাসকদের ধর্ম, পিতৃভূমি প্রভৃতি গালভরা মিথ্যার সাহায্য লইতে হইত। কিন্তু, আজ যে টাকার শক্তি সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহার নির্লজ্জ আচরণ এবং আইন, বিচার ও স্বাধীনতার ছদ্মনামে গণ-তান্ত্রিকতার যে ব্যভিচার চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যকার বিভেদ আরো বেশি স্পষ্ট ও গভীর!

বন্ধুগণ, যে জাগিয়া ঘুমাইতেছে সে ছাড়া আর সকলেরই আজ ঘুম ভাঙ্গা উচিত। সব প্রতারণা আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণের কোনো রাষ্ট্রক্ষমতাই নাই, রাষ্ট্রের কিছুই তাহারা জানে না। তাহাদের একমাত্র জানিবার স্থান সংবাদপত্র কিন্তু সংবাদপত্র জগতের পনেরো আনা আজ টাকার শক্তির পায়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। সমালোচনার শক্তি ও মনোবৃত্তি তাহাদের একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কারণ ও ঘটনার অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে কেহই জনসাধারণকে শিখায় নাই; রাজনীতির ধুরন্ধরগণের প্রয়োজন মতো অন্ধ উত্তেজনার জন্য কিভাবে কতটুকু তাহাদের দেওয়া হইতেছে তাহারও বিচার করিতে তাহারা কোনোদিন

শিক্ষা পায় নাই। এ বড় কঠিন শিক্ষা। এ-শিক্ষায় উৎসাহদান দূরে থাকুক রাষ্ট্র এ-শিক্ষায় বাধা দেয়; কারণ এ-শিক্ষা পাইলে জনসাধারণ প্রথমেই রাষ্ট্রের সমস্ত চাতুরী ধরিয়া ফেলিবে। স্বাধীন চিন্তাজীবীরাও জনগণের অগ্রজের মতো; কিন্তু অনুজদের এ-শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কারণ তাহাদের সামাজিক শিক্ষা জনসাধারণের অপেক্ষা বেশিদূর অগ্রসর নহে, আর রাষ্ট্রের চতুরঙ্গ খেলায় তাহারাই প্রথমে ঘুটি হিসাবে ব্যবহৃত হন।

ইউরোপের দুই অংশের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন পৃথিবীর ভূখণ্ড ও বাণিজ্য-বণ্টনের জঘন্য গোপন চুক্তিগুলি ও নানা কুকীর্তি ঢাকিবার জন্য উভয়পক্ষেরই প্রয়োজন হয় এমন কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তির, যাহারা স্বদেশহিতৈষণার, স্বদেশের জন্য আত্মবলিদানের মহিমার ও আত্মনিগ্রহের বীরোচিত আনন্দের স্তবগান গাহিতে পারেন। এমন লোক খুঁজিয়া পাইতে তাহাদের কষ্ট হয় না। আমি জানি কী ঐকান্তিকতা লইয়া, কতখানি আত্মনিগ্রহ বরণ করিয়াই না আমাদের এই বেদনাতুর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণ তাহাদের এই কর্তব্য পালন করিয়াছেন—নিজেদেরই হউক বা নিজেদের গোষ্ঠীরই হউক, কতখানি আত্মদানই না তাহারা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার প্রাক্তন সহকর্মিগণ কী বেদনা বহন করিয়াই না গণদেবতার স্তবগান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও আমি জানি, কতখানি তাহারা প্রতারিত হইয়াছেন, কতজনকেই বা তাহারা প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। আর এ-কথা তাহাদের বলিয়াছিলাম বলিয়া কোনোদিন তাহারা আমাকে ক্ষমা করেন নাই।

তাহারা আর কি করিতে পারিতেন? আমি তখন দুঃখ ও বেদনার সহিত ধীরে ধীরে যৌবনের সমস্ত মোহপাশ হইতে নিজেকে ছিন্ন করিতে-ছিলাম, ছিন্ন করিতেছিলাম আপনাকে সরকারী ইতিহাসের, জাতীয় ও সামাজিক আচার ও ঐতিহ্যের এবং রাষ্ট্রের সর্বপ্রকারের মিথ্যা প্রচারের

নাগপাশ হইতে। সবেমাত্র তখন আতঙ্কের সহিত উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছি, মুক্তির আহ্বানে জাতির মধ্যে কী সাড়াই জাগিতে পারিত। সেদিন সে-কথা বলিতে সাহস ছিল না। আজ আছে। ১৯১৭ সালে এই আহ্বানেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন লেনিন। নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি ইউরোপের সেনাবাহিনীকে, যাহারা তাদের যুদ্ধে পাঠাইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া রণক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে।

কিন্তু অতীতের কথা এখন থাক। সে দীর্ঘ স্বীকারোক্তি একদিন আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিবার সময় যেদিন পাইব সেদিন যাহা লিখিব তাহা হাজার মানুষের এমন মনের কথা যাহা সেদিন তাহারা সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই। কিন্তু অতীতের কথা আজ থাক, বর্তমানই আজ সব ; সেই ভীষণ আলোচনাই আজ করিব।

গাস্তঁ রিয়ঁ-র নেতৃত্বে ফ্রান্সের হৃদয়বান বুদ্ধিজীবিগণ আজ নূতন গান ধরিয়াছেন : 'ইউরোপ, আমার দেশ।' তাহারা দেখিতে পাইতেছেন না যে, তাহাদের এই নূতন গানে বর্তমানের শাসকশ্রেণীর নূতনতম স্বার্থকেই সেবা করা হইতেছে।

'বাস্তববাদী' ফরাসী নীতি বলিতে কি বুঝা যায় ? যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ঘরে যাহা আসিয়াছে তাহা রক্ষা করা, নূতন এক যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়িয়া। অতএব, শান্তি ও 'ফ্রান্স-ইউরোপে'র আইন স্থাপন করিতে হইবে ১৯১৯ সালের সন্ধিনামাগুলির ভিত্তিতে। কিন্তু এই সন্ধিনামাগুলি ন্যায় কি অন্যায়ের ভিত্তিতে রচিত, তাহারা বিজয়ী হিংসার কদর্যতম অপপ্রয়োগ না, অসাম্য ও অসহ্য অবিচারের স্তূপের উপর তাহারা রচিত হইয়াছে, সে-প্রশ্ন সযত্নে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। ১৯১৯ সালের সন্ধিতে যে ব্যবস্থাকে পাকা করা হইয়াছে ইউরোপের দুই-তৃতীয়াংশের পক্ষে তাহা অচল।

বিজিত জাতিগুলির অপরিমেয় দুঃখদুর্দশার কথা কোনো ফরাসীসূত্রেই জানিবার উপায় নাই।

বিপুল শক্তিতে নবজাগ্রত ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ উপবাসী জার্মানিকে যদি আর দুই এক বৎসরের অধিক এই নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, তবে প্রচণ্ড জাতীয় ও সামাজিক আলোড়নে ইউরোপ কাঁপিতে থাকিবে। ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র পিলসুদ্‌স্কির পোল্যাণ্ড পোলিশ জনসাধারণ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর অসহ্য নির্যাতন চালাইতেছে; হতাশায় উন্মাদ হইয়া হাঙ্গেরী কবরের গহ্বর হইতে শৌর্যবান জাতিকে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছে·· স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আজিকার ইউরোপ ইউরোপের অপমান ছাড়া আর কিছুই নহে। মুসোলিনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যদি কোনো গুণ্ডা-সর্দার আজ ফ্রান্সের মহিমাকে ধুলিসাৎ করিতে চাহে; তবে তাহার আহ্বানমাত্রেই এই উন্মাদের দল তাহার চারিপাশে ভিড় করিবে। রিয়ঁ-র মতো 'ইউরোপীয়ানদের' মধ্যে যদি সত্যকার বাস্তব-বোধ থাকে, তবে বিশ্বশান্তির ধ্বংসের আয়োজন করিয়া মৌখিক উদারতায় বিশ্বশান্তির নামগানে যাহারা মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহারা তাহাদের বাস্তববোধের পরিচয় দিন। ইউরোপের শান্তি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে তাহারা উদ্যোগী হইয়া আসুন, গভীরতম অবিচার ও জঘন্যতম বিদ্বেষকে দূর করিতে তাহারা সর্বপ্রযত্নে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করুন, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিন। তাহাদের নিজেদের দেশ ইউরোপের বুকের উপর যে অন্যায় অবিচারের ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেগুলিকে দেখিবার ও স্বীকার করিবার মতো স্বচ্ছদৃষ্টি ও উদারতার পরিচয় দিন; সে অন্যায় অবিচারের ক্ষতিপূরণের কথা নিজ হইতেই উত্থাপন করুন।

শান্তিব্যবস্থার এই পরিবর্তন যতই সংযত হউক না কেন, উহার ফলে বিজেতা জাতিগণের প্রচুর ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই;

ইউরোপকে ধ্বংস করিবার মূল্য তাহাদের ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এ-নীতি যিনি ফ্রান্সে প্রচার করিবেন, জনপ্রিয়তার আশা করা তাহার চলিবে না। কিন্তু শান্তি যিনি চাহিবেন শুধু মুখে নহে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে, তিনি যেন মনে রাখেন নিজের জীবন দিয়া এই শান্তি-কামনার মূল্য তাহাকে দিতে হইবে। ইউরোপে এমন একটি বৃহৎ বিচারশালা খুলিবার দাবী আমি জানাইতেছি, যেখানে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণ সকলে একত্র ও আন্তরিকভাবে যথাসম্ভব সাধারণ জীবন-যাত্রার শর্তাবলীর বিষয় আলোচনা করিবেন। যতদিন পর্যন্ত না এই শর্তাবলী আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন পর্যন্ত 'ইউরোপ' কথাটি বারম্বার উচ্চারণ করিয়া লাভ নাই। ইউরোপ নাই। শিকল-পরা কতকগুলি জাতি শুধু পরস্পরের প্রতি রুখিয়া উঠিতেছে। শিকলগুলি ধরিয়া আছে কয়েকটি লোক। আপনারা কাহাদের সঙ্গে আছেন?

ইহা হইল শুধু প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয়টির কথায় আসা যাক্।

ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মিলন ঘটাইয়া পশ্চিম ভূখণ্ডে শাশ্বত শান্তি স্থাপনের কথাই ইউরোপের 'ইউরোপীয়ানদের' আজ একমাত্র চিন্তার বিষয়। ইহা স্বাভাবিক এবং কর্তব্য হিসাবেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার জন্য আমি চিরদিনই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই কাজই সব নহে। আমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়া গেলে বলিতে হয়, ইহা আর বর্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা নহে। জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে নূতন সংঘর্ষের সম্ভাবনা আর সবচেয়ে বড় বিপদ নহে। জার্মানিকে আমি ভালোভাবেই জানি; উন্মাদ অথচ ক্ষমতাহীন কয়েকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়া সেখানে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা কেহ ভাবে না। (৩) জার্মানির বর্তমান আর্থিক অবস্থায় যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। লক্ষ করিবার বিষয় গতযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি লুডেনডর্ফ তাহার দেশ যাহাতে নূতন যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্য উন্মাদের মতো জার্মানিতে

প্রচারপুস্তিকা ছড়াইতেছেন, কারণ নূতনভাবে যুদ্ধে সে যদি নামে তবে ত্রিশবৎসর ব্যাপী যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধও যে হত্যা ও ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। লুডেনডর্ফ জার্মানির কবর আর নিজহাতে খুঁড়িতে চাহেন না। * তিনি পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে যুদ্ধ যদি একান্তই শুরু হয় তবে তিনি উহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন না। হিটলার-পন্থীদের ভীতিপ্রদর্শন অপেক্ষা হাতে কলমে কাজের দিকেই ঝোঁক বেশি। সেখানকার রাজনৈতিক-দলগুলির আন্দোলন প্রহসন মাত্র। আজ আসল খেলা চলিয়াছে ব্যবসায়ের জগতে।

জার্মানির বিখ্যাত পটাসিয়াম ব্যবসায়ী আর্নল্ড রেশ্‌বের্গ ও ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী ব্যবসায়ীদের মধ্যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে গোপন কারবার চলিয়াছে, একবছরের কিছু উপর হইল ইউরোপ পত্রিকায় তাহাকে আমি তীব্রভাবে আক্রমণ করি। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সামরিক মৈত্রীর যে ভয়াবহ পরিকল্পনা চলিয়াছে (রেশ্‌বের্গ নিজে প্রকাশ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন) তাহার ফলে ফরাসী শিল্পপতিগণের লাভের অংশভুক্ত হইয়া বৃহৎ জার্মান-শিল্পগুলি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। শুনা যাইতেছে, এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এখনই সবচেয়ে বেশি শুরু হইয়াছে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে জার্মানির বৃহৎশিল্পগুলির যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাদের সমরোপকরণ উৎপাদন ব্যবসায়ে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন খাটাইবার ক্ষমতা আর তাহাদের নাই। তাই জার্মানির সামরিক শিল্পগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবার জন্য জার্মান শিল্পপতিগণ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। লাভের অংশ ছাড়াও তাহারা ফ্রান্সকে তাহার সমরোপ-করণ বাড়াইবার সুযোগ দিতে চাহিতেছে। সামরিক সহযোগিতার

* পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে দেখা গিয়াছে এ-সম্পর্কে আমি খুব বেশি আশা পোষণ করিয়াছিলাম (১৯৩৫ সালে লিখিত মন্তব্য)।

এই দানবীয় পরিকল্পনাই নূতন নিখিল ইউরোপ আন্দোলনের মূলে গোপনে রসসিঞ্চন করিতেছে।

ফ্রান্স-ইউরোপ লীগ সম্পর্কে ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে ফুলচন্দনে ঢাকিয়া দিতে তাহাদের প্রাণ চায় কি না, জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। এদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে তাহাদের আমি কিছুতেই দিব না; তাহাদের পৃষ্ঠপোষকেরা ফ্রান্স-ইউরোপকে কোন মৃত্যুগহ্বরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন সে-সম্পর্কে নীরব থাকিতেও আমি তাহাদের দিব না! ইউরোপের সব চেয়ে শক্তিমান দুইটি রাষ্ট্র আজ যে তাহাদের অস্ত্রসজ্জা ও সেনাবাহিনী ক্রমেই বাড়াইয়া চলিয়াছে, সে কি শুধু করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা আজ শিকার খুঁজিয়া ফিরিতেছে। একা এই কাজ সম্ভব নহে; তাই তাহারা ভাগ করিয়া লইয়াছে। এ শিকার কোথায়?

গাস্তঁ রিয়ঁ আমাকে বাইবেলের মেরীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রভু যীশুর মরমী প্রেমিকা মেরী প্রভুর পদতলে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া স্বপ্নে বিভোর। গাস্তঁ রিয়ঁ নিজে সাজিয়াছেন মার্থা, প্রভুর জন্য খাবার রাঁধিতে তিনি ব্যস্ত। তিনি কি কখনও চোখ তুলিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন? বলিতে পারেন প্রভু কে? কাল প্রভু কি ছিলেন, তিনি কি হইবেন?

কমিতে দে ফার্জ্ কিম্বা স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল? অথবা স্যার হেনরি ডেটারডিং? মার্থা যখন দেখিবে যে-প্রভুর ধ্যান সে করিতেছিল সে-প্রভুর আসনে কে আসিয়া বসিয়াছে তখন বিস্ময়ে ও আতঙ্কে নিশ্চয়ই সে রন্ধনভাণ্ড উল্টাইয়া ফেলিবে? আর আমি? আমি তো কোনোদিন মেরী হইতে চাহি নাই; আমার জন্মবন্ধন-রুসোর সহিত নহে, দিদেরোর সহিত। আমার কোনো প্রভু নাই, কাহাকেও আমি আমার গৃহরক্ষার ভার দিই নাই। আমার

পিতামহ কোলা ব্রেঞ্যঁ শিশুকাল হইতেই নিভেরনা-এর মেষগুলির মতো আমার মনে অবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিলেন।

"হতভাগ্য মেষের পাল আমরা! যদি শুধু নেকড়ের ভয় হয়, তবে আত্মরক্ষার পন্থা আমাদের ভালোই জানা আছে। কিন্তু মেষপালকের হাত হইতে আমাদের বাচাইবে কে?"

আমি কখনো চোখ সম্পূর্ণ মুদিয়া ঘুমাই না। কয়েক বছর ধরিয়া লক্ষ করিতেছি শয়তান মেষপালকের দল সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিতেছি নির্বাসিত হোয়াইট রাশিয়ান ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির সহিত তাহাদের কাপুরুষ সহযোগিতা ঃ দেখিতেছি পোল্যাণ্ড ও বল্‌কানদেশগুলির ভাড়াটিয়া সৈন্য লইয়া সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য আমাদের সামরিকমিশনগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি মস্কোতে যে বিচার হইয়া গেল (১) তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। নিজেদের বাঁচাইবার জন্য স্বীকারোক্তি-গুলিকে আরো একটু দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে রামাসনের মতো শয়তানেরা হয় তো কিছু বাড়াইয়া বলিয়াছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের স্বীকারোক্তি যে মূলত সত্য তাহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শিকারীদের লক্ষ আজ সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। আজ পর্যন্ত সোবিয়েতের বিরুদ্ধে সব চক্রান্তই যে তাহাদের ব্যর্থ হইয়াছে তাহার কারণ সোবিয়েতের পক্ষে সৌভাগ্যবশত ইংরেজ, জার্মান ও ফরাসী বণিক ধুরন্ধরেরা প্রতিবারেই কালনেমির লঙ্কাভাগ করিতে গিয়া নিজেদের মধ্যেই কলহে মাতিয়াছেন। এই কলহ মিটিয়া যেদিন ইউরোপে একটি সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে সেদিন সে-সঙ্ঘ নিশ্চয়ই সোবিয়েৎ-জগতের সম্মুখে চুপ করিয়া

(১) ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়র ও টেকনিশিয়ানদের বিচার।

দাঁড়াইয়া থাকিবে না। কারণ সামাজিক গঠনের দিক হইতে সোবিয়েৎ-জগত তাহাদের বিপরীত, সোবিয়েৎ-ব্যবস্থা যতই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাদের অস্তিত্বও ততই বিপন্ন হইবে।

রিয়ঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি: তিনি ও তার বন্ধুরা কোথায় স্থান লইবেন? কোন শিবিরে? তৈল ও পেট্রোলের বণিক ধুরন্ধর ও ইউরোপীয় বাণিজ্য-সঙ্ঘের প্রতি আজও কি তাহারা আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিবেন? তা যদি না করেন তবে আর কি করিতে পারেন তাহারা? ফ্রাঁ জে—মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন তিনি। আমার কথা আমি বলিতেছি; "যে কোনো শত্রুর দ্বারাই সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বিপন্ন হউক না কেন, আমি তাহার পাশে দাড়াইবই।" রাশিয়ানদের দোষত্রুটি সম্পর্কে আমি অন্ধ নহি। তাহাদের সে-কথা আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়াও থাকি। কিন্তু আমি জানি ও বিশ্বাস করি, রাশিয়ার মতো এতবড় দুঃসাহসী পরীক্ষায় আজ পর্যন্ত কোনো দেশ বা রাষ্ট্র আত্মনিয়োগ করে নাই; ভবিষ্যতসমাজের সবচেয়ে বড় আশা তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদি রাশিয়া ধ্বংস হইয়া যায়, তবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ লইয়া আর কোনো দিন মাথা ঘামাইব না। বুঝিব কয়েক শতাব্দীর মতো সেখানে অন্ধকার গভীর হইয়া নামিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, ইহাই সব নহে। আমাদের নিজেদের গৃহদ্বারে আরো এক আগুন লাগিয়াছে। ইউরোপের যে রূপের মোহে তরুণ গাস্তঁ রিয় মুগ্ধ সে-রূপ ১৭৯৮ সালের, মানুষের অধিকারের (Rights of Man) নবীন বাণীর প্রতীক, পুষ্পাচ্ছাদিতবক্ষ অনিন্দ্যসুন্দর যুক্তিরূপিনী দেবীমূর্তির (Goddess of Reason) নিকট হইতে ধার করা। তাহার সুরভিত রেণু প্রলেপের অন্তরালে হিংস্র ভীষণরূপ আত্মগোপন করিয়া আছে। আজিকার গণতন্ত্রের সবগুলিই সাম্রাজ্য। দুই তিনটা জানোয়ার নিজেদের মধ্যে পৃথিবীটা ভাগ করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ ব্যাঘ্র

ভারতবর্ষের বুকের গভীরে নিজের নখর এমনভাবে বসাইয়া দিয়াছে যে, না পারিবে সে তাহা টানিয়া তুলিতে, না পারিবে সে শিকার ছাড়িয়া একদিনও বাঁচিতে।

আমরা ফরাসীরা তাহাকে আমাদের হাত হইতে এই চমৎকার শিকার ছিনাইয়া লইতে দিয়াছিলাম। তারপর কিন্তু নানাভাবে এ-ক্ষতি আমরা পূরণ করিয়াছি। লক্ষ করিবার বিষয়, আমাদের সাম্রাজ্যবিস্তার ও তৃতীয় রিপাবলিক স্থাপনা হয় একই সময়ে। ভিক্তর য়্যুগো বলিতেন, "রিপাবলিকে 'পাবলিকান'রাই (শুঁড়ী) আছে।" রোমান রিপাবলিক শাসন করিত ক্র্যাসাস ও ভেরেস। আর আমরা পৃথিবীর চারিভাগের একভাগ দখল করিয়া ছিলাম শুধু আমাদের অধিকৃতঅঞ্চলের অধিবাসীদের, আমাদের অতুল ও অনিন্দ্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা উপহার দিবার জন্য। কিন্তু এই অমূল্যউপহার লাভ করিয়াও তাহারা নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিই ঝোঁক দেখাইতেছে বেশি। জীবনের ধর্মই কৃতঘ্নতা। কৃতঘ্ন না হইলে এশিয়ার মহান জাতিগুলি আজ স্বাধীনভাবে বাঁচিবার উদ্ধত দাবী জানাইতেছে কেন?

সর্বপ্রথমে জাপান অস্ত্রবলে তাহার সাবালকত্ব ঘোষণা করিয়াছে। জাগ্রত চীন আর ঘুমাইবে না। আত্মশক্তি সচেতন গান্ধীজীর ভারতবর্ষ মহামুক্তির সঙ্কেত পাইয়াছে। এশিয়ার অবশিষ্টাংশ শীঘ্রই তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, আমাদের ইন্দোচীনের সাম্রাজ্যের বুকে মুক্তিকামনার প্রথম স্পন্দন দেখা দিয়াছে—এ-স্পন্দন অবশ্য আমাদের গণতন্ত্রের প্রতিভূগণ রক্তের স্রোতে ডুবাইয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই। প্রাচীন মহাদেশের একতৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া ইসলামের যে বিপুল জনসমাবেশ রহিয়াছে, তাহার বুকেও জাগিয়াছে ঐ স্পন্দন।

এ-প্রশ্ন উঠিবে আগামী কাল, এ প্রশ্ন উঠিয়াছে আজঃ গাস্তঁ রিয়ঁ ও তাহার বন্ধুগণ কোন পক্ষে দাঁড়াইবেন? রবারের দেবতার পক্ষে? না,

স্বাধীনতার দেবী ও কলা, বিজ্ঞান, প্রগতি, সভ্যতা ও যুক্তিবাদের পক্ষে? এশিয়া আফ্রিকায় আমাদের যে বীরভ্রাতাগণ শৃঙ্খল ছিঁড়িবার সংগ্রাম শুরু করিয়াছে তাহাদের দিকে? আমি স্পষ্ট জবাব চাই। ইউরোপে অন্ধস্বার্থপরতার ফলে যে-সংঘর্ষ আজ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে সেই সংঘর্ষ যখন শুরু হইবে, তখন বিদ্রোহী বিশ্বের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইউরোপের ভাগ্যান্বেষীদের দাসানুদাস সাজিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে কে?

অন্যের কথা জানি না, তবে আমার পক্ষ হইতে এ প্রশ্নের জবাব এই:

"সে দাসানুদাস আমি সাজিব না। সেই প্রলয়ঙ্কর বর্বর সংগ্রাম যদি কখনো তুমি আরম্ভ কর তবে, হে ইউরোপ, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার উদ্ধত স্বৈরাচার ও উন্মত্ত ব্যভিচারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিতে আমি দ্বিধা করিব না। ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি প্রত্যেক শোষিত ও নিপীড়িত জাতির পাশে দাঁড়াইয়া আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইব। যে-সুবিচার ও পবিত্র অধিকারের কথা তোমাদের কপট ঘোষণায় তোমরা বারম্বার উচ্চারণ করিয়া থাক, শুধু তাহাদের নামেই আমি সংগ্রাম চালাইব না; আমার সংগ্রাম হইবে সভ্যতার নামেও। মহত্তর সভ্যতা ও মানবমনের সীমাহীন প্রগতির নামে চলিবে আমার এই সংগ্রাম। যে মহান জাতিগুলির স্বর্ণপিণ্ড শতাব্দী ধরিয়া লুণ্ঠন করা হইয়াছে, অথচ যাহাদের লক্ষ বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার মানসসম্পদে আজো কেহ হাত দেয় নাই, সেই জাতিগুলির নৈতিক সমর্থনের দ্বারাই নিজেকে শক্তিমান ও সম্পদশালী করিয়া তোলাই আজ মানবসভ্যতা ও মানব-প্রগতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

আশা করিবার কিছু নাই তবু আশা করি, মানবসমাজের দুই অর্ধাংশের মধ্যে যে বিপুল সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে-সংঘর্ষ মানুষ যেন

এড়াইতে পারে। কিন্তু সংঘর্ষ যদি সত্যই শুরু হয়, মৃত্যুর এত নিকটে দাঁড়াইয়া মনের কথা আমি কিছুতেই গোপন করিতে পারিব না। লেনিন ও স্টালিনের সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে এবং গান্ধী ও সান ইয়াৎ সেনের এশিয়াকে আমি বলি ঃ

"ভ্রাতাগণ, আমার উপর নির্ভর কর। লক্ষ লোকের মধ্যে আমি স্বতন্ত্র। সারাজীবন এই লোকটি ইউরোপে স্বাধীনভাবে কথা কহিয়া আসিতেছে। আমার কণ্ঠস্বর জ্যাঁ ক্রিস্তফ ও কোলা ব্রেইঞঁর কণ্ঠস্বর। স্বাধীন কর্মী আমি, জগতের স্বাধীন কর্মীদের সহকর্মী আমি; জাতি, ধর্ম ও শ্রেণীর বন্ধনমুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত বিশ্বের শ্রমজীবীসাধারণের এক মহাসম্মেলনের পথ প্রস্তুত করিতে আমি আত্মদানে প্রস্তুত।"

আর ইউরোপের উদ্দেশে বলি আমি ঃ

"ইউরোপ, নিজেকে বিস্তৃত কর নতুবা ধ্বংস হইয়া যাও। বিশ্বের সমস্ত নূতন ও স্বাধীন শক্তিকে তুমি গ্রহণ কর। যে প্রাচীন খোলসের মধ্যে তুমি বদ্ধ হইয়া আছ, তাহা উজ্জ্বল বটে, কিন্তু তাহা পাথর হইয়া গিয়াছে। এ খোলস তুমি ভাঙ্গো, ইউরোপ! বুক ভরিয়া নিশ্বাস টানো, তোমার সঙ্গে আমরাও টানি। ইউরোপের চেয়েও বড় বাসভূমি বড় পিতৃভূমি আমরা চাই।"

আমার পিতৃভূমি অতীত নহে, ভবিষ্যৎ। আর উষার আলো তো ফুটিয়াছে।

আর. আর

এ-পত্রের জবাবে গাস্তঁ রিয়ঁ যখন রলাঁকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, তাহার স্থান ফ্রান্স-ইউরোপের পার্শ্বেই তখন রলাঁ তাহাকে নিম্নোক্ত জবাব দেন।

(১) ১৯১৯ সালের সন্ধিপত্রগুলি আইনত ও বাস্তবত ইউরোপকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। এ-সন্ধির পরিবর্তন না হইলে আমি

ইউরোপকে ইউরোপ বলিয়া স্বীকার করিব না। অস্ট্রীয়া ও জার্মানির মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে আমার মতের পরিবর্তন তো হয়ই নাই, উপরন্তু মত আরো দৃঢ় হইয়াছে। এভাবে চলিলে শীঘ্রই এ-ধরনের আরো অনেক চুক্তি আপনারা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ খোলা আছে: হয় ফ্রান্স উদ্যোগী হইয়া এই পরিবর্তন ঘটাইবে, নতুবা ফ্রান্সের উদাসীনতা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন ঘটিবে এক মহা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়া। এবং সর্বোপরি, সর্বপ্রথম আশু কর্তব্য হইতেছে, যে মিথ্যা ও অসম্মানকর কতকগুলি নৈতিক শর্ত ঐ হিংসাত্মক সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ঐগুলিকে বিজিতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা; নতুবা আজ হোক, কাল হোক বিজেতাকেই উহার ফলভোগ করিতে হইবে। এই বন্ধনের অপমান শুধু বিজিতকে আঘাত করে না, আঘাত করে আমাদের, আঘাত করে ফ্রান্সের প্রতিটি বিবেককে।

(২) যে-ইউরোপ সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে স্বীকার করে না, সে ইউরোপকে আমিও স্বীকার করিব না। আমাদের চোখে—আমার চোখে ও আমার প্রত্যেক আন্তরিক সহকর্মীর চোখে—সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ভবিষ্যত ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণবান ও ফলবান অংশ, শুধু সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেই তাহার প্রগতি সীমাবদ্ধ নহে মানুষের সর্বপ্রকার মানসশক্তির উদ্বোধনেরও সে প্রতীক। (বিভিন্ন নবজাগ্রত জাতিগুলির বিপুল প্রাণশক্তির উজ্জীবনই তাহার প্রমাণ)।

আমার এই দুইটি শর্ত যদি আপনারা স্বীকার করিয়া নেন তবেই ইউরোপের কথা, তাহার কর্তব্যের কথা, অবশিষ্ট পৃথিবীতে তাহার নৈতিক অভিযানের কথা লইয়া আলোচনা করা চলিতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত এ শর্ত দুইটি স্বীকৃত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত

ইউরোপ ব।লয়া কিছুই নাই। যাহা আছে তাঁহা ইউরোপের মুখোশ মাত্র। এ-মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেল। যে-সকল রাজনৈতিক নেতাকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখে, যাহারা শান্তির নামে যুদ্ধের সাধনা করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব যাহারা ধুরন্ধব তাহাদেব শিবিবে আপনাদের ফ্রান্স ইউরোপ আজ আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছে। ইউরোপ বলিতে যদি সবকাবী প্যান-ইউরোপ বুঝায় তবে আমি নিজেকে ইউরোপ-বিরোধী বলিযা ঘোষণা কবিতেছি। আপনাবা জানুন বা না জানুন, এই ঝুটা ইউবোপ আন্তর্জাতিক বণিকস্বার্থেব এক বিশুদ্ধ সম্মেলন ছাডা আর কিছুই নয়। আব এই সম্মেলনই আপনাদেব আদর্শবাদকে নিজেব স্বার্থে ব্যবহার কবিতেছে। এই ইউবোপেব বিরুদ্ধে ও সেই নবীন, সবল ও বিশ্বের স্বাধীন শ্রমিকদেব মহাসম্মেলনের পার্শ্বে দাঁডাইব আমি।

এ ঘোষণা আমি অকুণ্ঠকণ্ঠেই কবিতে চাই। আমাব নামেব মূল্য যত কমই হউক না কেন, প্রত্যেক দেশেব স্বাধীন মনস্বীদের মধ্যেহ এমন কিছু লোক আছেন যাহাদেব নিকট আমার জবাবদিহি কবিতে হইবে। কোনো প্রকাবের আপোসেব সহিত যেন আমার নাম জডিত না হয়।

আমাব সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিবেন।

আর. আর

স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতা

(সোবিয়েৎ লেখক ফেডব গ্লডকভ ও ইলিযা সেলভিন্‌স্কিকে লিখিত)

ফেব্রুযারি, ১৯৩১

প্রিয় কমবেডগণ,

আপনাদেব চিঠিতে আমার প্রতি আপনাদেব যে আন্তবিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্য ধন্যবাদ। আপনারা জানেন, পশ্চিম ইউরোপে আমি আপনাদের একজন অনুরক্ত বন্ধু ও সমর্থক। সোবিয়েৎ

ইউনিয়নের লক্ষ ও কর্মে আমি বিশ্বাসী। যতদিন এ-দেহে জীবন থাকিবে ততদিন সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে আমি সমর্থন করিবই। কিন্তু আমি নিজেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও মানবতায় বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করায় আপনারা চিন্তিত হইয়াছেন।

কিন্তু বন্ধুগণ, ইহা সত্য। সত্যই আমি স্বাতন্ত্র্যবাদী; সত্য আমি মানবতায় বিশ্বাস করি। এবং স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতার এই উপাসকই আপনাদের পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিতেছে। ইহাকে অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা না করিয়া, এই ঘটনায় খুশি হইয়া ওঠা কি আপনাদের উচিত নয়? স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতার শ্রেষ্ঠ সমর্থকগণ যে আজ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহা কি আপনাদের কাছে আনন্দের কথা নয়?

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কি, আপনি লিখিয়াছেন "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই," আরো লিখিয়াছেন "বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিন স্বাধীন ছিল না, কোনোদিন স্বাধীন থাকিতেও পারে না।"

আমার সমগ্র জীবন ইহার বিপরীতকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। যে-জগতের মধ্যে আমি এতকাল বাস করিয়া আসিতেছি তাহা আমার জীবনের সমস্ত প্রিয়বস্তুর, আমার লক্ষের, আমার অস্তিত্বের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। তথাপি আমার স্বাধীনতাকে আমি কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হইতে দিই নাই। এই স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া প্রায় পরিপূর্ণ এক মানসিক বিচ্ছেদ আমাকে বরণ করিতে হইয়াছে, একটা সার্বজনীন বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন থাকিবার এই পরম কর্তব্য পালন করিতে গিয়া কোনো ত্যাগকেই আমি বড় করিয়া দেখি নাই, তাই আমার স্বাধীনতা আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি। সমস্ত জীবন আমি স্বাধীন, বুদ্ধিজীবীসমাজে আমি প্রায় নিঃসঙ্গ। কারণ তাহাদের অন্ধ দম্ভ ও স্বার্থপর কুসংস্কারের অংশ আমি কোনোদিন গ্রহণ

করি নাই। আমার দেশের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করিয়াছি, ১৯১৪ সালের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধকে আমি আক্রমণ করিয়াছি। এ সকল কাজে আমার কোনো সহযোগী ছিল না, তাই আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ। যুদ্ধ থামিয়া গিয়া যখন শান্তি আসিল, সে শান্তির মধ্যে নিঃসঙ্গতা আমার আরো বাড়িয়া গেল; কারণ সে শান্তি মিথ্যা শান্তি, সে শান্তির পরিবর্তন আমি চাহিয়াছিলাম। পশ্চিম ইউরোপের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে লইয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সমর্থনে ও সহযোগিত'য় যখন আমি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি তখনও আমি প্রায় নিঃসঙ্গ।

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কি, ইহার পরেও কি আপনি বলিবেন: "কেহ কখনও স্বাধীন থাকিতে পারে না"? মনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তিনিই তো স্বাধীন। আজ যদি এই স্বাধীনের সংখ্যা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে তবে ভালোই হইয়াছে এবং জগতকে আত্মদানের দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন তাহাদের আরো বেশি হইয়া পড়িয়াছে। আমৃত্যু আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইব।

গ্লডকভ, আপনি লিখিয়াছেন, "আজ মানবতার কথা বলার কোনো অর্থই হয় না" কিন্তু আমার মনে হয় মানবতার কথা বলার প্রয়োজন আজই সব চেয়ে বেশি। কারণ, পশুপালের বীভৎস চীৎকারে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজিকার মতো এত বিপদ মানবতার সম্মুখে আর কোনোদিন আসে নাই। এ যেন রণক্ষেত্রে কোনো এক পবিত্র পতাকা পদদলিত হইতে চলিয়াছে। উন্মাদদের পদতল হইতে এ পতাকা রক্ষার চেষ্টাই আমি করিতেছি।

বলা বাহুল্য, যে সকল প্রবঞ্চকের দল মানবতা ও শান্তির নাম লইয়া স্বেচ্ছাচারে মাতিয়াছে তাহাদের মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেলা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ নাই। লিলুলি-র লেখকের মতো এত নিষ্ঠুরভাবে আর

কে এই প্রবঞ্চকদের আক্রমণ করিয়াছে? কিন্তু প্রত্যেক আন্দোলনে, প্রত্যেক শিবিরে চিরদিনই একদল প্রবঞ্চক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। আপনাদের সমর্থকদের মধ্যেও তাহাদের অভাব নাই। শৃগালের মতো তাহারা সিংহকে অনুসরণ করিতেছে সিংহের ভুক্তাবশিষ্টে নিজেদের উদর পূরণের জন্য, আর সিংহ যদি কোনোদিন পীড়িত বা আহত হয় তবে সিংহ মাংস আহার করিতেও এই ফেরুপাল দ্বিধা করিবে না। এই শবাহারী শৃগালের দলকে সিংহ বলিয়া যেন আমরা ভুল না করি। যে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যবাদ ঘোষণা করিয়াছে "আমি মরিব তবু বিশ্বাস ছাড়িব না" তাহাকে আমরা যেন সেই জঘণ্য আত্মম্ভরিতার সহিত এক করিয়া না দেখি, স্বার্থপরতা, অহং সর্বস্বতা ও ঐহিক সুখসম্ভোগ ছাড়া যাহার আর কোনো লক্ষ নাই। মানবতার ধ্বজাধারী যে সকল প্রবঞ্চকের দল আন্তর্জাতিক শান্তির নাম ভাঙ্গাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া চলিয়াছে তাহারা যেন সেই বিপুল আত্মত্যাগের অগ্নিশিখাকে কলঙ্কিত ও ছায়াচ্ছন্ন না করিয়া তোলে। সে শিখা নির্যাতীত ও শোষিত মানুষের মুক্তির পথ আলোকিত করিতেছে, সে শিখায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নবাসী আপনারা জ্বলিয়া সুন্দর হইয়া উঠিতেছেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অধিবাসী হে আমার বন্ধুগণ, আপনারা স্বাধীন, এবং স্বাধীন বলিয়াই আপনাদের অজ্ঞাতসারেই আপনারা সত্যকার স্বাতন্ত্র্যবাদী। মানবতার পতাকা যে আপনারাই বহন করিতেছেন সম্ভবত সে কথা আপনারা জানেন না। আত্মভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী মুক্ত শ্রমিকদের শিবিরে, আপনাদের শিবিরে, আমি মানবতার ও চিন্তার স্বাধীনতার দুই পবিত্র পতাকা বহন করিয়া আনিয়াছি। এ পতাকা দুইটিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। ইহারা আপনাদের গর্বের বস্তু। মানবতা ও স্বাধীন মনস্বিতা আজ আপনাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তো আপনাদের পক্ষে পরম আনন্দের কথা। মনে পড়ে সেক্সপীয়রের "এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার" কথা?

পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী মহাসংগ্রামের পূর্ব-সন্ধ্যার অন্ধকারে এণ্টনির শিবিরের উপরকার আকাশে এই রহস্যময় সংগীত ভাসিয়া যাইতে শোনা গেল—যেন কোনো অদৃশ্য অশ্বারোহীদল সংগীত ও বাদ্যের সমভিব্যহারে চলিয়া গেল। ইহা ডিওনিসসের অশ্বারোহীদল; ইহারাই এণ্টনির দেবতা! এণ্টনির দেবতারা আজ এণ্টনিকেই ছাড়িয়া যাইতেছে, যাহার মৃত্যু সন্নিকট তাহাকে তাহারা এইভাবেই পরিত্যাগ করে। পুরাতন জগতের দুই দেবতা, মানবতা ও স্বাধীনতা আপনাদের শত্রুর শিবির ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। আসিতেছে তাহারা আপনাদের নিকট। সম্বর্দ্ধনা জানান তাহাদের! যাহারা তাহাদের পথ দেখাইয়া আনিতেছে জড়াইয়া ধরুন তাহাদের প্রসারিত হস্ত। তাহারা আপনাদেরই সহযোদ্ধা।

(মস্কোর লিটারেটর নয়া গেজেটে প্রকাশিত)

॥ কমিউনিস্ট বস্তুবাদ ॥

(সার্গে রাডিন কমিউনিস্ট বস্তুবাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রলাঁর নিকট এক পত্র লেখেন। রলাঁ তাহার নিম্নোক্ত রূপ জবাব দেন।)

১৯শে মার্চ, ১৯৩১

ভাববাদ ও বস্তুবাদ এই দুটি কথার উপর আমি কোনো গুরুত্ব আরোপ করি না। প্রায়ই দেখা যায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের জিনিসকেই একই নামে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। যদি কোনো লোক, যদি হাজার হাজার লোক বস্তুবাদের জন্য আত্মবিসর্জন করিতে সক্ষম হয় তবে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই তো সত্যকার ভাববাদী। আর ভাববাদের পতাকার উপর গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কী আবর্জনাই না জমিয়াছে! আমার প্রথম যৌবন হইতেই আমার মন এই আবর্জনার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া

উঠিয়াছিল এবং ১৯০০ সালের পূর্বে লা কোয়ার স্যুর লা প্লাস নামক পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে সর্বপ্রথম আমি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করি তাহার নাম ছিল "ভাববাদী বিষ"। মানুষকে তাহার ভাবধারা দিয়া বিচার করিবেন না, বিচার করিবেন তাহাকে বাস্তব ঘটনার মাপকাঠিতে। মূল প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে আজ যে গঠনমূলক আন্দোলন চলিয়াছে তাহা কি সমাজকে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাইতেছে না, কেবলমাত্র যেখানেই শুধু সুবিচার ও সৃজনীশক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব। আমার তো মনে হয়, সোবিয়েৎ-সাধনার গতি ঐ দিকেই। নূতন সমাজ সেখানে যাহারা গড়িয়া তুলিতেছেন তাহাদের হাতে মলিন মাটির ছাপ লাগিয়াছে বলিয়া তাহাদের দিক হইতে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লইবার অধিকার কাহারো নাই। তাহাদের সমুখে যে কাজ, সে কাজ অতি-মানবের কাজ। অতীতের আবর্জনার পাহাড়কে তাহাদের আগে ভাঙ্গিয়া দিতে হইতেছে; অতীতের আবর্জনার পাহাড় তাই তাহাদের বাধা দিতেছে। (এ বাধা শুধু সোবিয়েৎ ইউনিয়নের নহে, এ বাধা সর্বত্র)। এ আবর্জনার গায়ে যতই আপনি সুরভিদ্রব্য ঢালুন না কেন ইহার পুতিগন্ধ আপনি রোধ করিতে পারিবেন না।

আপনার মতে "ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক স্বর্গের" প্রতি ইহা "দূর হইতে অর্ঘ্যদান" ছাড়া আর কিছুই নহে। এ-কথা সত্য নহে। ইহা বাস্তব-ক্ষেত্রে একটি নীতিকে আশু প্রয়োগের প্রশ্ন। নীতিটি এই : যে কাজ করিবে সেই খাইবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ যে করিবে না, খাইবার অধিকারও তাহার থাকিবে না। এ নীতি মানুষের কাজ সমানভাবে বণ্টনের নীতি। এই অপক্ষপাত বণ্টনের ফলেই কোটি কোটি মানুষ পাইবে বিশ্রামের অধিকার ও ব্যক্তিগত বিকাশলাভের সুযোগ। যে পরাশ্রয়ী কীটের দল জীবনতরুর গভীরে প্রবেশ করিয়াছে

তাহাদের দূর করিয়া দিতে হইবে। এই রক্তশোষকের দল আজ গাছের প্রাণরসের পনেরআনা শুষিয়া খাইতেছে। যে বা যাহারা জীবনতরুকে এই কীটের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাদের তুমি যে নামেই ডাকো, ভাববাদী, বস্তুবাদী, মার্কসবাদী, গান্ধীবাদী, খ্রীস্টপন্থী যাহা খুশি বল কিছুই আসে যায় না। ভুল সে করিতে পারে কারণ মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু আমার মনে হয় লেনিন ও স্টালিনের মতো মানুষেরা প্রাচীন ও অভিজ্ঞ উদ্যানরক্ষক। মাটিকে তাহারা চেনেন, সারাজীবন তাহারা এই মাটি লইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি। বহুদিন ধরিয়া তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া তাহাদের প্রতি আমার আস্থা জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতেই সব কিছু প্রমাণিত হইবে।

॥ গর্কির প্রতি রলাঁ ॥

দিগন্তের দুই বিপরীত প্রান্ত হইতে আসিয়া আমরা ভ্রাতৃত্বের সংঘর্ষে সম্মিলিত হইয়াছি, গর্কি ও আমার মধ্যে যে বন্ধন তাহার বিশেষত্ব এইখানেই। তিনি আসিয়াছিলেন প্রাচীন রাশিয়ার শক্ত সাধারণ জোয়ান মানুষের মধ্য হইতে; আর ভগ্নস্বাস্থ্য অথচ অদম্য মনোবল লইয়া আমি আসিয়াছিলাম প্রাচীন ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে। বিশাল জীবন ও জগতের পথে পথে তাহার শিক্ষা আর আমাব শিক্ষা ইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্চেতে কনুইয়েব দাগ রাখিয়া। বাস্তবক্ষেত্রে গর্কি যে আমার চেয়ে অনেক কঠোর জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু, নৈতিক জীবনে কষ্ট ও কঠোরতা তাহার অপেক্ষা আমার কম নহে। কারণ কুসংস্কারের জঙ্গল ও জলা ভাঙ্গিয়া আমাদেব দুজনকেই পথ করিয়া লইতে হইয়াছে। জনসাধারণের কুসংস্কার আছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীরও কুসংস্কার আছে, বুর্জোয়াদের কুসংস্কারও খুব বেশি

গোপনবস্তু নয়। অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের এই অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রবেশ করানো সহজ নয়।

স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রাম করিতে করিতে যেদিন আমরা মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইলাম সেইদিনই আমরা বন্ধু বলিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম। আমাদের জীবনের ইতিহাস এক নহে, মনের গঠনও স্বতন্ত্র কিন্তু একই অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষা আমাদের উভয়কেই দিতে হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার দুই রূপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তিলে তিলে স্তূপীকৃত মানব সংস্কৃতির মহিমা ও মূল্যকে একদিকে যেমন আমরা দুজনেই প্রাণের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছি, অপরদিকে তেমনি যে শ্রেণী নিজেকে এই সংস্কৃতির অভিভাবক করিয়া তুলিয়াছে সেই শ্রেণীর প্রায় সমগ্র অংশের তীব্র বিদ্বেষ আমাদের দুজনকেই সহ্য করিতে হইয়াছে। নিজেদের কৌলিন্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এই বুদ্ধি-জীবীর জাত গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ফ্রান্সেব অভিজাত শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা আহরণ করিয়া ’৮৯ সালের বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিয়াছে সমগ্র জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য নয়,—জন্ম কৌলীন্যের ধ্বংসস্তূপের উপর বুর্জোয়া-শাসনের পতাকা তুলিবার জন্য। কারণ, এই বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যমণি বলিয়াই তাহারা নিজেদের মনে করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত ডি. জাসাল’ভস্কির একটি প্রবন্ধ আমি পড়িয়াছি, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে গর্কি সংবাদপত্রের মারফৎ যে প্রচার অভিযান আরম্ভ করেন তাহাতে তিনি আসল সংস্কৃতি-সমস্যার অবতারণা করিয়া রাশিয়ার মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ক্লীবত্ব, ক্ষীয়ত্ব ও অসার বাক্‌বিভূতিকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেন।

ঠিক ঐ সময় আমার জ্যাঁ ক্রিস্তফ পারির বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে, আর্ট ও চিন্তাক্ষেত্রের সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে, কলাবিদ-শ্রেণীর যুক্তিহীন ভাবা-দর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে।

ধর্মকে জনসাধারণের আফিম বলা হইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ইউরোপে ধর্মের চেয়ে আর্ট ও সাহিত্য সম্পর্কেই ঐ কথাটি অনেক বেশি সত্য। জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধিকে তাহারা নির্জীব করিয়াছে, মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ দেখাইয়াছে, বাস্তব জীবন হইতে যাহারা পলাতক তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে। "কোনো অবিচারের সংস্পর্শে আমি থাকিতে চাই না," এই অজুহাতে মানুষকে কাজ ও কর্তব্য এড়াইবার সুযোগ দিয়াছে এই সাহিত্য ও আর্ট। গত শতাব্দীর শেষভাগে ড্রেইফুস ব্যাপার লইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহার প্রবল আলোড়নে জোলার মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহের আকস্মিক উন্মাদনায় জনসাধারণের সহিত সর্বাধিক সাহসী ও স্বার্থত্যাগী বুদ্ধিজীবীর সাময়িক সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরক্ষণেই, আবার তাহারা যে-যাহার শিবিরে ফিরিয়া যায়, সেখান হইতে আজ পর্যন্ত তাহারা বাহিরে আসে নাই।

গত পনের বৎসরের পূর্ব পর্যন্তও আমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী তাহারা কেহই স্বাতন্ত্র্যের অন্ধ গলি হইতে বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পান নাই। জনজগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুধুমাত্র বিবেকের নির্দেশেই আমরা কাজ করিয়া চলিয়াছিলাম। এইখানেই ছিল আমাদের স্বাধীনতা, আর এইখানেই ছিল আমাদের অক্ষমতা। এইখানেই ছিল আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভে এই কথাই উপলব্ধি করিয়া পরাজিতের তিক্ত গর্বের সহিত 'যুদ্ধ হইতে দূরে' এই ধ্বনির সহিত আমিই ঘোষণা করিয়াছিলাম, "ইউরোপকে বিশ্বাস করাইবার জন্য এ-কথা আমি বলিতেছি না, এ-কথা বলিতেছি আমার বিবেককে শান্ত করিবার জন্য।" সেদিন আমাদের দাঁড়াইবার মাটি ছিল না।

১৯১৯ সালে যখন নিজের নামে আমি একটি আবেদন প্রচার করি,

তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মনের স্বাধীনতা গাছের মতোই আকাশের দিকে বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু শিকড় ইহার সম্পূর্ণরূপে মাটির মধ্যে। মানবতার বুকে, মজুর জন-সমাজের 'কালো মাটিতে' এই গাছটিকে যদি আমরা তুলিয়া আনিতে পারি, তবে এ গাছ বাঁচিতে পারে। সেই কালো মাটি হইতেই আসিয়াছেন গর্কি। শ্রমিকশ্রেণীর বিবেকের সহিত তিনি আজ একাত্ম। সর্বহারাশ্রেণীর তিনি সংস্কৃতির মধ্যমণি। তাহাদের সহিত তিনি এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবী আমরা, গর্কির মতো সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। নিজেদের জনগণের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিয়াছি। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি এই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছি। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'জনসাধারণের রঙ্গমঞ্চ' নামক পুস্তকের শেষে আমি লিখিয়াছিলাম, জনসাধারণেব আর্ট চাও? তবে, অনন্ত দুঃখ ও অবিশ্রাম পরিশ্রমের অভিশাপ হইতে, কুসংস্কার ও অন্ধ উন্মাদনার মোহ হইতে জনগণকে মুক্ত কর, মুক্ত কর তাহার মন, প্রতিষ্ঠিত কর তাহাকে আত্মকর্তৃত্বে, জয়ী কর তাহাকে বর্তমান সংগ্রামে।"

পশ্চিম ইউরোপে একজন লোক আমি পাই নাই। শিশুকাল হইতেই আমি তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, তাহাকে আহ্বান করিতেছি, তাহার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার চারিদিকে পশ্চিম ইউরোপের মাটি শুকাইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, আমার শিকড় আমি বাহিরে রাখি নাই। ইউরোপের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া সোবিয়েতের নবজাগ্রত বিশাল জনজীবনের উর্বর মৃত্তিকাস্তরের মধ্য দিয়া আমি দুই স্তরের সংযোগ সাধন করিয়াছি। এই ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তরের প্রান্তদেশে আমার শিকড় গর্কিকে স্পর্শ করিয়াছে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা হাতে হাত মিলাইয়াছি। আজ

ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসুন আমরা রক্তে রক্তে জীবনে জীবনে মিশিয়া যাই। শক্তির সহিত শক্তির মিলন হোক্। আমাদের আদর্শ আজ সর্বজগতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। নূতন বসন্তের আবির্ভাব হোক্।

রমাঁ রলাঁ

॥ গর্কি ॥

('তাহারা ও আমরা' শীর্ষক গর্কির প্রবন্ধ-পুস্তকের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রবন্ধ রচিত হয়)

ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট গর্কির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাহার খ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত। কিন্তু এই গর্কির আরেক রূপ আছে, যাহা লইয়া আজও বিতর্ক চলে। গর্কির এই রূপকে ফরাসী কলা-বিদগণ তাহাদের বহির্বাশের এক অংশ দিয়া বিনীতভাবে ঢাকিয়া রাখিতে চান। গর্কির এ রূপ যোদ্ধার রূপ ; যে সর্বহারা বুদ্ধিজীবীর দল নূতন জগত গড়িয়া তুলিতেছে এ-গর্কি তাহাদেরই নায়ক ও চালক। যে মসীকুলীনের গোষ্ঠী আভিজাত্যের অভিমানে জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন তাহাদের কলঙ্কময় জীবনযাত্রার জবাব দিয়াছেন নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া একমাত্র গর্কিই—অন্তত ইউরোপে এ পথে তাহার সহযাত্রী বড় কেহ নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম, আর্ট ও মনীষার জগতের এই বিরাট ব্যক্তি-পুরুষ তাহার সমস্ত প্রতিভা ও মহিমা লইয়া বিপ্লবের শিবিরে আসিয়াছেন এবং ব্যারিকেডের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের তিনি আহ্বান করিতেছেন। জাহাজ নিমজ্জনোন্মুখ না হওয়া পর্যন্ত এ মূষিকের দল তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে না জানি, কিন্তু আমি এ-পাশ হইতে ও-পাশ দিয়া গর্কির প্রসারিত হস্ত জড়াইয়া ধরিয়াছি।

গত দুইএক বৎসর হইতে 'শ্রেষ্ঠ সৈনিক' লেখক হিসাবে গর্কির কার্যকলাপ আমি প্রতিনিয়তই লক্ষ করিয়া আসিতেছি ; মস্কোর সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধাবলীও পাঠ করিয়া আসিতেছি। আমার দুঃখ হয়, গর্কির এই আবেগময় রচনাগুলির কথা পশ্চিম ইউরোপ জানে না। এই রচনাগুলির মধ্যে শুধু যে গর্কির রুক্ষ ও অগ্নিগর্ভ মানস প্রকৃতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, তাহারই চোখের সম্মুখে, তাহারই পরিচালনায় যে নূতন জগত গড়িয়া উঠিতেছে রচনাগুলির মধ্যে তাহারও আভাস রহিয়াছে। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমাব মনোমত কয়েকটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমি সংকলনকর্তা হইলে এমন আরো কতকগুলি প্রবন্ধ ইহাদের সহিত যোগ করিতাম যে-গুলি লেখক হিসাবে আমাকে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে। কারণ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের যে জাতিগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া ভাষা হইতে বঞ্চিত ছিল এবং যে সর্বাহারাশ্রেণী সামাজিক নিপীড়নের ফলে চিরদিনই সংস্কৃতির উত্তাপ হইতে দূরে ছিল, তাহাদের মধ্যেই আজ সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের যে অসামান্য স্ফুরণ দেখা দিয়াছে, ঐ প্রবন্ধগুলিতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানির প্রবন্ধগুলিকে প্রধানত দুইশ্রেণীতে ভাগ করা যায় : শত্রুদের জবাব ও বন্ধুদের নিকট আবেদন।

প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধগুলি পড়িলে বুঝা যায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নে স্বাধীন সমালোচনার অধিকার কিভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। একটা তিব্রতা ও অধৈর্য এগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; এগুলির মধ্যে রহিয়াছে একটা উদ্দীপ্ত আবেগ, রহিয়াছে যুদ্ধের আহ্বান। প্রবন্ধগুলি বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত সন্দেহ নাই, তথাপি ঠিক এগুলি আমার মনোমত নয়। স্বমতে আনিবার চেয়ে শত্রুকে সংগ্রামে প্ররোচিত করাই এগুলির লক্ষ ; যাহারা আগে

হইতেই বুঝিয়া বসিয়া আছে এ আক্রমণ তাহাদেরই প্রতিআক্রমণে বাধ্য করানোর চেষ্টা।

পশ্চিম ইউরোপের আমারা তাহার অপর রচনাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করি বেশি। রচনাগুলির মধ্যে গর্কির অন্য রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে তিনি স্বদেশেব শ্রমজীবী সাধাবণের নির্মম, দুবদর্শী উপদেষ্টা,—কখনো উৎসাহ উপদেশ ও পথনির্দেশ দিতেছেন কখনো বা নূতনের মোহে যাহাতে তাহারা প্রাচীন সংস্কৃতিব প্রতি বিমুখ না হইয়া ওঠে, সে-সম্পর্কে কঠোর তিরস্কার ও সতর্কবাণী উচ্চাবণ কবিতেছেন; যে সকল তরুণ নৈবাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আঘাত দিয়া, উৎসাহ দিয়া তাহাদের তিনি নূতন যুগের মহিমাব আলোক দেখাইতেছেন। সম্মুখে অনন্ত কাজ,—অতএব গর্কি বলিতেছেন হতাশাব স্থান নাই, চাই আনন্দ ও উদ্দীপনা। চোখের উপব জীবন তাহাব অনন্ত সম্পদ স্তবে স্তবে মেলিয়া ধরিতেছে, নূতন যুগেব মানুষকে মুগ্ধচিত্তে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

উদারনৈতিকতা (Liberalism) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualism) এই দুই পুরাতন বুর্জোয়া বিগ্রহেব ধ্বংস দেখিয়া যাহারা আর্তনাদ শুরু করিয়াছে, তাহাদের লক্ষ্য কবিয়া সত্যকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি যে মহিয়সী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা কর্তব্য মনে করি। কারণ, স্বাধীনতার নামে দাসত্বের শিকল গর্বভবে গলায় পরিয়া পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ অন্ধকার গৃহকোণে যে নেশার নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছেন, আমার মনে হয়, গর্কির এই কণ্ঠস্বরে সে-নেশা তাহাদের ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিতে পারে।

"সমাজের অধিকাংশের শ্রমশক্তির শোষণের ভিত্তির উপর যে শ্রেণীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজ ব্যক্তিমানুষকে সেই শ্রেণীর দেওয়া বাহিরের নামে (label) ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা দেয়। বুর্জোয়া

দেশগুলিতে, গোষ্ঠী, জাতি, শ্রেণী ও ধর্মের ধারণা ও জাতীয় সভ্যতার মৌলিকত্বের কুসংস্কারের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ।

"আমাদের সোবিয়েৎ রাষ্ট্র সামাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সীমাবদ্ধ ধারণা এখানে আর নাই এবং ব্যক্তিমানুষ এখানে তাহার সমস্ত দক্ষতা ও শক্তির স্বাধীন বিকাশের অধিকার লাভ করিয়াছে।

"আপনারা বলিবেন: এসব মিথ্যাকথা, কারণ বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি যে-সকল স্বাধীনতার ধনতন্ত্রীজগতে কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অথচ ধনতন্ত্রী-ব্যবস্থার সমর্থকগণ যেগুলির গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ সোবিয়েৎ রাষ্ট্র তাহাদের বিরোধী। আমি জবাব দিব: শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে-সকল ভাবধারা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন বিকাশকে খর্ব করিয়া আসিতেছে তাহাদের পাশাপাশিই আমাদের রাষ্ট্র মানুষকে দিয়াছে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্যক্তি-মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন বিকাশের পথে যে সকল ভাবাদর্শ বাধা সৃষ্টি করে, কোনো ব্যক্তিমানুষ যদি সেই ভাবাদর্শগুলির বেসাতি ও প্রচার শুরু করিতে চেষ্টা করে, তবে আমাদের রাষ্ট্র তাহা নীরবে সহ্য করে না।

এই ভাবাদর্শগুলিই ধনতন্ত্রী-শক্তির ভিত্তি: শ্রেণী, গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম। শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থবিরোধী ভাবধারার প্রচারে বাধা না-দেওয়া এবং শ্রমজীবী লইয়া গঠিত এক জাতির নিকট শ্রমজীবীদের দাসত্বকে সঙ্গত ও অনিবার্য বলিয়া অবাধে প্রচার করিতে দেওয়ার চেয়ে হাস্যকর মূঢ়তা আর কি হইতে পারে?"

একস্থানে মনস্তাত্ত্বিক গর্কি সুনিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইয়াছেন 'চিন্তার স্বাধীনতা'র সর্বশেষ সমর্থক বুর্জোয়া দেশগুলি যে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে তাহা কত মিথ্যা, কত অন্তঃসারশূন্য; এই চেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা তিনি তাহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছেন।

"খাঁচার মধ্যে বসিয়াই ব্যক্তিমানুষ তাহার এই ঝুটা স্বাধীনতাকে সমর্থন করিতেছে। যে পারাবত-কোটরে বসিয়া লেখক, সাংবাদিক, দার্শনিক, সরকারীকর্মচারী ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রে সুগঠিত অন্যান্য বৃত্তিজীবিগণ এই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম করিতেছেন কৃষকের পারাবত-কোটর অপেক্ষা নিশ্চয়ই তাহা অনেক বেশি আরামদায়ক।

"শ্রেণী সমাজ বাহির হইতে মানুষের উপর যে চাপ দেয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ তাহারই ফল; হিংস্র আঘাত হইতে ব্যক্তিমানুষের আত্ম-রক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কিন্তু আত্মরক্ষার এই প্রয়াস মানুষের সমস্ত কর্মকে নিজের চারিপাশেই সীমাবদ্ধ রাখে, কারণ মানুষ যখন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত থাকে তখন তাহার মানসপ্রতিভার বিকাশের গতি শ্লথ হইয়া যায়। উহাতে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ উভয়েরই ক্ষতি। রাষ্ট্র যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জায় কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতেছে তখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের হিংস্র আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ব্যক্তিমানুষের শক্তির অধিকাংশই নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।

"জীবন একটি সংগ্রাম?' অস্বীকার করি না। কিন্তু মানুষের এ-সংগ্রাম হইবে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে। এ শক্তিকে নির্জিত ও নিয়ন্ত্রণ করাই হইবে এ-সংগ্রামের লক্ষ্য। শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার এই বিরাট সংঘর্ষকে মানুষের শ্রমশক্তিকে করায়ত্ত রাখিবার এবং তাহাকে চিরদিন দাসত্বে বাঁধিয়া রাখিবার অসম্মানকর সংগ্রামে পরিণত করিয়াছে। বিংশশতাব্দীর বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত কৃষকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলত কোনো প্রভেদ নাই; বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহিরটা শুধু বেশি পালিশ ও বেশি পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অন্ধ ও পাশবিক এটি অনেক বেশি। জনসাধারণ ও রাষ্ট্র, এই হাতুড়ী ও হাপরের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর স্থান; পারিপার্শ্বিক তাহার বিরোধী বলিয়া বাঁচিবার সমস্যা তাহার পক্ষে কঠিন

ও কিছুটা নাটকীয়। এই সীমাবদ্ধ জগতে বসিয়া তাহাকে চিন্তা করিতে হয় বলিয়াই জীবন সম্পর্কে তাহার নিজের ধারণার জন্য সে সমগ্র জগতকে দায়ী করিয়া বসে এবং বহির্জগত-বিচ্ছিন্ন অন্তর্লোকের এই তন্ময়তা হইতেই দার্শনিক নৈরাশ্য, অবিশ্বাস ও বিকৃতচিন্তার উদ্ভব হয়।"

এই কথাগুলি আমার নিজের জীবনের চিন্তাভাবনার সহিত এমন অদ্ভুত-ভাবে মিলিয়া যাইতেছে যে এগুলি এখানে না তুলিয়া পারিলাম না। গত কয়েক বৎসরের বেদনাময় সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমিও আমার মতো চিন্তা করিতে করিতে ঐ একই উপসংহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শীঘ্রই আমি কয়েকটি প্রবন্ধে ও একটি পুস্তকে পশ্চিম মহাদেশে স্বাধীন চিন্তার রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের কাহিনী লিখিবার সুযোগ পাইব। এ ধরনের সঙ্কটের কাহিনী ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে আমার হাজার হাজার সহকর্মীর কৌতুহল জাগ্রত করিবে। আমি জানি তাহারাও আধা-অন্ধকারে ঐ একই পথের উপর পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছেন।

পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ কয়েদীর মতো কারাপ্রাচীরের সঙ্কীর্ণ অবরোধের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছেন। মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া উঠিলে তাহারা 'আকাশ হইতে' মুক্তির স্বাদ পাইবার চেষ্টা করেন। কখনো দেখেন তাহারা ধর্মানুভূতির অলীক স্বপ্ন ·কখনো ব্যক্ত করেন নিস্ফল কৃচ্ছ্রসাধনের দাম্ভিক অহমিকা। ইহাদেরই বিষণ্ন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে গর্কি সন্ধান দিয়াছেন বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজে সমষ্টির সহিত ব্যক্তিমানুষের এক বলিষ্ঠ সুন্দর হৃদয়বিনিময়ের। বিপ্লবী জনসাধারণের মধ্য হইতে এমন এক আবেগময় শক্তির অভ্যুদয় হয় যাহা কেন্দ্রীভুত হইয়া পুনরায় জনসাধারণের মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করে। সমষ্টিগত শক্তিকে নানাপ্রকারের ভাবচিত্রে রূপান্তরিত করিবার যে শক্তি জনগণের নিহিত রহিয়াছে সেই শক্তির দ্বারাই জনগণ ঐ বিদ্যুৎশক্তিকে বহুগুণ বাড়াইয়া তোলে। সৃজনী কর্মোন্মাদনার মহালগ্নে জনগণ এমন একটি

লক্ষ স্থির করিয়া ফেলে, যে-লক্ষে বিপুলতম প্রতিভা লইয়াও কোনো ব্যক্তিবিশেষের একাকী পৌঁছানো সম্ভব নহে। এই বিরাট সংকল্পের উত্তাপে ব্যক্তিমানুষ এক নির্ভীক বলিষ্ঠ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে এবং বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদের অবিশ্বাস ও নিষ্ফল বিলাপের তন্দ্রাজড়িমা তাহার ভাঙ্গিয়া যায়।

এ জীবন নিরানন্দ, নিষ্ফল ও নিস্তরঙ্গ বলিয়া যাহারা বিলাপ করে তাহাদের লক্ষ করিয়া গর্কি বলিতেছেন, "হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, তোমাদের কল্যাণের জন্যই আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি জীবন যেন তোমাদিগকে কঠোর শাস্তিবিধান করে, তাহার রুক্ষ শিরাদীর্ণ হাতের গুরুভার যেন তোমাদের দেহ অনুভব করিতে পারে। ক্ষমাহীন মহা-শিক্ষক এই জীবনের মধ্যে আমরা মানুষেরাই আনিয়াছি আমাদেরই যুক্তি ও আমাদেরই কামনার উত্তাপ। আমি চাই, তোমাদের বিলাপ যে কত অর্থহীন তাহা যেন তোমরা বুঝিতে পার, তোমরা যেন বুঝিতে পার সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াও অভিযোগ করা কতখানি নির্লজ্জতা। আজ মানবজগত নিজেকে ধ্বংস করিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে,—অপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে একটা জাতি আজ মুমূর্ষু প্রাচীন জগতের হিংস্রতম বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছে।

"যদি সত্যিই তোমরা সুস্থ, সুন্দর, উদার জীবন যাপন করিতে চাও, তবে হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, এই অতুল, বিপুল মহানির্মাণপ্রয়াসে অন্য সকলের সাথে অংশ গ্রহণ কর।"

রাশিয়ার এ আহ্বানে আমরা যেন সাড়া দিতে পারি, এ আহ্বান যেন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে। যে কাপুরুষ তরুণের দল বাহিরের রৌদ্রদীপ্ত পৃথিবী হইতে সংকীর্ণ গৃহকোণে নিরাপদ

আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে, যাহারা বণিক-রাজনীতি ও সুবর্ণ সাম্রাজ্য-বাদের পায়ে আত্মবিক্রয় করিতে উদ্যত, কর্মজগত হইতে পলাইয়া যাহারা বদ্ধ ঘরে আর্টের নামে আত্মরতির নিষ্ফল বিলাসে দিন যাপন করিতে চাহিতেছে, তাহারা যেন এই দর্পণে নিজেদের মুখ দেখিয়া লজ্জায় মাথা নিচু করিতে পারে।

নিজেদের অকালবার্ধক্য উপলব্ধি করিয়া পুনর্যৌবন লাভের চেষ্টা করিবার মতো শক্তি যদি তাহাদের দুর্বল দেহে থাকে তবে উত্তরের বাতাসে এই মরা পাতাগুলি যেন উড়িয়া যায়, মানবঅরণ্য যেন সবুজের সমারোহে হাসিয়া ওঠে। ঐ যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দেখিতেছি, "১৬ কোটি মানুষেব এক জাতি কাজে লাগিয়াছে শুধু নিজের জন্য নহে, পৃথিবীর মানুষের জন্য,—জগতের সম্মুখে তাহারা প্রমাণ করিতেছে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সংগঠিত জনসাধারণ কী অলৌকিক সাফল্যই না লাভ করিতে পারে।"

হে ইউরোপের জনগণ, বহু শতাব্দী ধরিয়া তোমরাই ছিলে মানুষের প্রগতিবাহিনীব অগ্রগামী দল। কিন্তু আজ তোমরা পশ্চাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছ। নূতন জগতের নির্মাতাগণের মধ্যে আবার কবে তোমরা তোমাদের স্থান বাছিয়া লইবে?

কিন্তু তোমবা হাত মেলাও বা না মেলাও, নূতন জগতের অভ্যুদয় রোধ করা যাইবে না।

॥ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ॥

॥ মীরাট মামলার বন্দীদের প্রতি ॥

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

আজ নরকের রূপ ধারণ করিয়াছে। বিশেষ সুবিধাভোগী জাতিগুলির—এবং উহাদের মধ্যকার শ্রেণীগুলির ও ঐ শ্রেণীগুলিব মধ্যকাব বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীসমূহের—সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্য হইতে যদি কেহ বাহিরে আসিতে পাবে তবে আজ হোক, কাল হোক এ-সত্য তাহার চোখে প্রতিভাত হইবেই যে, যে সভ্যতা হইতে সে প্রাণরস আহরণ করিতেছে ও যে-সভ্যতা তাহার গর্বের বস্তু পৃথিবীব শতকরা নব্বুইজন অধিবাসীর জঘন্য, নির্মম, পাশবিক শোষণ সে-সভ্যতার বেদী রচনা করিয়াছে। এ উপলব্ধি যখন তাহার মনেব গভীরে প্রবেশ করিবে, তখন জীবনের সমস্ত আনন্দ তাহার মরিয়া যাইবে; জীবনপণ করিয়া এই কর্কট ব্যধিকে নির্মূল করিবার সংকল্প যতদিন না সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে, সে-আনন্দ ততদিন আর সে ফিরিয়া পাইবে না।•

যে বিরাট মেষপাল আগেভাগেই লড়াই ছাড়িয়া চলিয়া আসে, নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহারা বলে, আজ যাহা দেখিতেছি তাহা তো চিবদিনই চলিয়া আসিতেছে, অতএব এ অবস্থার পরিবর্তন করা যাইবে না। এ কথা মিথ্যা কথা। মানুষের ইতিহাসে চিরদিন যেমন একদিকে জাতিব শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর নির্যাতন চলিয়া আসিতেছে তেমনি তাহারই পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য নির্যাতিতের আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর শতকরা নব্বুই জন অধিবাসীর শোষণ ও নিপীড়ন-ব্যবস্থা যে-ভাবে সংহত ও সংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। নিপীড়কের

সংখ্যা এক কি বহু, তাহারা দলে বিভক্ত কি রাষ্ট্রে বিভক্ত, সে প্রশ্নের কোনো মূল্যই আজ নাই। নিপীড়ক আজ একটি বিশেষ ব্যবস্থা ; এ ব্যবস্থা স্বর্ণসাম্রাজ্যবাদ। আন্তর্জাতিক নীতি আজ এই ব্যবস্থাই পরিচালিত করিতেছে। বড় বড় শোষণকারী রাষ্ট্রগুলি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। জাতিতে জাতিতে হিংসা ও বিভেদ এই ব্যবস্থার মূলে রসসিঞ্চন করিতেছে। একটা বিদ্রোহী জাগরণ আজ নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, কাঁপিয়া উঠিতেছে ধনতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতোরণ। এই আলোড়ন যতই বাড়িতেছে, ভাঙ্গনের ভয়ে ধনতন্ত্রীব্যবস্থা যত বেশি উদ্বিগ্ন হইতেছে, নিপীড়নের দানবীয় রূপ ততই নগ্ন ও নির্লজ্জ হইতেছে। স্বেচ্ছাচারকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলি যে আইনের আবরণ ব্যবহার করে, সেটুকু পর্যন্ত আর নাই। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা আজ তাহার মুখোশ খুলিয়াছে। বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া সে একদিন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই বিভীষিকাই আজও তাহাকে কায়েম করিতেছে।

ধনতন্ত্রীশোষণ পৃথিবীর সর্বত্র এই ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের উপর আজ যে দানবীয় নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার তুলনা মেলা কঠিন। রক্তশোষকের দল পাপের পথে আজ এতখানি আগাইয়া গিয়াছে যে, পিছুফেরা আর তাহাদের চলে না, ফিরিলেই তাহাদের মরণ অনিবার্য। ভারতবর্ষকে শুষিয়া নিরক্ত করিয়া গত একশত বৎসর ইংলণ্ড বাঁচিয়া আছে। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইবামাত্রই ইংলণ্ডের টলটসায়মান সম্পদসৌধ ধ্বসিয়া পড়িবে। ইংলণ্ডের মেদস্ফীতির মূলে তাহার পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি। ফ্রান্সের নিকট ইন্দোচীন সাম্রাজ্য শুধু মুনাফার সামগ্রী নহে ; ভাঁটিখানার মালিকদের লইয়া যেমন প্রাচীন রোমক গণতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল তেমনি এ সাম্রাজ্যও ফরাসী গণতন্ত্রের অস্ত্রসজ্জিত

ধনতন্ত্রের মহারথীদের সামরিক ঘাঁটি। আসন্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের জন্য ও চীনকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এই ঘাঁটি ব্যবহার করা তাহাদের লক্ষ।

তাই, যেমন বাংলাদেশে তেমনি আনামে, যেমন বাটাভিয়ায় তেমনি নানোই-এ ও পেশোয়ারে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সামরিক আইনের রাজত্ব চলিয়াছে। হাজার হাজার লোক বছরের পর বছর ধরিয়া জেলে ও বন্দীশিবিরে পচিতেছে। গান্ধীজী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল শুধুমাত্র এই অপরাধে ১৯৩২ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ভারতে ৮০,০০০ নরনারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইয়েন-বে ঘটনার পর হইতে সরকারী স্বীকৃতি অনুসারেই ফরাসী ইন্দোচীনে ৭,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে তিন হাজার ১৯৩৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখেই ধৃত ও দণ্ডিত হন। বন্দীদের মধ্যে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের অপরাধ, ইহারা কর হ্রাস, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহে দৈহিক শাস্তিদান-ব্যবস্থা রহিত করার দাবী জানাইয়াছিলেন। ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী ডাচইণ্ডিজে ১০,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী করা হয়। চীনের বন্দীসংখ্যা ৫০,০০০ (অবাধ হত্যালীলার কথা বাদ দিলাম)। কোরিয়ায় ৩৫,০০০। ইহা ছাড়া, জাপানে হাজার হাজার লোক ধৃত, নির্যাতিত ও দণ্ডিত হইতেছে এবং ইতালীয়, বেলজিয়াম ও পোর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়—নিপীড়নের বন্যা চলিয়াছে। নিষ্ঠুর, কপট, দানবীয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাও দেখিবার মতো। সে আজ দুর্নীতিজর্জরিত কুয়োমিংটাং সেনাপতিগণের পরম মিত্র ও কিউবার হত্যালীলার সমর্থক। অর্থনৈতিক শোষণকে আরো কায়েম করিবার জন্যই ফিলিপিনদের সে স্বাধীনতা দিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার বুকে সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়া রক্তপিপাসু স্বেচ্ছা-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পীড়নকারীর বিরুদ্ধে পীড়িতের বিদ্রোহ যতদিন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটিতেছিল ততদিন দলন ও দমনের কাজ চলিতেছিল দ্রুতভাবে, নিঃশব্দে।

কিন্তু এ বিদ্রোহ যখন ব্রিটিশ ভারতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মত বিরাট গণঅভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিতে শুরু করিল, তখন দমননীতিও সমস্ত মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। এই বিপুল গণতরঙ্গকে অহিংসার সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন এক মহাপ্রতিভা। তাই যে সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া-শ্রেণী কিছুটা আপোস করিয়াও বর্তমান সমাজব্যবস্থা কায়েম রাখিতে চাহে এই সুসংযত অভ্যুত্থান এখনও তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই উদার বিদ্রোহের লক্ষ ভারতীয় স্বার্থের সহিত ব্রিটিশ-স্বার্থের সমন্বয়সাধন। ভাইসরয়ের নির্বোধ আত্মম্ভরিতায় ও কূপমণ্ডুক শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতায় বাধ্য হইয়াই এ আন্দোলন শুরু করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এ আন্দোলনের রূপ বদলাইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের দৃঢ়সংকল্প লইয়া সুসংহত, বৈপ্লবিক, সংগ্রামশীল দলগঠনের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে। নিপীড়িত পৃথিবীর বিদ্রোহ-আন্দোলনে নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে। ১৯২৮ সালে বোম্বাইএ কাপড়ের কলের ধর্মঘট ও গিরনি কামগড় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হইতেই ইহার সূত্রপাত; অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইহার সূচনা মাত্র ৫ বৎসর পূর্বে। আনামে হয় আরো পরে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েৎ-নাম-কোক্-দান-দাংএর (অর্থাৎ ইন্দো-চীনের কুয়োমিংটাং, ইহারা ইয়েনবের উপর জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণ সমর্থন করে) সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই দলনের রথচক্র চলিতে শুরু করিল। ইন্দোচীনে স্থাপিত হইল এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চিরস্থায়ী বিচারালয়—ক্রিমিনাল কমিশন অব সাইগন। এখানে বিচার চলিবে রুদ্ধ-কক্ষে, কৌঁসুলী মনোনীত করিবেন স্বয়ং সরকার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী কোনো দলিল ও কাগজপত্র দেখিবার অধিকার তাহার থাকিবে না। এই কমিশনের বিচারে ১৯৩২ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত ১,০৯৪ জন দণ্ডিত হইয়াছে; উহাদের মধ্যে ৮৩ জনের হইয়াছে মৃত্যু দণ্ড, ১৩০ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪২০ জনের নির্বাসন। আগামী মার্চ ও এপ্রিল মাসে আনামের ১৮০ জন বিপ্লবীর বিচারের জন্য কমিশন এখন প্রস্তুত হইতেছেন।

ইন্দোচীনের রুদ্ধকক্ষের বিচারব্যবস্থায় যেমন অবিচার ও পক্ষপাত নির্লজ্জভাবে প্রকটমান ব্রিটিশ ভারতের বিচারব্যবস্থায় সেরূপ নহে। সেখানে বৈধতার একটা ছদ্মবেশ সযত্নে রক্ষা করা হয়। তাই, ব্রিটিশ ভারতের বিচারযন্ত্রটি আরো বেশি ভারী, সেকেলে ও জবরজঙ্গ। সম্প্রতি মীরাটে এই বিচারযন্ত্রটি একটি চারি বৎসর ব্যাপী দানবীয় মামলা শেষ করিয়াছে এক কলঙ্ককর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া। ১৯২৯ সালের জুন মাস হইতে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই মামলা চলিয়াছে। ২,৬০০ দলিলপত্র ও হাজার হাজার ছাপা কাগজে যেন কাগজের পাহাড় উঠিয়াছিল; এই অর্থনৈতিক চরম দুর্গতির দিনে ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা; দণ্ডাদেশ যাহা দেওয়া হইয়াছে অভিযোগের সহিত তাহার অসঙ্গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ অসঙ্গতি এত চোখে লাগে যে উদারনৈতিক মধ্যপন্থী ইংরাজেরা পর্যন্ত ভীরুকণ্ঠে ইহার কিছুটা প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বের জনমতকে এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা উচিত মনে করি, কারণ, এ-বিচার শুধু যে ২৭ জন অভিযুক্তের বিচার তাহা নহে, এ-

বিচার সেই সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার যাহা ঐ ২৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে। নিখিলভারত শ্রমিক ও কিসান পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর. এস. নিম্বকরের বিচার হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে ব্রিটেনের লিবারেল শুধু যে এই বিচার-ব্যবস্থায় দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্তন করিতে অসমর্থ তাহা নহে, গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাশব্যবস্থা যে অবৈধ পদ্ধতি অথবা অসাধারণ বৈধ পদ্ধতি দ্বারা তাহার সাম্রাজ্যের ষষ্ঠি-সপ্তমাংশ অর্থাৎ বিশ্ববাসিগণের এক ষষ্ঠাংশের বিচার কার্য পরিচালনা করিতেছে তাহা বুঝিবার মতো ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

কিন্তু, সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা এই যে, লেবর গভর্ণমেণ্ট সব কিছু জানিয়াই এই বিচারপদ্ধতি অনুসরণের অনুমতি দিয়াছেন অর্থাৎ মামলাটি চালাইয়াছেন। যে বুর্জোয়া লিবারেল আন্দোলন হইতে পার্টির জন্ম হইয়াছে সেই আন্দোলনের নীতিগুলিই লেবর গভর্ণমেণ্ট এইভাবে পদ-দলিত করিয়াছে ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের উদাসীনতার সুযোগ লইয়া। এইভাবে সাম্রাজ্যের সাত ভাগের ছয় ভাগ লইয়া যে দেশ, সেই ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে লেবর গভর্ণমেণ্ট নির্মূল করিতে চাহিতেছে ব্রিটেনের বিভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগিতায়। ব্রিটেনের তথা ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন যদি আজও এই কলঙ্ক বহন করিয়া চলে, যদি আজও তাহার শুভবুদ্ধির উদয় না হয়, যদি নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আজও তাহারা প্রতিবাদ না জানায়, তবে এ-পাপের গুরুভারে তাহারা নিজেরাই পিষিয়া মরিবে।

আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মহা আড়ম্বরে ডেরচেস্টরের শহীদ শ্রমিকদের আসন্ন স্মৃতি-বার্ষিকীর আয়োজন করিতেছে। ১৮৩৫ সালে এই শহীদেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছিল; আজ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাহাদের স্মৃতিপূজার আয়োজন চলিয়াছে। অথচ, ও-দিকে এই আন্দোলন শুরু করিবার

জন্য মীরাটের কয়েকজন কর্মীকে যথাক্রমে যাবজ্জীবন, বারো বৎসর, দশ বৎসর, সাত বৎসর ও পাঁচ বৎসরের অবর্ণনীয় দুঃসহ অবস্থায় নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। (ইহাদের মধ্যে তিনজন মহাপ্রাণ ইংরেজও আছেন। তাহাদের নাম, ফিলিপ স্প্র্যাট, বি. ডি. ব্র্যাডলে ও লেস্টার হচিন্‌সন। ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে ভারতীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। চারি বৎসরের হাজতবাসের মধ্যে মীরাট মামলার একজন আসামীর মৃত্যু হয়।) ইহাদের একমাত্র অপরাধঃ ইহারা ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ নরকযন্ত্রণার মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের আত্মরক্ষায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবার যে-কোনো প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে চাহে। বিশ্বের শ্রমিকেরা কি তাহাতে বাধা দিবে না? বিশ্বের লেখক ও চিন্তাজীবিগণ কি নীরব থাকিবেন?

কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবী উভয়ের নিকটই আমরা আবেদন জানাইতেছি। ভারতীয় শ্রমিকদের যে ভয়াবহ শোষণ চলিয়াছে, তাহাদের অর্ধাহারে ও অবসন্ন ভগ্নস্বাস্থ্যে রাখিয়া তাহাদের জমাট বুকের রক্ত পিণ্ডে পরিণত করিয়া যে-ভাবে আপনার অতল উদর-গহ্বরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উহা অদৃশ্য করিয়া দিতেছে আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যে সকল তেজস্বী পুরুষ এই পাপ ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে আইন-ভঙ্গের কোনো অভিযোগ আনা যায় নাই (১৯৩৩ সালের মার্চমাসে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত সরকার নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন) তাহাদিগকে এইভাবে স্বেচ্ছাচারীর মতো গ্রেপ্তারকে আমরা তীব্র নিন্দা করিতেছি। স্প্র্যাট 'উৎপাদন ও বণ্টনের উপকরণসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার কথা' কহিয়াছিলেন। ইহা তো লেবর পার্টির যে-কোনো

সদস্যই বৈধভাবে বলিয়া থাকেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীও আদর্শত্যাগের পূর্বে বহুবার বলিয়াছেন। তথাপি স্প্র্যাটকে ঐ কথা বলিবার জন্যই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। অভিযোগ সম্পর্কে এই হাস্যকর অজ্ঞানতা ও দুরভিসন্ধির তীব্র প্রতিবাদ করি। সম্রাটকে তাহার সার্বভৌম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা বলিয়া যে অভিযোগ আনা হইয়াছে সে অভিযোগের আমরা প্রতিবাদ করি। এ ইচ্ছা যদি অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেক গণতন্ত্রীই অপরাধী। যে-দেশে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম সেই দেশই ভারতবর্ষের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনকে দলন করিবে—ইহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক আঘাতের আমরা প্রতিবাদ করি, এ আন্তর্জাতিকতা শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য ; শুধু তাই নয়, শোষণ-শক্তির আন্তর্জাতি-কতার বিরুদ্ধে একান্ত প্রাণধারণের দায়েই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন। আমরা মীরাট মামলার প্রকাশ্য পরিবর্তন দাবী করি। অভিযুক্তদের আমরা সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানাইতেছি।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য সমগ্র জগত ব্যাপিয়া আজ যে মহা-সংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে যে হাজার হাজার মানুষ আত্মাহুতি দিয়াছে মীরাট মামলার আসামিগণ আমাদের চোখে তাহাদেরই জীবন্ত প্রতীক। ইহাদের জীবন ব্যর্থ নহে, ইহাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আমরা এক বিজয়-বার্তা পাঠ করিতেছি। কারণ, শোষকের করাল দ্রংষ্ট্রাকে ইহারা জগতের চোখে প্রকট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু তাই নয়, যে নূতন বিদ্রোহশক্তি মানবসমাজকে আলোড়িত করিতে শুরু করিয়াছে তাহার অনিবার্য বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইহাদের জীবনের মধ্যে পাঠ করিতেছি। ইহাদের রুখিবে কে ?

॥ ইন্দোচীনে সায়গণের নিপীড়িতদের প্রতি ॥

দালাদিয়ের-এর ফ্রান্স যেন 'স্বাধীনতার শেষ দুর্গ'। কিন্তু, এই 'স্বাধীনতার দুর্গ' কোন স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতেছে?

এ প্রশ্ন কর ইন্দোচীনকে; এ প্রশ্ন কর সেই দশহাজার আনামবাসীকে যাহারা পাওলো-কেদের ও লা গুইয়ান জেলখানায় মরিতে বসিয়াছে। জিজ্ঞাসা কর যাহাদের গুলি করিয়া মারা হইয়াছে আর যাহারা ফাঁসীতে ঝুলিবার জন্য দিন গণিতেছে। জিজ্ঞাসা কর সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জাতিকে। দালাদিয়ের-এর দুর্গ কার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে? শোষকের স্বাধীনতা? পীড়কের স্বাধীনতা: যাহারা নিজেদের জাতির স্বাধীনতার দাবী কবিয়াছে অথবা শুধুমাত্র জাতির জীবনযাত্রার আর একটু সহনীয় অবস্থার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসিতে পাঠাইবার স্বাধীনতা?

হাসি পায়। আমরাই ভারতবর্ষের মীরাট মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিয়াছি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেখানে ২৭ জন কর্মীকে ৪ বৎসব ব্যাপী এক মামলার পব নির্বাসনে পাঠাইয়াছেন। জনমতের প্রবল দাবীর সম্মুখে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সেখানে কিছুটা পিছু হাটিতে হইয়াছে; তাহারা দণ্ডাদেশের পরিবর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। আজ মনে হইতেছে সায়গনের দণ্ডাদেশের সহিত তুলনায় এ দণ্ডাদেশ তো কিছুই নয়। তিনবৎসর কারারুদ্ধ রাখিয়া ইন্দোচীনের আটজন শ্রমিককে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা, ১৮ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং শতাধিক আসামীকে সর্বসমেত নয়শত বৎসর গুরুশ্রমের দণ্ড সেখানে দেওয়া হইয়াছে।

এই গভর্ণমেণ্টই আজ বিবেকের নামে ফাশিজমের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। এ নৈতিক অধিকার

ইহার নাই। যে দালাদিয়েরের গভর্ণমেণ্ট বিবেকের আহ্বানে যুদ্ধ-বিরোধী-গণকে নির্যাতিত করিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে স্বদেশরক্ষা ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিকের শুধু অধিকার নহে কর্তব্যও বটে সে যেন সেই সব দেশের নাগরিকদের ঐ একই কর্তব্য ও অধিকার স্বীকার করিয়া লয় যে সকল দেশকে ফ্রান্সেরই বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া শোষণ করিতেছে। আমরা সায়গনের বন্দীদের মুক্তি চাই। মুক্তিলাভ তাহাদের অধিকার, মুক্তিদান আমাদের কর্তব্য।

॥ ইউরোপে ফাশিজম্ ॥

১। হিটলারী ফাশিজম্

২রা মার্চ, ১৯৩৩

অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিটলারের বিভীষিকা মুসেলিনীর বিভীষিকাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। যে-প্রভুর পদতলে বসিয়া ও যাহার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া হিটলারী ফাশিজম্ আপনাকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়াছে সেই ইতালীয় ফাশিজম্ দশবৎসরে যতখানি নির্বিকার হিংস্রতার পরিচয় দিতে পারে নাই, সে তাহার বেশি দিয়াছে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। যে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া সেই হিংসার নরক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহা যে কতবড় প্রতারণা এবং তাহার পশ্চাতে যে কতখানি পুলিসের প্ররোচনা ছিল তাহা জানিতে আজ ইউরোপের কাহারও বাকী নাই, এই প্রতারণা ও অপপ্রচার; ন্যায়ের গণ্ডীর এই নির্লজ্জ উল্লঙ্ঘন; হিংস্র, প্রগতিবিরোধী দলবিশেষের হাতে এই যে সমস্ত সরকারী ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া; শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরে পর্যন্ত রাজনীতির এই উদ্ধত অনধিকার প্রবেশ, স্বাধীন মতপ্রকাশে সাহসী যে দু একজন লেখক ও শিল্পী সেখানে আজো অবশিষ্ট আছেন তাহাদের এই নির্যাতন ও বিতাড়ন; শুধু সোশালিস্টদের নিকটে নহে,

বুর্জোয়া লিবরেলদের নিকটেও যাহারা পরম শ্রদ্ধার পাত্র তাহাদের গ্রেপ্তার, সমগ্র জার্মানিতে সামরিক স্বেচ্ছাশাসন প্রতিষ্ঠা এবং যে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর বর্তমান সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে তাহা প্রত্যাহার—ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। দল ও মত নির্বিশেষে ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত লেখক ও জনমতবাহী প্রতিষ্ঠানকে আমরা এই আহ্বান জানাইতেছি যে, মানুষের ও নাগরিকের মৌলিক সম্মানকে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া এই যে নির্বিবেক বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হইয়াছে, আসুন আমরা সকলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ইহার অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানাই।

২। জার্মান হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে

২০শে মার্চ, ১৯৩৩

আমি রোগশয্যায়। তথাপি আমি চাই না, জার্মান হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আপনাদেব এই প্রতিবাদ সভায় আমাব কণ্ঠ নীবব থাকিবে। বিশ্বের বিপ্লবী জনগণেব প্রচণ্ড মুষ্টির প্রবল আঘাতে এই ঘাতক ও পীড়কের দল যেন চিরদিনের মতো শেষ হইয়া যায়। এই উন্মাদ নপুংসকের দল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইউরোপকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া আনিয়াছে। যে অন্ধকাব আজ সেখানে নামিয়া আসিয়াছে ততখানি অন্ধকার বোধহয় চতুর্থ হেনরী কর্তৃক প্রটেস্ট্যাণ্ট নির্যাতন পুনঃপ্রবর্তনের দিনে অথবা সেণ্ট বার্থেলমিউ-র হত্যাকাণ্ডের দিনেও ছিল না।

আশ্রয়প্রার্থীদের আসুন আমরা সুস্বাগত জানাই, নির্যাতিতদের সম্মুখে আসুন আমরা মস্তক অবনত করি। তাহাদের রক্ত কখনও বৃথা যায় না। এই রক্তই পাপিষ্ঠদের শ্বাসরোধ করিয়া মারিবে। যে আদর্শের জন্য এই শহীদেরা প্রাণ দিতেছেন, তাহা আমাদের কাছে পবিত্র। এ আদর্শ জয়ী হইবেই।

৩। জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে কোনো জার্মান বন্ধুর নিকট লিখিত পত্র

৩১শে মার্চ, ১৯৩৩

'ফাশিজম্-এর পাশবিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমি ততটা বিচলিত হই নাই যতটা হইয়াছি ফাশিজম্-বিরোধী দলগুলির প্রায় বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে।' আপনি লিখিয়াছেন নিজের পরাজয়ের অনিবার্যতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হওয়ার ফলে আজ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঠিক ইহাই তো তাহার সব চেয়ে বড় পরাজয়. ইহাই তো তাহার দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু কর্মই যে-পার্টির মূলনীতি সে-পার্টিকে পরাজয়ের ভয় করিলে চলিবে না। পরাজিত হইবার সাহস থাকা চাই কিন্তু এ-পরাজয় অস্ত্রত্যাগ করিয়া নহে, যুদ্ধ পরিহার করিয়া নহে, মার্জনা ভিক্ষা বা আপোস আলোচনায় সম্মত হইয়া নহে! যাহারা নূতন জগত গড়িবে তাহাদের সকলের পক্ষেই ইহা কর্মের অন্যতম মূলনীতি। সমগ্র ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে। এক বা একাধিক রক্তাক্ত পরাজয়ের অগ্রিম মূল্য না দিয়া সমাজ-সংগ্রামে কোনো বড় জয়লাভ সম্ভব হয় না। ১৮৭১ সালের পারি কমিউন ও ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লব না হইলে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্ভব হইত না। কি চাই তাহা আমার জানিতে হইবে। আজিকার অধঃপতিত সোশালিস্টদের মতো তাহারা যদি সর্বপ্রকারের বিপদ এড়াইয়া শুধু আত্মরক্ষাই করিতে বলে তবে কর্মক্ষেত্র হইতে তাহাদের সরিয়া যাইতে হইবে। তাহারা শুধু লাইব্রেরীতে বসিয়া বসিয়া নোট টুকিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কোনো নেতারই নির্দেশদানের অধিকার নাই। জনগণের স্বার্থের প্রতি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। লেনিন যেমন তাহাদের ধিক্কার দিবেন, তেমনি দিবেন গান্ধীও। কারণ 'হিংসা অথবা অহিংসা' মূল প্রশ্ন নহে; মূল সমস্যা

'কাজ'। এই মহাসংকটমুহূর্তে দায়িত্ব ত্যাগ করা ও পলাইয়া যাওয়া চলিবে না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পরাজয় আনে শত্রু নহে, মানুষ নিজে এবং এ পরাজযের পঙ্ক হইতে উদ্ধারলাভ অসম্ভব।

৪। জার্মানিতে ইহুদীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩

আজ জার্মানিতে ইহুদীদের যে নির্লজ্জ দলন চলিযাছে, তাহাতে শাসক বর্গের নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতার মধ্যে কোনটাকে ধিক্কার দিব বেশি, বুঝিযা পাই না। শাসকগণ দেশের মানস ও বাস্তব সম্পদের একাংশ নিবিষ্টচিত্তে ধ্বংস করিতেছেন—গত কযেক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম মহাদেশে এ দৃশ্য আর দেখা যায নাই। সমস্ত দৃশ্য অর্থহীন হইতে বীভৎসতার পর্যাযে গিযা দাঁড়ায (যদি ইহাকে মর্মান্তিক না বলি) তখনই যখন দেখি, নিজেদের যাহারা জাতীযতাবাদী বলিযা পরিচয দিযা থাকেন, তাহারাই জাতির সবচেযে বড় শত্রুর কাজ করিতেছেন। শক্তি ও সংস্কৃতির এই 'রক্ষাকারীদের' মধ্যে একটা নির্মম অজ্ঞতা দেখিতেছি। তাহারা ভুলিযা গিযাছেন ক্লাসিকাল যুগের যে মহান জার্মানগণের সৃষ্টি ও ভাবধারাকে রক্ষা করিতেছেন বলিযা তাহারা প্রচার করিতেছেন তাহারা এবং পুণ্যশ্লোক লেসিং ইহুদীদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। ন্যাথান দি ওযাইস এর লেখক হিটলারের হাতে নিহত হইযাছেন। বাহিরের জগতের চোখে হিটলারবাদী গোযেবল্‌সের মতো বিদ্বেষবিকৃত বর্বর নিরক্ষরদের দ্বারা মহান জার্মান জাতির সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন অধিকার ছাড়া আর কিছুই নহে। 'মানুষের বিভিন্ন জাতির বৈষম্য' সম্পর্কে গোবিনিয়ানের কতকগুলি অদ্ভুত আপাত-বিরোধী উক্তি এবং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটা অন্ধ দম্ভ গোয়েবল্‌সের দুর্বল ও হিংস্র মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছে।

এই শাসকদের দুষ্কৃতির জন্য জার্মান জাতি অপরাধী নহে। তাহাদের সহিত আমরা বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিব; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কামনাও আমরা করিব যেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহারা এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটাইয়া উঠিতে পারেন।

৫। জাতিবাদ ও ইহুদীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৩

সর্বপ্রকারের জাতিভেদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছি। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে উহা নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ। 'জাতি' সম্পর্কে অর্থহীন ভ্রান্ত ধারণার কথা এখানে আলোচনা করিতে চাহি না। (সার্বজনীন জীবনস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন একান্ত সংস্কৃতিহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ভিন্ন বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া আজ কিছু নাই।) জাতির সহিত জাতি মিশিয়া যে নিখিল মানুষ সম্ভব হইয়াছে তাহারই সম্মিলিত কীর্তি এই বর্তমান সভ্যতা। ইহার মধ্যে কাহার কীর্তি কতটুকু ভাগ করিতে যাওয়া হাস্যকর পাগলামি। এ কথা সবচেয়ে বেশি করিয়া খাটে ইহুদীজাতি সম্পর্কে। (ইহুদী জাতিও একটি জাতি, অন্তত তিন চারটি বিভিন্ন জাতি ইহার মধ্যে রহিয়াছে।) ইউরোপের সম্পদ ও সংস্কৃতিতে এ জাতির দান অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়া আছে। স্পিনোজাকে বাদ দিলে আপনাদের গ্যয়টে দাঁড়াইবেন কোথায়? আজ আপনাদের গোরিং বর্বরতার উত্তুঙ্গশিখরে দাঁড়াইয়া চরম ঔদ্ধত্যের সহিত আইনস্টাইনের পবিত্র নামকে অসম্মান করিতেছে। আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃতির জগতে নিউটনের যে স্থান ছিল আজ সেই স্থান আইনস্টাইনের? সমস্ত বিচ্যুতি ও অপরাধ লইয়াই ইহুদীদের যোগ্যতার পরিমাপ করা হউক। এ বিচ্যুতি ও অপরাধ সম্ভবত তাহাদের কীর্তি

ও প্রতিভার বিপরীত। বিচ্যুতি ও কলঙ্ক অপর কোন জাতির না আছে? প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভালো ও মন্দ মিশিয়া আছে। কোনো জাতিই বলিতে পারে না সে-ই বিধাতা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত।

এ কথা যদি সত্য হয় যে জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম মহাদেশের ইহুদীরা অনেক বেশি চাকুরী ও পদ অধিকাব কবিয়া আছে, তবে দেখিতে হইবে তাহাদের এই সিদ্ধিব মূলে দক্ষতা অথবা শঠতা বহিয়াছে। যদি শঠতা থাকে তবে অবশ্য আন্দোলনেব প্রযোজন আছে; (যদিও সে আন্দোলন হইবে সুবিচাবেব আন্দোলন, হিংসাব আন্দোলন নহে)। আর যদি এ সিদ্ধির মূলে থাকে তাহাদের দক্ষতা, তবে আমি বলিব তাহাবা অন্যায় করে নাই। যাহাবা ইহা লইয়া অভিযোগ জানাইতেছেন তাহারা আগে উহাদেব মতো অথবা উহাদেব চেযে দক্ষতা অর্জন করুন। মনের সহিত মনেব স্বাধীন সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মানুষের সভ্যতা আগাইয়া চলে এবং সমগ্র সমাজ ইহাতে লাভবানই হয়!

আমি জানি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে সংগ্রাম বড় কঠোব। আমার চেয়ে এ-কথা কে বেশি জানে? সমস্ত জীবন ধরিযা এ সংগ্রাম আমাকে কবিতে হইয়াছে; এবং চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বদ্ধ আবহাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ করিযা আমাকে কাটাইতে হইয়াছে? কিন্তু তাহার কি আসে যায়? এই সংগ্রমই জীবন। শুধু চাই সংগ্রাম করিবার শক্তি, শুধু মনেব শক্তি লইয়া সংগ্রাম চালাইবার সামর্থ্য। যাহারা তোমার পথের বাধা পুলিসী বলপ্রয়োগে তাহাদের নির্মূল করিতে যাওয়া কাপুরুষতা। পুলিসকে যে ডাকিবে অপমান তাহারই; আর পুলিসী বলপ্রয়োগের ফলে যে লাভবান হইবে তাহার অপমান আরও বেশি।

সর্বপ্রকার ফাশিজম্-এর আমি শত্রু। কিন্তু এ কথা আমি বলিব যে হিটলারের জার্মানির মতো এতখানি সর্বনাশা জাতিবাদ মুসোলিনীর

ফাশিজম্ কোনোদিন গ্রহণ করে নাই। ইহার কারণ হয়তো ইতালীতে ইহুদীদের সংখ্যা অনেক বেশি, পদমর্যাদায়ও তাহারা উঁচু। যুদ্ধের আগে পনের-কুড়ি বৎসর ধরিয়া কখনো ইহুদী লুৎসাত্তি কখনো জিওলিত্তি প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াছেন। আজো সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যে বহু ইহুদী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। ইহুদীই হোক, কালোই হোক, পীতই হোক—যাহার সহিত তাহার মতবিরোধ নাই তাহার সহায়তা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার বাসনা মুসোলিনীর কোনোদিন ছিল না। কিন্তু হিটলারের ফাশিজম্ জাতিকে রক্ষা করিবার আজুহাতে ইহুদীদের নিপীড়িত ও নির্বাসিত করিয়া জাতির বাস্তব ও মানসসম্পদকে ধ্বংস করিতেছেন। এ-পাপ শুধু আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে নহে, জাতির বিরুদ্ধে। এই সর্বগ্রাসী ভুলের মাসুল জার্মানিকে বহুদিন ধরিয়া দিতে হইবে।

৬। 'কোয়েলনিসে ৎসাইতুং' পত্রিকায় লিখিত পত্র

১৪ই মে, ১৯৩৩

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের পত্রিকার ৯ই মে তারিখের সংখ্যায় আপনারা আমার সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ-কথা খুবই সত্য যে জার্মানিকে আমি ভালোবাসি, এবং বিদেশী অবিচার ও নিপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যও আমি আপ্রাণ করিয়াছি।

কিন্তু এ জার্মানি তো সে জার্মানি নয়। আমার ধ্যানের জার্মানি সেই মহান বিশ্ব-নাগরিকদের জার্মানি যাহারা নিজের জাতির মতো অপর জাতিরও সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেন এবং জাতিতে জাতিতে মানবতার সেতুবন্ধন করিতে যাহাদের চেষ্টার অবধি ছিল না।

সে জার্মানি আজ রক্তাক্ত, ধূলিলুণ্ঠিত, স্বস্তিকাধারী জার্মানির 'জাতীয়তাবাদী

নেতাদের দ্বারা পদদলিত'। এ জার্মানি আজ তাহার আশ্রয় হইতে মনস্বীদের, ইয়োরোপীয়ানদের, শান্তিবাদীদের, ইহুদীদের, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের,—অর্থাৎ এককথায় যাহারা শ্রমজীবীর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করিতে চাহেন তাহাদের সকলকেই দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। আমি বিস্মিত হইতেছি এই ভাবিয়া যে এই 'জাতীয় ফাশিস্ট' জার্মানি যে আসল জার্মানির সবচেয়ে বড় শত্রু এ-কথা আপনারা বুঝিতেছেন না কেন? এই নীতি শুধু সভ্যতার বিরুদ্ধেই অপরাধ নহে। নিজের জাতির বিরুদ্ধেও ইহা অপরাধ। এই নীতিব ফলে জাতির সৃজনীশক্তির একটা বড় অংশ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, পৃথিবীতে আপনাদেব শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের চোখে আপনাবা শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। প্রত্যেক দেশের জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের আপনাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনাদের ফুরারগণ। ইহা আপনারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। আপনারা শুধু জার্মানির বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের কথাই বলিতেছেন। এ ষড়যন্ত্র যদি কেহ করিয়া থাকে তবে সে তো আপনারাই।

উনিশ শো আঠারো সালের বিজয় লাভেব পর মিত্রশক্তিগণ জার্মানির প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাইয়াছি। তাহার উপর জোর কবিয়া যে ভের্সাইয়ের সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমি তাহার পরিবর্তন দাবী করিয়াছি।

আপনারা কি মনে করেন এই সকল দাবী আমি তুলিয়াছিলাম, আরো বড় অবিচারের জন্য? আপনারা কি মনে করেন এই সকল দাবী আমি তুলিয়াছিলাম সেই জার্মানির জন্য যে জার্মানি নিজে সমস্ত জাতিব সমান অধিকারের নীতিকে এবং মানুষের সমস্ত পবিত্র অধিকার-গুলিকে নিজে পদদলিত করিয়াছে। জার্মানির উপর যে সকল অন্যায় সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে সে-সবের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিরোধিতা করিতেছেন আপনারা নিজেরাই। ভের্সাই বিজয়ীদের অন্ধ ও নিষ্ঠুর

অবিচার গত পনেরো বৎসর ধরিয়া জার্মান জাতির মধ্যে যে-হতাশার বিকার সৃষ্টি করিয়াছে সেই বিকারই আজ আপনাদের এই সর্বনাশ অভিযানের মূলে। ভবিষ্যতে যখন আপনাদের চোখ খুলিবে তখন আর সময় থাকিবে না।

আমার দিক হইতে আমি এইটুকু বলিতে চাই আপনাদের সমস্ত বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া আমি জার্মানিকে, আসল জার্মানিকে চিরদিনই ভালোবাসিব—আমার সে জার্মানি আজ হিট্‌লারী ফাশিজম্-এর পাপে কলঙ্কিত। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে লইয়া সর্বমন ও সর্বমানবের একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা আমি চিরদিন করিয়া আসিতেছি। কোনো একক জাতির অহমিকাকে পরিতৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার জীবনব্যাপী এই সাধনা আমি মৃত্যু পর্যন্ত চালাইয়া যাইব!

আর. আর

হিট্‌লারের ফাশিজম্-এর সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল অভিযোগ বাহির হইয়াছে আপনারা বলিতেছেন সেগুলি মিথ্যা।

হিটলার গোয়েরিং গোয়েবল্‌স-এর যে সকল বক্তৃতা ও ঘোষণা বেতারে ও সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, সেগুলির সত্যতা কি আপনারা অস্বীকার করিতে চান? তাহাদের হিংসাত্মক কার্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলা, ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের অভিযান পরিচালনা করা প্রভৃতি যে-সকল মধ্যযুগীয় অন্ধ বর্বরতা পশ্চিম ইউরোপ বহুকাল হইল কাটাইয়া উঠিয়াছে সেইসকল পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তাহাদের প্রকাশ্য প্রচেষ্টার কথাও আপনারা অস্বীকার করিতে পারেন না। জার্মানিতে বই পোড়াইবার কথাও পৃথিবীতে সকলে জানিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যান্য শিক্ষালয়গুলিতে

রাজনীতির উদ্ধত অনধিকার প্রবেশ কি সত্য ঘটনা নহে? আপনারা কি মনে করেন যে-সকল বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক আজ জার্মানি হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন তাহাদের কথার চেয়ে আপনাদের নির্বোধ শাসকদের নির্লজ্জ অপপ্রচারকে পৃথিবীর লোক বেশি বিশ্বাস করিবে?

আর. আর

৭। তরুণদের প্রতি

১৭ই মে, ১৯৩৩

ফাশিজম্-এর মুখোশ একটি নহে। যে-কোনো জাতির রূপই ইহা ধারণ করিতে পারে। ইহার অঙ্গে কখনো সামরিক বেশ, কখনও ধর্মযাজকের পোশাক, ইহার রূপ কখনো ধনতন্ত্রী কখনো গণতন্ত্রী, কখনো-বা সমাজতন্ত্রী। সংস্কৃতির সর্বপ্রকার তরল মিশ্রণের মধ্যেই ইহার জীবাণু বাড়িতে পারে। কিন্তু যে-মুখোশই ইহার মুখে থাকুক না কেন মূল প্রকৃতি ইহার সর্বত্রই এক—ইহা জাতীয়তাবাদী। ইহা সব কিছুকে জাতি ও জাতির সহিত একাত্মীকৃত একনায়ক রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকারে বাধ্য করে, যাহাতে সব কিছুকেই সে শৃঙ্খলিত করিতে পারে।

আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিব, জাতীয়তাবাদই আমাদের শত্রু। তরুণ সহকর্মিগণ, এই বাণীই আমাদের রণধ্বনি হউক। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের মধ্য হইতেও উহা নির্মূল করিয়া ফেলিতে হইবে। আমরা যেন নিজেদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি। ইহা মরিয়াও মরিতে চাহে না, ইহার শিকড়ের সবটা সহজে উঠিয়া আসিতে চায় না। যাহারা হিটলারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধ্বনি তোলেন তাহাদের অনেককেই তাহাদের জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে, জাতীয়তাবাদই প্রেরণা যোগায়। সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং গত যুদ্ধ হইতে আমাদের পরিচিত সরকারী সম্মানধারী বুর্জোয়াদের কাগজগুলিতে অবশ্য প্রথম হইতেই

যুদ্ধের আহ্বান শোনা যাইতেছে। 'শেষ পর্যন্ত লড়াই' 'কখনও ভুলিও না' প্রভৃতি কথাও শুনিতেছি। কিন্তু আমাদের অভিযান ইহাদের সঙ্গে নহে। অবশ্য ভুলিব না আমরাও।

আমরা ভুলিব না যে হিটলারী ফাশিজম্-এর জন্য আসল দায়ী তাহারাই; কারণ বিজেতাদেব অন্ধ প্রতিহিংসার ফলে বিজিত জাতির মধ্যে যে হতাশা ও বিকারেব ঢেউ আসিয়াছিল তাহার মধ্য হইতেই হিটলারী ফাশিজম্--এর জন্ম। আমবা ভুলিব না জাতিব বিরুদ্ধে জাতির সর্ব-নাশা বিদ্বেষেব আগুনে তাহারাই তো চিবদিন আহুতি দিয়া আসিতেছেন: জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদের শত্রু আমরা। যদি কোনো বিদ্বেষের বিষ আমাদেব মধ্যে জমা হইয়া থাকে তবে তাহা জাতিবিদ্বেষেব স্বার্থান্ধ প্রচাবকদেব জন্য আমরা তুলিয়া বাখিব। জার্মানিব, ইতালীব এবং ডুচে ও ফ্যুরাব শাসিত সবদেশেবই দুর্গত জনসাধাবণেব বন্ধু আমবা। আমবা আজ এখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছি 'স্বেচ্ছাচাবীদেব বিরুদ্ধে' (তরুণ শীলাবেব এই কথাটি ফরাসী বিপ্লব গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিল)। ধনতান্ত্রিক নিপীড়ন হইতে যে সকল জাতি মুক্তিব জন্য সংগ্রাম কবিতেছে তাহাদেব লইয়া আমরা একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গড়িতে চাই। আমবা কোনো একটি বিশেষ জাতির জন্য লড়িতেছি না। শুধু আমাদেব নিজের জাতির জন্যও নয়। আমরা যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নেব পক্ষ সমর্থন কবিয়া লড়াই করিতেছি তাহার কারণ সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কোনো একটি জাতি নহে, রাশিয়া নহে, ইহা বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ গণতন্ত্রগুলির এক সম্মেলন। এই সম্মেলন বর্তমানের, ভবিষ্যতের, আমার, তোমার অর্থাৎ পৃথিবীর যে-কেহ উহাতে থাকিতে চাও সকলেরই।

নিজেকে ও নিজের জাতিকে ভালোবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু এ এক আদিম প্রবৃত্তি; এ ভালোবাসা আজ সমস্ত মানুষের

ভালোবাসায় বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হওয়া উচিত। এমন কি প্রত্যেক জাতির স্বার্থের জন্যই ইহার প্রয়োজন। কারণ এমন সময় আসিয়াছে যখন বহির্বিশ্বের জাতিসঙ্ঘকে সে যদি ধ্বংস করে তবে সে নিজে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাই, আজ সমস্ত জাতিকে জাতীয়তাবাদী ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। কারণ ফাশিজম্ই জাতিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া এককে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত করিতে চাহিতেছে!

কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি নহে। যুদ্ধের জাতীয়তাবাদ--তার কণ্ঠে "ভ্য-তেন-গুয়ের" গান। শান্তির জাতীয়তাবাদ—সেখানে মুনাফা শিকারীর প্রভুত্ব। ফরাসী তরুণদের মধ্যে এমন দল আছে যাহারা 'বাস্তব বোধের' গর্ব করে এবং 'স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদে' উহার পরিতৃপ্তি খোঁজে। তাহারা বলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া আমরা যেন নিজেদের সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। অথচ জার্মানিতে সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, শান্তিবাদী ও ইহুদীদের যাহারা দলন করিতেছে; আমেনদ্যা, মাত্তেওত্তি ও গ্রামস্কিকে যাহারা হত্যা করিয়াছে: পোনজা ও লাপারী দ্বীপপুঞ্জে যাহারা সান্ত্রীশাসন বসাইয়াছে তাহাদের দিকে ইহারাই সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে।

এই স্থূল স্বার্থপরতার আমরা প্রতিবাদ জানাই। এই অদূরদর্শী বাস্তববাদের ফলে আমরা একটা গোপনচক্রান্তে জড়িত হইয়া পড়িব এবং উহার কবলিত হইব। ফাশিস্ত শত্রুকে পরাজিত করিতে হইবেই এবং সর্বপ্রথমে স্বদেশেই। স্বস্তিকার বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কলঙ্ককাহিনী লইয়া যাহারা উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে সেইসকল উদীয়মান ফুরারকে নিষ্ঠুরহস্তে দমন করিতে হইবে; এ আগাছাকে যদি আমরা শিকড় বসাইতে দিই তবে বিপদ আমাদের ঘনাইয়া আসিবে। এ-বীজ যেন আমাদের ঘিরিয়া না ফেলে। মাৎসিনির যুগের মতো এবং সে-যুগের চেয়ে আরো ব্যাপকভাবে, প্রতিক্রিয়াশীল-

শক্তির এই নূতন পবিত্র সম্মেলনের বিরুদ্ধে শুধু নবীন ইউরোপ নহে জগতের সমস্ত জাতিকে জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

সংগ্রামের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করিতে হইবে। পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে উহাকে পৃথিবীর সর্বত্র। বিশ্বের যেখানেই কর্ম ও চিন্তা শৃঙ্খলিত এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত, সেখানেই আমরা আক্রান্ত। যাহা তোমার তাহা আমার। যাহা আমার তাহা তোমার। আমাদের সহযোদ্ধাদের অঙ্গের প্রতি আঘাতটি আমরা বুক দিয়া অনুভব করি, তাহাদের প্রত্যেক অপমানে আমরা অপমানিত হই; সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী একটি কঠিন ফ্রণ্টে আমরা যখন একত্রে দাঁড়াইব, তখন গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মের বিভেদকে আমরা মানিব না। যে আমাদের পথরোধ করিবে সে ধ্বংস হইবে। সমগ্র মানুষের অভিযাত্রা রোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই।

আর. আর

৮। রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া যে নারকীয় কাণ্ড শুরু হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় অপরাধী কে বা কাহারা; যে দলিলপত্র ও প্ল্যানগুলি 'ব্রাউন বুকে' প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ গভর্ণমেণ্ট আফিসগুলি হইতে খুব একটা বড় দল ছাড়া একাজ সম্ভব নহে। রাখইস্ট্যাগের সভাপতি স্বরাষ্ট্র-সচিবের বাসগৃহ রাইখস্ট্যাগের সহিত একটি ভূগর্ভস্থ পথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। অতএব, তাহার নিজের উপর হইতে সন্দেহের বোঝা না সরাইয়া অন্যকে অভিযুক্ত করিবার কোনো অধিকার স্বরাষ্ট্র-সচিবের নাই। তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, যাহা প্রত্যেক দেশের

বড় বড় কাগজগুলিতে বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার জবাব তিনি আজো দিতে পারেন নাই। লণ্ডনে যে বিকল্প-বিচার হইতেছে তাহাতে জার্মান গভর্নমেণ্টের অন্যান্য সদস্যগণসহ গোয়েরিংকে দুনিয়ার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইয়াছে।

৯। ডিমিট্রভ ও তাহার সঙ্গীদের মুক্তিদানের জন্য জার্মান জাতির নিকট আবেদন

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩

আমাদের সময়কার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর মামলা শেষ হইয়া আসিতেছে। পঞ্চাশ দিনেরও বেশি সাধারণের মধ্যে ও প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশ্য আলোচনার পর রাইখস্ট্যাগ মামলা শেষ হইয়া আসিতেছে। টরগলের, ডিমিট্রভ, পোপোভ ও টানেভের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে কত ফাঁকা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত জগত জানিয়াছে তাহারা নিরপরাধ। স্বয়ং বিচারকদের ও অভিযোক্তাদেরও বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার ফলে বিচারশালার আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং এ-আবহাওয়া যে রায়কে পর্যন্ত প্রভাবিত করিতে পারে এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। যে মন্ত্রীর হাতে বিচার-বিভাগের ভার ন্যস্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কথা যাহার সবচেয়ে বেশি এবং ধৃত ব্যক্তিদের নিরপত্তার জন্য যিনি নিজে দায়ী তিনিই যখন বিচার-শালার মধ্যেই দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে আসামীদের ভয় দেখান, রায় যদি তাহার নির্দেশানুযায়ী না হয়, তবে আসামীদের নিহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চারিটি ব্যক্তির মহান সংগ্রাম এক অপূর্ব দৃশ্য। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত, কিন্তু নিজেদের নির্বাচিত কৌঁসুলীর

সাহায্য হইতে পর্যন্ত তাহাদের বঞ্চিত করা হইয়াছে। এ মহাকাব্যের উপসংহার যাহাই হউক না কেন ডিমিট্রভের বীরমূর্তি ভবিষ্যতের পটভূমিকায় চিরদিন অনন্ত মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। প্রত্যেক দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বেদনার সহিত এই মর্মান্তিক বিচার প্রহসন লক্ষ করিয়াছে। শুধু তাহাদের কাছে নহে জার্মানদের কাছেও আমরা আবেদন জানাইতেছি। সমস্ত জাতির জনগণ যে জার্মানিকে তাহার বর্ণলিপ্সা সত্ত্বেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভালোবাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে, লেখকসহ বহু ফরাসী যে জার্মানির মনীষীদের পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেই জার্মানির বিবেকের নিকট আমরা নিবেদন জানাইতেছি। দলগত বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে যে বিবেক এ আবেদন সেই বিবেকের কাছে। আমাদের মতে এ বিবেকও জানে ডিমিট্রভ, টর্গলের, পোপোভ ও টানেভ নিরপরাধ। যত উত্তেজনাই তাহাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত করা হউক না কেন, এ বিবেককে কিছুতেই ভুলানো যাইবে না। জার্মানির বিবেক জানে রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের সহিত এই চারিজনের কোনো সংযোগ নাই, ইহাদের কেহই কোনো প্রকারেও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। জার্মানির বিবেক জানে তাহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। সে জানে তাহাদের শাস্তিদান জার্মানির সম্মানের বিরুদ্ধে (যাহা লইয়া আজ জার্মানিতে এত মাতামাতি চলিয়াছে), ন্যায়ের বিরুদ্ধে, শাশ্বত সুবিচারের বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ হইবে যে উহার ফলে জার্মানি ও বহির্জগতের মধ্যে বিচ্ছেদের এমন এক গহ্বর সৃষ্টি হইবে বহু বৎসরের মধ্যেও যাহা পূর্ণ হইবে না।

জার্মানি আজ দেখাক যে, যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যেও কেমন করিয়া একটি মহান জাতি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বিচারের ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ন্যায়কে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। অভিযুক্ত চারিজন রাজনৈতিক বন্দী যে নিরপরাধ তাহা আজ সমস্ত জগত বুঝিয়াছে। আমরা আশা

করি, তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি যে অন্তঃসারশূন্য তা জার্মানি প্রকাশ্যে স্বীকার করিবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরিত্রবলের নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে। আরো আশা করি, বিচার শেষ হইবার পর বন্দীদের জীবন রক্ষার ভারও তাহারা গ্রহণ করিবে। ইহার জন্য জগতের কাছে তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইবে।

১০। টরগলেরকে বাঁচাও

ডিসেম্বর, ১৯৩৩

সাক্ষ্য প্রমাণ মিথ্যা প্রমাণিত হওযায় এবং ঘটনাকালে যে তাহারা অন্যত্র ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ায় ডিমিট্রভ, পোপোভ ও টানেভের বিরুদ্ধে মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছে। জগতের মুখের উপর উদ্ধত মিথ্যা প্রচার একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বাধ্য হইয়া তাহাদের নিরপরাধ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু অক্ষম- আতঙ্কে উন্মাদ স্বরাষ্ট্র-সচিব গোয়েরিং টরগলের দ্বারা তাহার জীবন বিপন্ন হইবে ভাবিয়া তাহাকে ঘাতকের হাতে তুলিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আসামিগণের মধ্যে এর্ন্‌স্ট টরগলের সবচেয়ে নিরীহ ; সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সব চেয়ে তিনি হৃদয়বান। তাহার সমগ্র জীবন নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের ইতিহাস। স্বভাবত এবং সাধনার ফলেও ব্যর্থ সর্ব-প্রকারে হিংসামূলক কার্য হইতে পার্টির মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বেশি দূরে থাকেন। রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের মতো নির্বোধ, নিষ্ফল, নাটকীয় সন্ত্রাশবাদী কাজ তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব। প্ররোচনা-কারিগণ তাহার বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষের আগুন জনগণের মনে জ্বালিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র নিজের পার্টির সম্মান রক্ষার জন্যই এই নির্দোষ ও নির্ভীক মানুষটি আসিয়া স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। নিরপরাধ জানিয়াও ইহাকে সাত মাস জেলে

রাখা হয়, তাহার মধ্যে তিন মাস শিকল পরাইয়া। নিরপরাধ জানিয়াও এই মানুষটির শির তাহারা চাহিতেছে। কারণ মার্কসবাদকে ধ্বংস করিতে যাইয়া যাহারা নিজেরাই আজ মিথ্যা ও শাঠ্যের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে এ-শিরে তাহাদের বড় প্রয়োজন। এর্ন্স্ট টরগলের আজ নিজের নির্দোষিতায় নিজেই বিপন্ন। তাহারা আজ তাহাকে মারিয়া তাহার পার্টিকে মারিতে চাহিতেছে! তাহাকে মারিয়া তাহারা আজ তাহাদের ঘাতকদের অপরাধের একটা জবাব তৈয়ারী করিতে চাহে। নিরপরাধকে তবে হত্যা কর। সে পাপ করিবার সাহস যদি তোমাদের থাকে, তবে সর্বহারার পার্টিকে তাহারা এমন এক রক্তাক্ত মহিমায় ভূষিত করিবে যাহার আলোকে সে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইবে।

১১। থালমানকে বাঁচাও

৯ই মে, ১৯৩৪

হিটলারের গভর্ণমেণ্ট জনমতকে ভয় করে। রাইখস্ট্যাগ মামলা জগতের সম্মুখে হিটলার গভর্ণমেণ্টের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। জনমতের ভয়েই ডিমিট্রভ ও তাহার নিরপরাধ সঙ্গীদের সে মুক্তি দিয়াছে। হিটলার-গভর্ণমেণ্ট তাই পৃথিবীর চোখকে ফাঁকি দিয়া অন্ধকারে, বিনা আপীলের, বিনা উকীলের, বিনা সাক্ষ্যের গুপ্তবিচারে থালমানকে টুটি টিপিয়া মারিতে চাহিতেছে। রাজনৈতিক অপরাধের কাপুরুষতাকে এইভাবে বিচার ব্যবস্থার পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এই গোপন বিচারের জন্য গোপনে অনুষ্ঠিত অপরাধের কৈফিয়ৎও দেওয়া হয় নাই। থালমানের সব কাজই চিরদিন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। একথা এমন কি জার্মানিতেও প্রত্যেকে জানে যে থালমানকে নির্যাতন করিয়া হিটলার-গভর্ণমেণ্ট মানুষ থালমানকে নির্যাতন করিতেছে না, দেখিতেছি তাহার উদ্দেশ্য কমিউনিজমকে নির্যাতন।

প্রকাশ্যে এবং সাধারণ বৈধ পদ্ধতিতে থালমানের বিচারের জন্য আমরা হিটলার-গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইতেছি। হিটলার ভালো-ভাবেই জানে থালমানের নৈতিক মহিমার সম্মুখে সে দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই, থালমানের বিরুদ্ধে যে-কোনো গোপন দণ্ডাজ্ঞাকে হিটলার-গভর্ণমেণ্টের প্রতি নৈতিক ধিক্কার বলিয়া ধরিয়া লইবার অধিকার জগদ্বাসীদের রহিয়াছে। জগত তাহাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিবে।

১২। পারি নাগরিকদের প্রতি আবেদন

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

ফাশিজম্ ধনতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার শেষ আঘাত, কিন্তু শেষ আঘাত হইলেও ইহা মারাত্মক হইতে পারে। একটা গলিত ব্যবস্থার সমস্ত বিষাক্ত জীবাণু রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গে সংক্রামিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, জাতিবিদ্বেষ, উপনিবেশে দস্যুবৃত্তি, আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক শোষণ, ব্যবসায়ী দুর্নীতির সর্বপ্রকার দানবীয় অভিব্যক্তি, ডুচে ও ফুবারদের পায়ে অন্তঃসারশূন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আত্মসমর্পণ সমর্থনে দম্ভ ও দাসত্বের সর্বপ্রকার পাশবিক ভাবাদর্শ—এ সকলকে শতগুণ বর্ধিত করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের নামই ফাশিজম্।

অতএব, সাবধান! আহ্বান কর শ্রমিকশ্রেণীর সর্বশক্তিকে, লক্ষ্য লক্ষ্য সর্বহারাকে, যে-সকল লেখক ও বিপ্লবী শিল্পী সর্বহারার আদর্শের প্রতি আজও অনুগত আছেন তাহাদিগকে। ফাশিজম্ ও আমাদের মধ্যে আমৃত্যু সংগ্রাম। স্মরণ রাখিও ভলতেয়রের বাণী, "এ পাপ ধ্বংস কর।"

১৩। বুদ্ধিজীবীদের সহিত সর্বহারাশ্রেণীর মিলনের আবেদন

যে দানবীয় পরশ্রমজীবী শোষণব্যবস্থা সম্পদস্রষ্টা শ্রমিকের সমস্ত শক্তি তৃষ্ণার্তের মতো শুষিয়া লইয়া তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইতেছে

তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিরাট সর্বহারাশ্রেণী অমিতবিক্রমে সংগ্রাম চালাইতেছে।

সমস্ত বুদ্ধিজীবী, সমস্ত সহকর্মীদের কাছে আমি আবেদন জানাইতেছি। শ্রমজীবীদেব পার্শ্বে আমাদের স্থান। তাহাদেব দেহ হইতে আমাদেব জন্ম, তাহাদের স্বাধীনতা আমাদেব স্বাধীনতা, তাহাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তাহাবাই গাছের মূলকাণ্ড ; বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প এইগুলি বিভিন্ন শাখা মাত্র। কাণ্ড যদি দুর্বল হইযা পড়ে, তবে শাখাও শুকাইয়া যাইবে। বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগীশ্রেণী। শোষণকাবীবা তাহাদেব যে সম্মান ও সুযোগসুবিধা দেন তাহাতেই কৃতার্থ হইযা তাহাবা সাধাবণের আদর্শেব প্রতি বিশ্বাসবাতকতা কবে। যে গাছকে আমবা টবের মধ্যে আনিযা বসাইযাছি সেই গাছ হইতে ছিঁড়িযা লওযা ফুলেব মতো তাহাদেব অবস্থা। অল্পকালেব জন্য তাহাদেব দীপ্তি থাকে, তারপব তাহাবা শুকাইযা যায ; লোকে তখন সেগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।

মৃত্যুব বিরুদ্ধে, হত্যাকাবীর বিরুদ্ধে, মানব সমাজের দলনকাবীব বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আবেদন জানাও। ধনিকেব ধনমত্ততা, সাম্রাজ্যবাদীর ক্ষমতামত্ততা, বৃহৎব্যবসায়ের একনাযকত্ব, রক্তপানমত্ত ফাশিজম্-এব নানা রূপ—এ সকলেব বিরুদ্ধে জীবনেব নিকট আবেদন জানাও। হে শ্রমজীবীশ্রেণী, আমবা হাত প্রসারিত কবিযা দিতেছি, আমবা তোমাদেরই,—আমাদের মিলিত হইতে দাও। আমাদেব মধ্যকাব বিভেদ ঘুচিয়া যাক। সমগ্র মানবজাতি আজ বিপন্ন।

১৪। ফরাসী তরুণদের প্রতি আবেদন

আজ ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয়া যে পার্লামেণ্টাবী শাসনতন্ত্র মিথ্যার বেসাতি ও

উৎকোচের দাসত্ব করে, তাহার উচ্ছেদের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রকৃত প্রগতি-বাদীদের মনে কোনো সংশয় নাই। কিন্তু ব্যাঙ্ক, বৃহৎশিল্প ও ব্যাপক ব্যবসায়ের যে সকল ছদ্মবেশী অধিনায়ক এই মিথ্যা ও ব্যভিচারের আসল গুরু, যাহারা এতকাল গণতন্ত্রকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন কেবলমাত্র স্বার্থসেবায় উহার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করিয়া, তাহারা আজ বুঝিয়াছেন যে ঐ ব্যবস্থার জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই এ-ব্যবস্থা তাহারা নিজেদের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত ; ইহাতে একদিকে যেমন জনসাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন স্তিমিত হইয়া আসিবে অন্যদিকে তেমনই কৌশলে তাহাদের বিদ্রোহকে নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত করার কার্যে নিয়োগ করা যাইবে। এইখানেই বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ। অধীর, অন্ধ, ভাবাবেগে উন্মত্ত এই তরুণের দল আজ মনে করিতেছে যে, তাহারা বুঝি সমগ্র সমাজের আদর্শ ও স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এ ভুল তাহাদের একদিন ভাঙ্গিবে, সে-দিন সহসা চকিত আতঙ্কে তাহারা উপলব্ধি করিবে যে, ধনতন্ত্রের মুষ্টিকবলে তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু এই অন্ধ অভিযান একেবারে নূতন নয়। যাহারা ইতালী ও জার্মানিতে ইহার আত্মবিকাশ দেখিয়াছেন, এতদিনে এ অভিযানের স্বরূপ তাহাদের চিনিয়া ফেলা উচিত। ইতালী ও জার্মানির মতো এখানেও আজ সমগ্র সমাজের স্বার্থ ও আদর্শসেবার পবিত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। সেই একই প্রতারণা—সেই কথা, কথা কেবল কথা! উদার রসনা হইতে সহস্র-ধারায়-ঝরিয়া-পড়া-সমাজসংস্কারের সেই অজস্র প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতি চিরদিনই প্রতিশ্রুতিই থাকিয়া যায় কোনোদিন প্রতিপালিত হয় না। কিন্তু, তথাপি ইতালীর ডুচে ও ফাশিস্ত মহাপরিষদ এবং জার্মানির যুগলদানব হিটলার থিসেন সরল বিশ্বাসী, শৃঙ্খলিত জনসাধারণকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে।

এই একই খেলায় মাতিয়া ওঠা ফ্রান্সের তরুণদের কিছুতেই চলিবে না। যদি এই খেলায় সত্যই তাহারা মাতিয়া উঠিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোনো কিছু দেখিবার বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই নাই। তাহাদের বুদ্ধিহীনতা এতদুর গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সংবাদপত্রের দানবীয় মিথ্যা প্রচারকে তাহারা নির্বিচারে বিশ্বাস করে, অথচ জানে যে, সংবাদপত্র-জগতের প্রায় সবটাই লৌহ ও স্বর্ণখনির জনছয়েক মালিক ও তাহাদের সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মুষ্ঠিকবলিত। এই মালিকের উপদলই সমগ্র জগতকে নিজেদের পদতলে আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

সহকর্মিগণ! উহাদের চোখের বাঁধন খুলিয়া দাও। উহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না, অন্ধকার হইতে উহাদিগকে আলোকে আনো। জানি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দলে হাজার হাজার ভাড়াটিয়া লোক আছে যুক্তিবিদ্বেষী উগ্র প্রতিক্রিয়াবাদীর দল যাহারা অন্ধের মতো বিনা বিচারে তাহাদের অনুগমন করে। কিন্তু এ কথাও জানি যে, তাহাদের দলে এমন হাজার হাজার লোকও আছে, যাহারা নিতান্ত সরল বিশ্বাসে তাহাদের প্রবঞ্চনায় ভুলিয়াছে, কাহারও স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসাবে তাহারা ব্যবহৃত হইতেছে কি না, সে সম্পর্কে যাহাদের মনে এখনো প্রশ্ন জাগে নাই, যাহারা এখনো বুঝিতে পারে নাই যে, যাহা রক্ষা করিতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস তাহারই বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

গল্প আছে, মৃগের নিকট আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য অশ্ব সাময়িকভাবে আরোহীর নিকট আত্মসমর্পন করে। এই সুযোগে আরোহী অশ্বকে চিরদিনের মতো বল্গার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে! এই কাহিনীটি আপনাদের স্মরণ রাখিতে বলি। পার্লামেণ্ট ও পতনোন্মুখ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা জনসাধারণের বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু এই জীর্ণ প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবে যে তরুণ ও

জনসাধারণ, ছায়ার মতো তাহাদের পশ্চাতে ফিরিতেছে ফাশিস্ত অত্যাচারী। আসল শত্রু সেই। ধ্বংস করিতে হইবে ফাশিজম্‌কেই। লৌহ-ব্যবসায়ীসঙ্ঘ, ব্যাঙ্ক ও তাহাদের দস্যুদলের বন্ধনশৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেল। ফাশিজম্ ধ্বংস হোক!

১৫। অস্ট্রিয়ায় ফাশিজম্

২০শে জুন, ১৯৩৪

প্রতিবিপ্লবের গত পনের বৎসরের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের বার্লিনের রক্তাক্ত জানুয়ারির ঠিক পরেই ১৯৩৪ সালের ভিয়েনার রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারির স্থান। ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার নেকড়েদের মধ্যে অস্ট্রিয়ান ফাশিজম্-এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। -

ইতালী ও জার্মানিতে ফাশিজম্ ও নাৎসীবাদের যে ঝড় বহিয়াছে তাহা আরম্ভ ও চালনা করিয়াছে একদল শক্তিশালী ভাগ্যান্বেষী। জনসাধারণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যাতি-বুর্জোয়ার মধ্য হইতে তাহাদের উদ্ভব, বিপ্লবী মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে ধনতন্ত্রের ভয় ও বিদ্বেষ ইহাদের উপজীব্য। মার্কস্‌বাদকে তাহারা ধ্বংস করিতে নামিয়াছে বলিয়া ধনতন্ত্রীরা তাহাদের সহযোগিতা করে বটে, কিন্তু দুর্গত জনগণের সহিত একদা তাহাদের সংযোগ ছিল বলিয়া ধনতন্ত্রীরা সর্বদা খুব আতঙ্কে থাকে। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রীরা তাহাদের নেতৃশ্রেণীর মধ্যেও রহিয়াছে, আবার বিনাবাক্যে অনুসরণকারীদের মধ্যেও রহিয়াছে; তথাপি সর্বদা ভয় দেখাইয়া তাহারা ইহাদের হাতের মুঠার মধ্যে রাখে।

অস্ট্রিয়ার প্রতিবিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে গড়া। মধ্যযুগীয় ও সামরিক প্রতিক্রিয়াশক্তি ইহার সহযোগী। ইহা আন্তর্জাতিক মার্কস্‌বাদ ও জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (নাৎসীবাদ) উভয়েরই একত্রে বিরোধিতা করে। যে ধরনের ফাশিজম্‌ই হোক মিথ্যা ও শঠতার চিরআশ্রয়ে সে পরিপুষ্ট

হইয়া ওঠে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনকল্যাণের নামে যে-কোনো উপায় অবলম্বনে দ্বিধা করে না। হিটলার তাহার 'আমার সংগ্রাম' পুস্তকে নির্লজ্জের মতো ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং মুসোলিনী নিজেকে মাকিয়াভেল্লির একজন পাকা শিষ্য বলিয়া গর্বের সহিত ঘোষণা করেন।
কিন্তু মাকিয়াভেল্লির নীতির সহিত ধর্মের কোনো সংশ্রব নাই ; ধর্মের নামে অন্তঃসারশূন্য উক্তিকে এ নীতি স্পষ্টভাষায় নিন্দা করে। আর, নাৎসীবাদ বর্বর জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিয়া খ্রীস্টধর্মের মূলে আঘাত করিতেছে।

অস্ট্রিয়ায় আজ যে নিপীড়ন ও নির্যাতনের বন্যা চলিয়াছে তাহার কাহিনী নিঃশব্দে চাপা দিয়া এবং নিপীড়িত ও নির্যাতিতের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ কুৎসা রটনা করিয়া প্রত্যেক দেশের 'নিরপেক্ষ' বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি অপপ্রচারের অভিযান শুরু করিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এ-সকল ঘটনায় ইউরোপের শুধু সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে নহে, লিবারেলপন্থী বুর্জোয়াদের মধ্যেও দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, ফাশিজম্ যখন ধর্মের মুখোশ পরে তখন তার চেয়ে চিন্তার স্বাধীনতার আর বড় শত্রু নাই। সে তাহা জানে ; তাই ধর্মসংশ্রবহীন কোনো আন্দোলনকেই সে সহ্য করিতে পারে না।

যুদ্ধের পর ভিয়েনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে অপূর্ব সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ হইয়াছে, ইউরোপের অন্যকোনো বুর্জোয়া দেশের সমাজতন্ত্রীরা তাহা করিতে পারে নাই। ইতালীর মতো কমিউনিজম্-এর মিথ্যা ভীতি-প্রদর্শনের কোনো অজুহাত এখানে ফাশিজম্-এর ছিল না, জার্মানির মতো জাতির অপমানের প্রতিশোধের প্রশ্নও এখানে উঠিতে পারে না। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হইয়াছিল অস্ট্রিয়ার। শ্রমিকশাসিত ভিয়েনা তাহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। সামরিক পরাজয়ের সে উদার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পাপের গুরুভারে

নিপিষ্ট এক পুরাতন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নবনির্মিত অট্টালিকামালা ছিল মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিবার মতো; পশ্চিমের সমস্ত গণতন্ত্রগুলির সে ছিল এক মহান দৃষ্টান্ত। তাই ধর্মের মুখোশধারী ফাশিজম্ তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গগনচুম্বী কীর্তিসত্ত্বেও এ পাপের দাগ ভিয়েনার অঙ্গ হইতে কোনোদিন মুছিবে না; ইতিহাস ভিয়েনাকে কোনোদিন ক্ষমা করিবে না।

অষ্ট্রিয়ার পুরাতন ও মারাত্মক শত্রু রোমের অসম্মানকর সামান্য সাহায্য না পাইলে অষ্ট্রিয়ায় ফাশিজম্ মাথা তুলিতে পারিত না। জার্মান ফাশিস্তদের হাত হইতে বাঁচাইয়া অষ্ট্রিয়াকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল ডুচের চক্রান্ত। এই ডুচের পতনের সময় যখন আসিবে অষ্ট্রিয়ার পতন তখন অনিবার্য হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে ভিয়েনাবাসী যে অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া পরাজিত হইয়াছে তাহাতে ইউরোপের বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। শৌর্যের দৃষ্টান্তে ঐক্য আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে। বিনা সংঘর্ষে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রক্ষমতালাভের যে স্বপ্ন তাহারা দেখিতেছিল তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে। ভিয়েনার যুদ্ধ হইতে তাহারা শিখিয়াছে শৌর্য, সাহস ও কর্মের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী। ভিয়েনার এ-শিক্ষায় শুধু ভিয়েনাই লাভবান হইবে না, লাভবান হইবে সমগ্র জগত। রক্তের অক্ষরে এ-শিক্ষা যাহারা শিখিয়া গেল সেই বীরদের আমরা নমস্কার করি।

১৬। মুসোলিনীর জেলে যাহারা মরিতে বসিয়াছেন

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

মুসোলিনীর উপর হইতে জগতের দৃষ্টি সরাইয়া লওয়া হিটলারের দুষ্কৃতিগুলির অন্যতম। অগ্নিকাণ্ড, পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব, নির্যাতন ও হত্যালীলার বীভৎস উল্লাস মেসিনগান ও ক্যাস্টর অয়েলের বীরের মহিমা ম্লান করিয়া দিয়াছে। আডল্‌ফের পাশে বেনিতোকে উদার ও সহৃদয় বলিয়া মনে হইতেছে। বৃদ্ধ শয়তান আজ নির্বিরোধী ভদ্রলোক সাজিয়াছে। সম্প্রতি অধিকাংশ ছবিতেই তাহাকে গম্ভীর ও সহনশীল রূপে দেখানো হইতেছে। আজ ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে যে আপোসের চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে যাহাতে জনমত গঠিত হইয়া না উঠিতে পারে তজ্জন্য হিটলারের পাশাপাশি মুসোলিনীকে এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা হইতেছে যাহাতে মনে হইবে রোমে আজ পুনরায় শৃঙ্খলা আসিয়াছে এবং অগস্টসের মতো মুসোলিনীও বিবদমান উপদলগুলির কলহ কোলাহলের মধ্যেও শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি একজন মহাপুরুষ, বুর্জোয়াদের ভরসার স্তম্ভ তিনি। শিশুদের চরিত্রগঠনের জন্য মুসোলিনীর কাহিনী পড়ানো হইতেছে।

এ আনন্দ উৎসবে আমরা বাধা দিতে চাই। আমরা গাহিতে চাই অন্য গান। থালমানের আঠারো মাস কয়েদ বাস দেখিয়া যাহারা গ্রামসির সাত বৎসর ধরিয়া তিল তিল যন্ত্রণাভোগের কথা ভুলিয়া যান, আমরা তাহাদের দলে নই। ফুবার-এর পাশে, ফুবার-এর উপরে ডুচের স্থান তৈয়ারী কর। ডুচে গুরুদেব, ফুবার শুধু তাহার শিষ্য।

দুজনকে এক পর্যায়ে রাখিয়া আমি ডুচে-র অপমান করিতে চাহি না। 'আর্যামির' নামে যিনি চিৎকার করিতেছেন, তাহার দুষ্কৃতির মূলে রহিয়াছে নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু যিনি মাকিয়াভেল্লি ও মার্কস্ হজম করিয়াছেন তাহার নিকট কি ভালো কি মন্দ সব কিছুরই মূলে বুদ্ধি।

(কিন্তু উন্মাদনা দম্ভ ও বিদ্বেষ একই জাতের জিনিস।) কি তিনি করিতেছেন, তিনি তাহা ভালোভাবেই জানেন। আরেকজনের মতো তিনি পাগল নহেন, রোজেনবের্গের মতো কোনো গুরু তাহার নাই, জাতি-বিদ্বেষের অন্ধ কুসংস্কারের দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না।

কোনো ভাবাদর্শ কোনোদিন মুসোলিনীকে পরিচালিত করে নাই; মুসোলিনীই ভাবাদর্শকে পরিচালিত করিয়াছেন। কোনো ভাবাদর্শের অধীনতা তিনি স্বীকাব করেন না, ভাবাদর্শকে দিয়া নিজের অধীনতা স্বীকার করান। বিভিন্ন ভাবাদর্শের সহিত তাহার পরিচয় আছে। কোন ভাবাদর্শ কিসের প্রতীক তাহা তিনি ভালোভাবেই জানেন। আরো ভালো করিয়া জানেন কোন ভাবাদর্শ কিসের বিরোধী, কারণ তাহার প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। আজ যে-গুলিকে তিনি নির্যাতন করিতেছেন ইহা তাহাদের একটি। না, তাহার বিরুদ্ধে আমরা বুদ্ধিহীনতার অভিযোগ আনিতে পারি না। যে কারণে শত্রু তাহার বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া ওঠে সে কারণ খুঁজিবার জন্য তাহাকে কোথাও যাইতে হয় না। যদি সে কারণ তিনি দেখিতে না পান তবে বুঝিতে হইবে দেখিতে পাওয়াটাই তাহাকে শত্রুনিধনে বাধা দিবে; তাই এ কারণকে তিনি অস্বীকার করিয়া যান। কিন্তু এ কথা তিনি কখনো ভোলেন না যে, যাহার অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিতেছেন সে বিদ্যমান; যাহার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করিতেছেন সে হার মানিতেছে না; যে ভাবাদর্শ একদিন তাহার নিজের ছিল সেই ভাবাদর্শকে অবৈধ করা সত্ত্বেও নির্বাসন ও কারাগারে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই তাহা একটি অনুশোচনার অনুভূতির মতোই বাঁচিয়া আছে। এই ভাবাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা যাহাদের এতটুকু বিচলিত হয় নাই, মৃত্যু পর্যন্ত হইবেও না, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ তাহার এত বেশি কি তবে এই জন্যই! যে কারণেই হোক, তাহার তাহাদের না জানার কোনো

কারণ নাই; এবং নিজের সমস্ত কাজের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করিবারও কোনো কারণ নাই। এই ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্যই এমন এক বিশেষ দায়িত্ব তাহার আছে যাহা হিটলারের নাই!

আজ আমরা দণ্ডিতদের লইয়া এই দণ্ডাজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই মহাধূর্ত স্বেচ্ছাচারীর নিকট আমরা এই নির্যাতন-নিপীড়নের কৈফিয়ত দাবী করিব। কারণ দুর্বল লোকদের মতো তিনি তাহার কাজের ফলাফলের জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করেন না। যাহা তিনি করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তিনি করিয়াছেন।

ইতালী পর্যটন শেষ করিয়া সম্প্রতি পারিতে ফিরিয়া যাহারা ফাশিজম্-এর গুণকীর্তন শুরু করিয়াছেন, যাহারা ইতালীর চির-উজ্জ্বল আকাশে কখনো মেঘের ছায়া পর্যন্ত দেখেন নাই, কারাগারে কি নির্বাসনে কোথাও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামান্যতম বিক্ষোভও যাহাদের চোখে পড়ে নাই, তাহাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার পরিপূরক বলিয়া নিম্নোক্ত সামান্য ঘটনা কয়টি যোগ করিয়া দিতে আমরা তাহাদের অনুরোধ করিতেছি।

ইতালীতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে মোট ৩,৫০০ নাগরিকের বিচার হইয়াছে।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তের সংখ্যা ২০০।

১৯২৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত নির্বাসিতের সংখ্যা ৩,০০০।

সর্বসমেত মোট কারাবাস হইয়াছে ১২,০০০ বৎসরের। ১৯৩২ সালের হিসাবে:

স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ২৭৭ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিচার করিয়াছেন; দণ্ডিতের সংখ্যা ২২০, ইহাদের দুইজনের হইয়াছে মৃত্যুদণ্ড; ৭০০ জন অতিরিক্ত নির্বাসিত; প্রায় ১০,০০০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া কিছুকাল বন্দী রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালে:

৬১ জনের অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা; প্রায় ৬০০ নির্বাসিত; ৫০০ জন বিচারের

জন্য প্রতীক্ষমান; গ্রেপ্তার হইয়া কিছুকাল কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন প্রায় ১,৩০০ জন।

রাষ্ট্ররক্ষার জন্য বিশেষ ফাশিস্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পর ১৯২৬ সালের নবেম্বর মাস হইতে হাজার হাজার নারীকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ১৭।১৮ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অধিকাংশকেই রাখা হয় ত্রানির ভয়াবহ কারাগারে অথবা পুন্‌ৎসাদ্বীপে। স্বাস্থ্যের অবস্থা সেখানে জঘন্যতম। তুরিন-এর শিক্ষয়িত্রী কামিল্লা রাভেরা এবং বলোঞার শিক্ষয়িত্রী লিয়া গিয়া-কাগালিয়ার মতো অনেকেই সেখানে ফুসফুসের অথবা অন্যপ্রকারের যক্ষারোগে মৃত্যুর দিন গণিতেছেন। সেলের মধ্যে নিঃসঙ্গ অবরোধে থাকার ফলে (ফাশিস্ত পিনাল কোড না মানিয়া ত্রানিতে এই শাস্তি সর্বদাই দেওয়া হয়) অনেকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাদের উন্মাদরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে জর্জিনা রসেটি একজন। এই তরুণীটি মনগ্রান্দোর কাপড়ের কলে কাজ করিতেন। তাহার অপরাধ, জনৈক দণ্ডিত ব্যক্তির ইনি বাগ্‌দত্তা ছিলেন।

স্ত্রী কয়েদীদের সন্তানগুলিকে পেরুজ, রোম, মিলান ও ত্রিয়েস্তের জেলে রাখা হইয়াছে।

পিয়ানোসার বিষণ্ণ আবহাওয়ায় অথবা সিভিতা ভেকিয়ার জেলে যে সকল বন্দীরা নির্বাসিত বা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহাদের কথাও লিখিতে গেলে একখানি বিরাট শহিদনামা রচনা করিতে হয়।

সিভিতা ভেকিয়ার জেলে আছেন আইনজীবী উম্বের্তো তেরাচিনি। ইনি বিশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, সম্প্রতি যক্ষারোগে আক্রান্ত। আর আছেন ফাদার্ জিরোলামো লি, কোজ্জি, বিশ বৎসর নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত, সম্প্রতি অবস্থা উদ্বেগজনক। পিয়ানোসায় তুরাতির

বন্ধু আইনজীবী সাগ্রোপর্তিন দশ বৎসরের দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করিতেছেন, সম্প্রতি যক্ষারোগে শেষ অবস্থায় উপনীত। গ্রেযোনার আইনজীবী রেজ্জোলিনো কেরানি—বিশ বৎসরের দণ্ডাজ্ঞা, যক্ষায় আক্রান্ত। জিমো-লুসেত্তি নামক কারারীর এক প্রস্তর-শিল্পী ত্রিশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, আজ অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। ডাঃ মাউরো স্কচ্চিমারো গুরুতর চক্ষুরোগে ভুগিতেছেন, দণ্ডাজ্ঞা বিশ বৎসরের। স্টেশন-মাস্টার ইসিদোরা আৎসারিও-র হইয়াছিল দশ বৎসরের জেল; মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় ইনি সম্প্রতি উন্মাদআশ্রমে বন্দী আছেন। খনি-মজুর বাতিস্তা সান্তিয়ার জেল হইয়াছে ১৭ বৎসরের। প্রাক্তন কমিউনিস্ট ডেপুটি দোমেনিকো মার্কিওরোও ১৭ বৎসরের জেল; বর্তমানে গুরুতর পাকস্থলীর পীড়ায় শয্যাগত।

কিন্তু, এই মৃত্যুপথযাত্রীদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, রোমের ঝুটা-সম্রাট যাহাকে রথের চাকায় বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, সেই আন্তোনিও গ্রামসির কথা এইবার বলিব।

তিনি নেতা। দুঃখবরণের কঠোরতায় তিনি বহুর মধ্যে স্বতন্ত্র। ইতিহাসে মাত্তেওত্তির পাশেই তাহার নাম ক্ষোদিত থাকিবে। হৃদয় তাহার মাত্তেওত্তির মতোই বিশাল, মনের দিক হইতে তিনি বোধ করি মাত্তেওত্তির চেয়েও বড়। কারণ, ইতালীতে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনে তিনিই ছিলেন অগ্রণী।

এই মহাপুরুষের পরিচয় এখনো ফ্রান্স ভালোভাবে পায় নাই। তাই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পৃষ্ঠদেশ সামান্য ন্যুব্জ, বড় বড় দুই চোখে সরল সম্মুখ দৃষ্টি, সে দৃষ্টি যেন কী খুঁজিয়া ফিরিতেছে; বিশাল ললাটটিকে ঘনতরঙ্গিত কেশদাম যেন মুকুটের মতো ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দুর্বল দেহ লৌহকঠিন মনোবল। শিশুকাল হইতে রুগ্ন হওয়ার ফলে সঙ্গীদের সাথে তিনি

খেলিতে পান নাই ; ফলে পড়িবার ও ভাবিবার একটা অদ্ভুত নেশা তাহাকে চিরজীবনের মতো পাইয়া বসিয়াছে। কোনো তিক্ততা নাই। আছে শুধু শিখিয়া শিখাইবার আনন্দ। আর আছে সংস্কৃতির প্রতি একটা অদ্ভুত আসক্তি। শুধু সংস্কৃতি গ্রহণ নহে, সংস্কৃতি বিতরণেব একটা অধীর আকাঙ্খা তাহার মধ্যে অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বলিতেছে। উত্তরজীবনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই সম্পদবিতরণ তিনি পরম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "যাহাদেব বর্ণপরিচয় হয় নাই তাহাদেব পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ পর্যন্ত আমি করিয়াছিলাম। কমিউনিস্ট কখনও নিরক্ষর হইতে পাবে না। জীবনের যত কিছু মিথ্যা ও শূন্যতাকে আমরা আঁকড়াইয়া থাকি ; সব কিছু বিসর্জন দিয়াও তাহাকে ইহা শিখাইতে হইবে।"

তাহার জন্ম হয় সার্দিনিয়ায়, তুরিনে তিনি শিক্ষালাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি পিয়ের মন্তেসির শক্তিশালী শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসেন। ইতালীর মজুর ও কৃষকদের মধ্যে সংযোগ সাধন করিতে তিনি ছাড়া আর কেহ পারে নাই। ইতালীয় রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়িত সার্দিনিয়ার বাসনা বেদনা এবং উত্তর ইতালীব শ্রমিকের বিপ্লবী প্রকৃতি তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, বক্তৃতার ঝড় তিনি তুলিতে পারেন না। যাহারা পারে তাহাদেব তিনি সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেন। কিন্তু লেখনী তাহার ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ ও নির্মম। তাহার রচনাভঙ্গীকে পেগ্যুই-এর রচনাভঙ্গীর সহিত তুলনা করা হয়। বারম্বার তীব্র তীক্ষ্ণভাবে এককথা বলিয়া বক্তব্যকে তিনি পাঠকের মনের গ্রহণে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহার দার্শনিক মন হেগেলের দর্শনে পরিপুষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাই মন তাহার সর্বোপরি দ্বান্দ্বিক শক্তিতে শক্তিমান। তাহার প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়

তুরিনের ক্রি দ্য প্যোপ্‌ল্‌ কাগজে এবং লাভাস্তিতে। ১৯১৯ সালের মে মাসে ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির সহযোগিতায় তিনি আর্দিনে নুওভা নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাহার সম্পাদকীয় দপ্তর এক সময় ইতালীর শ্রমিক বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২৫ সালে তিনি লেখেন: "বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; ইহাই যথেষ্ট নহে। স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন কখনো শ্রমিকশ্রেণীকে বর্তমান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমা ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। চাই সচেতন যোদ্ধা, চাই ভাবাদর্শের জ্ঞান অর্থাৎ যে-অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম সে করিতেছে সে-অবস্থা তাহাকে বুঝিতে হইবে, যে সামাজিক সম্পর্কগুলিব মধ্যে সে বাস করে শ্রমিককে তাহার স্বরূপ চিনিতে হইবে; এই সম্পর্ক-ব্যবস্থাব মধ্যে কোন মৌলিক শক্তি কাজ কবিতেছে, বুঝিতে হইবে সামাজিক বিকাশের সেই ধারাগুলিকে, সমাজের বুকের সমন্বয়ে অযোগ্য কতকগুলি বিরোধীশক্তি যে-ধারাগুলির মূলে....'

এইভাবে তিনি শ্রমিকবিপ্লবের শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তাহার শিক্ষা প্রকাশ পাইল কথার মধ্য দিয়া নহে, কাজ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মধ্য দিয়া। ১৯১৯-২০ সালে তুরিনে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই 'কারখানা-পরিষদ' আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এইগুলিকেই তিনি সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ইউনিটে এবং জয়লাভের পর শ্রমিক রাষ্ট্রের ইউনিটে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়লাভ তাহার দেখিয়া যাওয়া ঘটিল না, কারণ সোশাল ডেমোক্রাট দলের বিশ্বাসঘাতকতকতার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ভাঙিয়া পড়ে এবং কারখানা অধিকার, বিশেষ করিয়া ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে ২৫,০০০ শ্রমিকের তুরিনের ফিয়াট কারখানা অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

কিন্তু তুরিনের শ্রমিকেরা একটা মহান দৃষ্টান্ত দেখাইল। ইউরোপের অপরপ্রান্তে বলশেভিক রাশিয়ার বিরাট ও বিজয়ী রাষ্ট্র-পরীক্ষার সহিত এ দৃষ্টান্তের সংযোগ রহিয়াছে। এই তরুণ নেতার প্রতি জর্জেস সোরেল ও বেনেদেত্তো ক্রোচে-র দৃষ্টি পড়িল।

গ্রামসি ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য। তাহার অর্দিনে নুওভো পত্রিকা তখন দৈনিক হইয়াছে। এই দৈনিকখানি দুই বৎসর ধরিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য, মতবাদের দিক হইতে (Theoretical) পার্টির পুনরুজ্জীবনের জন্য, এবং নিম্নমধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের সমর্থন লাভের জন্য সংগ্রাম চালায়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে পিয়েরো বাবেত্তির সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। দুইজনেই ছিলেন হেগেলীয় দর্শনে সুপণ্ডিত। তাহারা দুজনেই মিলিয়া লিবারেলিজম্ ও কমিউনিজম্-এর সর্বশক্তি একত্রিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল-এর তিনি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ১৯২৩-২৪ সালে ভিয়েনার অধিবেশনে বিশেষ যোগ্যতার সহিত ইতালীর প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ভেনিসে ডেপুটি নির্বাচিত হন এবং মাত্তেওত্তির মৃত্যুর পর পার্টির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। বিরোধী-দলের সম্মেলনে তিনি রাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। তিনি তাহার সংখ্যালঘু দল লইয়া পার্লামেণ্টে ফিরিয়া আসেন এবং একদিকে ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে ও অপরদিকে লাভান্তির নিরাকার প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম চালান। শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে লাভান্তি দল তখন বিনা সংগ্রামেই পলাতকা-নীতি গ্রহণ করেন। যদিও তাহাদের এই কার্যে মুসোলিনীই লাভবান হইলেন, তথাপি দার্শনিক মহামতি আমেন্দ্যা মুসোলিনীর

প্রতিহিংসার কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। এই বিষণ্ণ দার্শনিকের রাজনীতি খাপ খাইত না; তথাপি কেমন করিয়া যেন রাজনীতিতে তিনি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রামসির কাছে দর্শন ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনিও ডুচের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। কিন্তু তিনি পতিত হইলেন যুদ্ধ করিতে করিতে। ১৯২৬ সালে নবেম্বরের প্রথম দিকে রোমে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যদিও তিনি একজন ডেপুটি ছিলেন তথাপি তাহাকে উস্তিকা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। কয়েক মাস পরে ঐ দ্বীপেই আবার তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সহিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অবৈধভাবে তাহার বিচার হয়। ইহা বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বেকার ঘটনা। তিনি নেতা ছিলেন বলিয়া তাহারা তাহাকে বিশ বৎসরের কারাদণ্ড দিয়া সম্মানিত করে।

যে লোক মেরুদণ্ডের যক্ষা, ফুসফুসের ক্ষত, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন তাহার পক্ষে এ দণ্ডাজ্ঞার অর্থই মৃত্যু। তুরি দি বারি-র কারাগারে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন এবং গায়ে তাহার চব্বিশ ঘণ্টা জ্বর রহিয়াছে; তার উপর ভালো সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে নাই। রোম হাসপাতালের ফাশিস্ত অধ্যাপক উম্বের্তো আর্কাঞ্জেলি ১৯৩৩ সালের মে মাসে তাহাকে দেখিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে তিনি স্বীকার করেন: "এ অবস্থায় তিনি বেশি দিন বাঁচিতে পারেন না এবং যদি তাহাকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাহাকে কোনো বেসামরিক হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা উচিত।"

শর্তাধীনে স্বাধীনতার প্রস্তাব তাহার নিকট করা হইয়াছিল। শর্ত ছিল ক্ষমা প্রার্থনা ও মতবাদ প্রত্যাহার। ইহাকে আত্মহত্যা করার সামিল

বলিয়া এ-শর্ত তিনি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমরাও তাহার জন্য ও তাহার পক্ষ লইয়া মার্জনা ভিক্ষা করিব না। যিনি আজীবন পরম নিষ্ঠার সহিত আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার তো মার্জনা চাহিবার কিছু নাই।

তাই তিনি মরিতে চলিয়াছেন। মরিয়া তিনি হইবেন ইতালীয় সাম্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তাহার ছায়ামূর্তি তাহাব রাখিয়া-যাওয়া প্রদীপ্ত দীপশিখা ইতালীর কমিউনিজম্‌কে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে পরিচালিত করিবে। ইহাই কি ছিল মুসোলিনীব চক্রান্ত? শুনিয়াছি সম্প্রতি তিনি রোমান ফোরামে কর্নেলে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানেব অনুকবণে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিলসিতে নেপোলিয়ান তাহার সম্মুখে সিয়ানে নাটকের অভিনয়েব নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুসোলিনী এ নাটকখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। তিনি বুঝিতে পারিবেন তাহাব মধ্যে চিরদিন কিসের অভাব ঃ উদারতা।

১৭। স্পানিশ বিপ্লবকে অভিনন্দন

৪ঠা নবেম্বর, ১৯৩৪

বারসেলোনা ও ওভিত্রভোব যোদ্ধাগণের উদ্দেশে আমরা নমস্কার করি। অভিনন্দিত করি সেই অভিযানকে, ১৮৭১ সালের কমিউনের পর পশ্চিম ইউবোপে যার চেয়ে বীরত্বপূর্ণ সর্বহারার অভিযান আর হয় নাই। কমিউনের পরাজয় হইতেই যেমন সোবিয়েৎ ইউনিয়নেব বিজয়ী বিপ্লব জন্ম লইয়াছে, তেমনই অস্টুরিয়াসের রক্তসিক্ত পর্বতমালা হইতে ইউরোপের সর্বহারাদের এমন এক বিজয়বন্যা নামিয়া আসিবে যাহা সমগ্র জগতকে পরিপ্লাবিত করিবে।

স্পেনের অনির্জিত বিপ্লবের সহিত আমরা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন ঘোষণা করিতেছি। তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাহাদের

ক্ষতে আমরা যেন প্রলেপ লাগাইতেপারি, ঘাতকের হাত হইতে শিকার যেন আমরা ছিনাইয়া আনিতে পারি।

১৮। ফাশিজমৃই শক্র, উহাকে ধ্বংস কর

১০ই জুন, ১৯৩৪

যে ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা আজ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুধু তাহার অনিবার্য পরিণতি নহে, বাঁচিবার শর্তও বটে। অস্ত্রোৎপাদনকারিগণের, বৃহৎ ব্যবসায়িগণের, তৈল, ইস্পাত ও ও রাসায়নিক শিল্পের ধনপতিগণের শেষ আশ্রয়স্থল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ইহারাইতো নেপথ্য হইতে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করে। এই অস্ত্রসজ্জিত বণিক-পর্যটক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিজয়ী ধনতন্ত্রের পণ্য বলপূর্বক বিজিত দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সামাজিক বিক্ষোভকে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষেও ইহার চেয়ে বড় অস্ত্র আর নাই। 'দেশ বিপন্ন' এই ধ্বনি তুলিয়া সামরিক আইনের আঘাতে বিদ্রোহকে সে শান্ত করে। যুদ্ধরত কোনো জাতির পরাজয় ও দুর্দশার সুযোগ লইয়া ধনতন্ত্রীব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে নূতন সমাজব্যবস্থা স্থাপনা মোটেই সহজ নহে। রাশিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা অস্বাভাবিক, সচরাচর ইহা ঘটে না। প্রায় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ জাতিকে এক অন্ধ সামরিক দাসত্বে অভ্যস্ত করিয়া নিজেদের চিন্তা করিবার ও সংকল্প করিবার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দেয়। একটি ভয়াবহ জাতীয়তাবাদী দম্ভে আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা বৃহত্তর মানবসমাজের অনুভূতি হারাইয়া বসে। ইহার ফলে দেখা দেয় স্বেচ্ছাচারী এক-নায়কত্ব ও ফাশিজম্। জীবন দিয়া আমাদের ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

ইউরোপের হাজার হাজার লোক এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তাই তাহারা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দলবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু

এ-কথাও না বলিয়া পারিতেছি না যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমস্টার্ডাম—প্লেই-এলে'র আন্দোলনের অনস্বীকার্য গুরুত্ব সত্ত্বেও ফ্রান্সে (ফ্রান্সের কথাই সবচেয়ে ভালো জানি) বিশেষত ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিয়াছে। দুর্নীতিদুষ্ট পার্লামেন্টি শাসনের কতকগুলি কদর্য কলঙ্ক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়া পড়িবার পর ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের বিদ্রোহ বিভ্রান্ত বিক্ষোভে ধূলিকণায় ঝড়িয়া পড়িতেছে এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি সেই ধূলিকণা-গুলিকেই ধরিয়া একত্রে তাল পাকাইয়া আপনার কাজে লাগাইতেছে। (বুদ্ধিজীবীরা ইহা জানুক বা না জানুক এই ব্যাপারই ঘটিতেছে)। মূঢ় আত্মসন্তোষে অন্ধ হইয়া বাস্তবকে আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। অন্যান্য দেশের মতোই ফ্রান্সেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীই একটা দাম্ভিক ভাবাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ দূরে থাকুক সাধারণ মানুষের কল্যাণের চেয়ে নিজেদের সুযোগ সুবিধা রক্ষার এমন কি বাড়াইবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব।

শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ সম্পর্কে তাহারা শুধু উদাসীন নহেন, সম্প্রতি ইহাতে তাহারা উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ হইতেও শুরু করিয়াছেন। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তিন চার বৎসর অতীতে যাইতে হইবে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যখন সমগ্র জগতের সম্মুখে তাহার বিপুল সাফল্যের কথা এবং বিপ্লবী ও গঠনমূলক লেনিনপন্থী মার্কসবাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিল তখন হইতেই ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে স্বার্থপরের মতো শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কমিউনিজমকে অলীক কল্পনা ভাবিয়া তাহার ছায়া লইয়া এতদিন তাহারা খেলা করিতেছিল, আজ তাহার সত্যকার মূর্তি দেখিয়া শঙ্কায় তাহারা পিছাইয়া গেল। যে শ্রমজীবীজগতে বুদ্ধিজীবীর বিশেষ সুবিধাভোগের অধিকার থাকিবে না

সেই জগতের অভ্যুদয়ের প্রতি তাহাদের যে ভয় ও বিতৃষ্ণাকে তাহারা এতকাল অজ্ঞাতসারে গোপন করিয়া আসিয়াছে, সেদিন হইতে সে ভয় ও বিতৃষ্ণাকে তাহারা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। তরুণদের কাছে বিপ্লব কথাটির একটা বড় আকর্ষণ আছে। তাই তাহারা তরুণদের কাছে বাগবিভূতি বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিতে লাগিয়া গেল যে সত্যকার বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লব নহে, বিশেষ সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রভুত্বই প্রকৃত বিপ্লব। ইহাকেই বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সে গালভরা নাম দিয়াছে, "মনের বিপ্লব।"

অগ্রগামী মানুষের জীবন্ত জগত হইতে বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কুলীনেরা যে সম্ভোগের দিবাস্বপ্ন দেখিতেছেন তাহার কথা আমরা ভালোভাবেই জানি। শিশু কিন্তু বয়সে বৃদ্ধ রেনানের মুখে ইহার কথা আমরা শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন ভবিষ্যতে শাসন চালাইবে একদল বুদ্ধিজীবী, কোনো এক মহাপ্রাণ দার্শনিক স্বেচ্ছাচারীর নেতৃত্বে। (এ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের তার খুব বেশি আস্থা ছিল না)। যে মিথ্যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে একদিন আমরা আমাদের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের উৎস বলিয়া ভাবিতাম তাহার পদস্খলন আমরা বুদ্ধিজীবীরা অতীতে দেখিয়াছি। নিজের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুদ্র অধিকার-বোধকে একদিন আমরা প্রায় সকলেই ভুল করিয়া সেই বৃহত্তর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত এক করিয়া দেখিয়াছিলাম যাহা সমাজের গভীরে শিকড় প্রোথিত করিয়া প্রাণরস আহরণ করে। মানুষের সৃষ্টিপ্রয়াসের যে আবশ্যিক ঐক্য ও সংযোগ ইতিহাসে আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার কথা আমাদের চিন্তা করা উচিত। যে শিল্পী সব চেয়ে বেশি স্বাতন্ত্র্যবাদী সে যখন ভাবে যে নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও সে ব্যক্ত করিতেছে না, তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেই ভূমিকাটুকুরই অভিনয় করিতেছে

যে-টুকু তাহার জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে আরব্ধ এক ঐকতানের বিকাশের জন্য তাহাকে দিবার অগ্রিম ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে শুধু নিজের উচ্চারণ, নিজের গন্ধটুকু যোগ করিয়া যাইতেছে। আমরা সকলেই সেই বিরাট 'অর্কেস্ট্রার' সভ্য। সেই মহাসংগীতের মহাসংগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের এককসংগীতের কোনো মূল্যই থাকিবে না।

সাম্যবাদী সমাজ যখন আজ তাহাদের বিকাশের পথে আরো বিস্তৃতি, আরো গভীরতা, আরো স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি লইয়া দেখা দিয়াছে, তখন তাহাদের আর ভয় কিসের ? কোপার্নিকাস ও গালিলিওর পূর্বে যাহারা জন্মিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের গ্রহটির চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসন হইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের মনে হইয়াছিল শূন্যের অসীমত্ব প্রচার হইয়া পড়িলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবেন !

আজিকার মিথ্যা ও সত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বেলায়ও এই কথাই খাটে। আমি দুইটি। এক আমি আমার অহমিকা লইয়া ; দ্বিতীয় আমি সমস্ত মানুষের সহিত মিশিয়া আমি। যাহারা একদিন গালিলিওকে দণ্ডিত করিয়া পৃথিবীর গতি বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল আজিকার প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীরা তাহাদেরই জ্ঞাতিভ্রাতা। নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা আজ মানুষের বিবর্তনের অমোঘ আইনকে বাধা দিতে চাহিতেছে। তাহাদের বিপরীত বিপ্লবের ইহাই গোপন উদ্দেশ্য। তাহাদের 'মনের বিপ্লব' স্বার্থান্বেষী-গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া মাত্র।

তার উপর রাজনীতির জটিল যন্ত্রটিকে বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, দাম্ভিকতার ফলেই তাহারা অতি সহজে নেপথ্যবিহারী বণিকধুরন্ধরগণের হাতের মধ্য গিয়া পড়ে। তাহারা তাহাদের দিয়া নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে এবং তাঁহাদের হাত দিয়াই উহাদের ফাশিস্ত বটিকা খাওয়াইয়া দেয়।

ফাশিজম্ আজ ইউরোপের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত, কোথাও অসি হাতে বিজয়ীর বেশে, কোথাও গোপনে ঘাসের মধ্যে সাপের মতো। ইতালী কি জার্মানিতে উহা যে-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ফ্রান্সে সম্ভবত সে-রূপে হইবে না ঃ দশটি জাতির সংমিশ্রণে গঠিত ফরাসী জাতি জাতি বিদ্বেষী ভাবাদর্শ গ্রহণ করিবে না ঃ ডুচের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞাও রপ্তানির বস্তু নহে। স্বল্পবিত্ত নিম্ন-মধ্যশ্রেণী, গোষ্ঠীস্বার্থান্ধ জাতীয়তাবাদী সরকারীশ্রেণী, উদ্ধত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্ফীত বুদ্ধিজীবীর দল, ধর্মযাজকীয় প্রতিক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘদিন ধরিয়া সুনিপুণভাবে দীক্ষিত ও শিক্ষিত এক জেনারেল স্টাফের অধীনস্থ সেনাবাহিনী এবং বৃহৎব্যাঙ্ক ও বৃহৎশিল্পের অধিনায়ক অল্প-সংখ্যক অথচ দারুণ শক্তিশালী নেপথ্যবিহারী কয়েকজন লোক—এই সকলের মিশ্রণেই ফরাসী ফাশিজম্ গড়িয়া উঠিতেছে। এ যেন ক্রসাস, লুকুসাস ও সাইলার রোমান গণতন্ত্র—সামরিক ও বাণিজ্যিক অধিনায়ক-গণের গণতন্ত্র।

এই বিপদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অনভিজ্ঞ তরুণদের সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। পার্লামেণ্টের গলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্বেষকে জাগাইয়া তোলা হইয়াছে ; প্রথম আঘাতেই ইহা ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু এই আঘাত যাহারা হানিবে সেই জনসাধারণ ও তরুণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাচারী ফাশিজম্। ফাশিজম্ই প্রকৃত শত্রু। ফাশিজম্কেই ধ্বংস করিতে হইবে।

আমি কাহাদের জন্য লিখি

ডিসেম্বর, ১৯৩৩

কেন লিখি ? কাহাদের জন্য লিখি ? এ দুইটি প্রশ্নকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি না। তাই প্রশ্ন দুইটির এক সঙ্গেই জবাব দিব। "কেন লিখি ?" কারণ, না লিখিয়া আমি পারি না। যদি কাগজের

উপর নাও লিখিতাম, তবে লিখিতাম মনে-মনে, লিখিতাম চিন্তার মধ্যে, লিখিতাম আমার চিন্তাগুলিকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া তুলিবার জন্য। কেন লিখি? কারণ, লেখা আমার কাছে চিন্তা করিবার, কাজ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। লেখা আমার কাছে নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মতো, লেখা ছাড়িলে আমি বাঁচিব না।

'কমিউন' পত্রিকা যে প্রশ্নাবলী আমাব নিকট পাঠাইয়াছেন সেই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহারা এই 'কেন'ব মধ্যে যে 'আদর্শবাদী নৈরাশ্যের' ইঙ্গিত করিযাছেন, আমাব 'কেন'ব মধ্যে তাহা নাই। প্রত্যেক মানুষ শ্বাসযন্ত্র দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কবে। প্রত্যেকেবই কাজ কবিবার নিজস্ব ভঙ্গী আছে। যেমন মানুষ তেমনই কাজ—হয় নৈরাশ্যবাদী নতুবা আশাবাদী, হয় স্বার্থপর অথবা সমষ্টিকল্যাণগত।

আমাব সকল কাজ সকল ক্ষেত্রেই চিরদিনই গতিপন্থী। যাহারা থামিয়া নাই, চিরদিন আমি তাহাদেব জন্যই লিখিযাছি! আমি নিজে কোনো দিন থামি নাই। আশা কবি যতদিন বাঁচিব থামিব না। জীবন যদি সম্মুখপানে চিবচলমান না হয়, তবে আমার কাছে জীবন অর্থহীন। তাই যে সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহামানবেব সমুদ্র পানে, আমি আছি তাহাদের সাথে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণেব এবং সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ গণতন্ত্র সঙ্ঘেব সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনেব অপ্রতিবোধ্য উত্তাল তরঙ্গ তাহাদেব বহন কবিয়া চলিয়াছে। তাহাদেব ভবিতব্যই আমার ভবিতব্য।

'কাহাদের জন্য লিখি'। অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর যাহাবা অগ্রগামী দল, এমন এক বিপুল আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যাহারা শুরু করিয়াছে যাহা সফল হইলে শ্রেণী ও সীমান্তের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া এক মহামানব সমাজের সৃষ্টি হইবে, আমি লিখি তাহাদেরই জন্য। আজ কমিউনিজম্ সমাজসংগ্রামের এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান যাহা আপোস জানে না, গোপনতা

জানে না, যাহা এক সুচিন্তিত, নির্ভীক যুক্তিবাদকে সম্বল করিয়া সু-উচ্চ পর্বতভূমি অধিকার করিতে চলিয়াছে। সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ তাহাদের অনুসরণ করিবে—পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে হয়তো অনেকেই, হয়তো অনেকেই করিবে দলত্যাগ, হয়তো পশ্চাদপসরণ হইবে বহুবার। যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে তাহাদের দ্রুত আগাইয়া আসিবার জন্য আমরা লেখকেরা আহ্বান জানাইতেছি। অভিযাত্রী বাহিনী কখনো থামিবে না।

আর. আর

ভাষ্য ও মন্তব্য

১। বার্লিনের সাময়িক পত্রিকা Demokratieতে ১৯১৯ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ডাঃ নিকোলাই কর্তৃক 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী' (Declaration of Independence of Thought) প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই অগাস্ট মাসে ফোরাম পত্রিকায় ভিলহেল্‌মস্ হার্জগ উহা প্রকাশ করেন; জুন মাসে ব্রুসেলসের লা'ব্‌ লিব্‌র্ পত্রিকায় পল কল্যাঁ কর্তৃক উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। বিদেশে ইহাদের প্রত্যেক সংস্করণ-গুলিতে বহু নূতন সমর্থনকারী স্বাক্ষরদান করেন।

লে প্রেক্যুরসোর পুস্তকে প্রকাশিত এই ঘোষণা বাণীর নিম্নে যাহাদের স্বাক্ষর ছিল তাহাদের নাম আমরা জানিলাম সত্য, কিন্তু ভয়ে অথবা জাতীয়তাবাদী একগুঁয়েমিতে যাহারা স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করিলেন তাহাদের নাম ইতিহাস ভুলিবে না। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শার্ল জিদ, ডাঃ রিশে, মাদাম ক্যুরি; লুসিতানিয়া নিমজ্জনের কথা ইহারা ভুলিতে পারিলেন না। আপাতবিরোধী বাক্‌বিশারদ বর্নার্ড শ বলিলেন, লেখনী দিয়া যাহারা যুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা অন্যায় করেন নাই; আনাতোল ফ্রাঁস স্বাভাবত একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন। ঐ কয় বৎসরে আমার ডায়েরীতে এইসবের চমৎকার একটি সংকলন আছে; আর আছে ইহাদের সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নিকট আমার একখানি নৈরাশ্যপূর্ণ চিঠি।

২। "এখন হইতে লাইবনেক্‌ ও রোজা লুক্সেমবুর্গের রক্ত মজুরশ্রেণী ও দলত্যাগী সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে অপার সমুদ্রের মত বহিয়া চলিবে। নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে অবস্থা এইভাবে পরিষ্কার হইয়া যাওয়ায়

ভালই হইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিপদ রহিয়াছে সাংঘাতিক। ফ্রান্সে ইহা কেহই বুঝিতেছে না। সিডারম্যানেরা ও এবার্টরা আজ প্রতিক্রিয়ার শিবিরে বন্দী। সাম্রাজ্যবাদী সমরতন্ত্রের বিরাট ধ্বংসস্তূপকে লইয়া পার্লামেণ্টারী সমাজতন্ত্রের কৌটিল্যগণ একটি নূতন দল গঠন করিতেছেন; ফ্রান্স যেন সতর্ক থাকে। স্পার্টাসিস্টদের নিকট হইতে সামাজিক বিপদ আসিতে পারে এই আশঙ্কায় ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্ট আভভূত হইয়াছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মিলনের স্পৃহাই যে স্পার্টাসিস্টদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিল না; বুঝিল না যে, জাতিগত প্রতিহিংসা ও অনির্বাণ বিদ্বেষবহ্নির মনোবৃত্তি নূতন শিডম্যান-এরৎসৃবের্গের-নসৃক-লুডনডর্ফ সহযোগিতার মধ্যে ব্যক্ত (১৯১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী লাভ'নির আঁতেরনাসিয়নাল পত্রিকায় প্রকাশিত)। আমার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না ইতিহাস তাহা প্রমাণ দিল। এবার্ট-নসৃক-শিডম্যানের বড় বড় পাণ্ডারা হিটলারের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছেন। ১৯৩৪ সালের ২২শে মার্চ তারিখে Arbeiter Illustrierte Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি ফোটোগ্রাফে দেখা যায় রাইখের প্রেসিডেণ্ট এবার্টকে ঘিরিয়া আছেন হপ্‌ম্যান ও রিটার ফন্ এপ। শেষোক্ত ব্যক্তিই পরবর্তীকালে ব্যাভেরিয়ায় হিটলারের তাঁবেদার হইয়াছেন। 'ব্রাউন শার্ট' দলের আরও অনেক অগ্রণী ব্যক্তি যথা, রোম, ফনকিলিংগার, লেভেৎসোভ, হাইনে-নসৃক-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করেন।

৩। যুদ্ধবিরতি ও শান্তির মধ্যবর্তীসময়ের প্রথম তিনমাস আমি একাধারে জার্মানীর ও অন্যদিকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য প্রয়াস পাইলাম। ফ্রান্স ও জার্মানীর বিপ্লবী ছাত্রগণের (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯), মিউনিকের সমাজতান্ত্রিক ছাত্রগণের ও তাহাদের ফরাসী কমরেডগণের (মার্চ ১৯১৯) এবং

বার্লিনের International Jugenbund ও Kameraden Revolutionare Studenten Frankreichs (মার্চ-এপ্রিল, ১৯১৯) এর মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করিলাম। ফ্রান্সে লিখিত আমার কতকগুলি চিঠিপত্র তাহাদের হাতে পৌঁছায় এবং উহা ল্যুমানিতেয় প্রকাশিত হয়, অপরগুলি ফরাসী সেন্সর আটকায়। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়ের সহানুভূতির কথা ফ্রান্স যাহাতে না জানিতে পারে সেজন্য সেন্সর সবচেয়ে বেশি কড়া হইয়া ওঠে।

৪। যুদ্ধের মধ্যেই আমরা এই আদর্শকে উচ্চে আসন দিয়াছি। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে রেভ্যু পলিতিক আঁতেরনাসিয়নাল প্রকাশিত এবং লে প্রেক্যুরসোর-এ সুমুদ্রিত 'চিন্তাজীবীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ' নামক আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। ক্লার্তের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ১৯১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে ভিলদ্রাক, সিগন্যাক, ভের্ত, বাজালজেৎ, সেনেভিয়ের, ডয়েন, ক্রুসি ও আমি সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে শুরু করি। অগাস্টমাসে কম্পাসের কাঁটা হঠাৎ একলাফে অসহিষ্ণু গোঁড়ামির প্রত্যন্ত দেশে চালিয়া গেল, আমাদের প্রতিক্রিয়াও হইল একেবারে বিপরীত দিকে; ঐক্যবদ্ধ আমরাও কম হইলাম না। বারব্যুস, দ্যুআমেল ও আমি প্রথম 'বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস' প্রকাশ করিলাম (২৪শে জানুয়ারী, ১৯২০)।

৬। ক্লেরাবোল। ভালমণ্ট ক্লিনিকে রুগ্নাবস্থায়, রোগের সবচেয়ে সংকটাপন্ন সময়ে ইহার শেষ ভাগ (বিশেষত ইস্টার ফ্রাইডের দীপসজ্জার কথা) লিখি। ১৯২০ সালের শেষদিকে বইখানি পারিতে বসিয়া শেষ করি এবং মে মাসের প্রারম্ভে 'সবার বিরুদ্ধে একা' এই আসল নাম দিয়া প্রকাশকের নিকট পাণ্ডুলিপি পাঠাই। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে বইখানি বাহির হয়।

৭। ১৯২০ সালে অগাস্ট মাসে সোয়েনেকে দিলীপকুমার রায় নামক জনৈক ভারতীয় বন্ধুর মুখে গান্ধী ও তাহার ব্যক্তিত্বের কথা প্রথম শুনি। কিন্তু ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও পরে ১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে কালিদাস নাগের পারি আগমণ পর্যন্ত আমি তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই। ইতিমধ্যে মাদ্রাজের প্রকাশক গণেশন্ গান্ধীর কতকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধের (ইয়ং ইণ্ডিয়া) প্রুফ আমার নিকট পাঠাইয়া দেন ও ঐগুলির জন্য আমাকে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীর রাজনৈতিকমতবাদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল না থাকায় আমি অস্বীকার করিলাম, গণেশন্‌কে লিখিলাম, "গান্ধীর মধ্যে আমি একজন আদর্শবাদী-জাতীয়তাবাদীকে দেখিতেছি" "তিনি ভাবাদর্শী জাতীয়তাবাদের মহত্তম পবিত্রতম প্রতীক।" কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আমার আন্তর্জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমি ছাড়িতে চাহিলাম না। আমি জানাইলাম, চিন্তা ও কর্মের এই বিরাট ব্যবস্থা সম্পর্কে হঠাৎ কোনো অভিমত প্রকাশ করিবার মানুষ আমি নই ; যতদিন পর্যন্ত গভীরভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইহা অধ্যয়ন করিতে না পারিতেছি ততদিন আমি অপেক্ষা করিব। অপেক্ষা আমি করিলাম, অধ্যয়ন যখন আমার সমাপ্ত হইল তখন আমি মুগ্ধ। ১৯২২-২৩ সালের শীতকালের সমস্ত সন্ধ্যাগুলি আমি আমার ভগ্নীর সহিত গান্ধীর প্রবন্ধগুলি পড়িলাম। ১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'গান্ধী সম্পর্কে রচনা' লিখিলাম ; তিনটি প্রবন্ধের আকারে উহা প্রকাশিত হইল ইউরোপ পত্রিকার ১৯২৩ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে সংখ্যায় (পত্রিকাখানি সবেমাত্র শুরু হইতেছে)। পরে ঐগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে। ইহার পর আমারই উদ্যোগে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক গান্ধীর প্রবন্ধগুলির একটি ফরাসী অনুবাদ বাহির হইল ; আমি উহার ভূমিকা লিখিলাম (১৯২৫ সালের জুলাই মাস)।

৮। এই সময়কার নানা রচনা ঃ

(ক) নিম্নোক্ত তিনখানি বই-এর ভূমিকা ঃ

Histoire de Douze Heures, লেখক পি. জে. বোনজিয়া, অগাস্ট ১৯২১ (বাইডার সম্পাদিত); Sous le Pressoir লেখক এইচ. গ্যাডেল (Soc-Mutuelle d' Edition);

Le Petit Jean, লেখক ফেডেরিক ভানে এডেন, ১৯২১ (সম্পাদক রাইডার);

(খ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'জাপানের তরুণদের প্রতি বাণী', ১২ই অগাস্ট, ১৯২১ ;

(গ) জুর্নাল দ্যু প্যেপল পত্রিকায় লিখিত কতকগুলি চিঠি ঃ ফেবারের বহিষ্কার সম্পর্কে এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবীদলগুলির মিলনের উদ্দেশ্যে (৮ই জুলাই, ১৯২২) ;

রুশ সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের বিচার সম্পর্কে 'বিপ্লবের মাতামহী' ক্যাথারিন ব্রেস্কোভস্কায়া লিখিত পত্রের ভূমিকা! ইহাতে আমি বোলশেভিকদের বিশেষত লুনাচারস্কির নিকট হিংসা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে আবেদন জানাইলাম ;

(ঘ) নিউ ইয়র্কের নিউ স্টুডেণ্ট পত্রিকার জন্য লিখিত (২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৩) 'No res Judicata pro Veritate habeatur' নামক প্রবন্ধ—ন্যাশন্যাল স্টুডেণ্ট ফোরাম-এর তরুণ কমরেডদের জন্য উহা লিখিত। প্রচলিত মতামত সম্পর্কে সুস্থ সমালোচনার মনোবৃত্তি জাগাইয়া তোলা উহার উদ্দেশ্য ;

৯। ম্যাক্স ইস্টম্যানের সহিত (১৯১৯ সালের ডিসেম্বর), জীন রিচার ব্লকের সহিত (জানুয়ারী-অগাস্ট, ১৯২০), ক্ষুব্ধ হিংসার মনোবৃত্তি লইয়া ইনি 'তখন মনস্বিতার সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করিবার" আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন) ; ফার্ণাণ্ড ডেসপ্রেসের সহিত, কঁৎ ল্যুসিদির সহিত

ও অন্যান্য অনেকের সহিত বিতর্ক ও পত্র-বিনিময়। কারারুদ্ধ মনাৎ-এর পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাবলী রচনা (ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সাল)।

১০। ১৯২২ সালের ১৬ই মার্চ আমি বার্লিন হইতে বিদেশে 'রুশ সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদলের' প্রতিনিধিদলের স্বাক্ষরযুক্ত দুইশত কথার একখানি সুদীর্ঘ তার পাই (এই প্রতিনিধিদল ছিল Benizinof Roubanovitch Roussanof, Soukhomeline, Tchernof লইয়া গঠিত; Gotz, Goudelmann, Timofeef, Rakow প্রমুখ ছয়জন বিখ্যাত পুরাতন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীর বিচারের ও আসন্ন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহারা প্রত্যেক স্বাধীন মানুষকে আহ্বান জানান)। আনাতোল ফ্রাঁসও অনুরূপ তার পাইয়া মস্কো সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া তার পাঠান; ইহাতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আমার মত তাহার পক্ষেও সমস্ত ব্যাপারটি ভালোভাবে বিচার করা ছিল কঠিন। কিন্তু এ'ধরনের ব্যাপারে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবেই। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী বোলশেভিক-বিরোধী সংবাদপত্রগুলিতে আনন্দ শুরু হইয়া গেল।

১১। এই পত্রবিনিময়ের গভীর ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। এই পত্রবিনিময়ের মধ্যে দেখা যায় লেনিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গর্কি যেন অকস্মাৎ আলো দেখিতে পাইয়াছেন। শোকসংবাদের সাংঘাতিক আঘাতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তাহার আবেগপ্রবণ মন যেন এক মুহূর্তে লেনিনের সমস্ত চিন্তাধারাকে ও কর্মধারাকে বুঝিতে পারিল, গ্রহণ করিতে পারিল। পূর্বে যদিও তিনি লেনিনকে ভালবাসিতেন ও প্রশংসা করিতেন তথাপি তাহার কর্মধারার সহিত বিরোধ তাহার ছিল। লেনিনের মৃত্যুতে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, তিনি যেন বলিতে পারিলেন, "আমি দেখিলাম, আমি জানিলাম, আমি বিশ্বাস করিলাম, আমার মোহ ভাঙিয়া গেল।"

১২। ১৯২১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ক্লার্তে পত্রিকায় প্রকাশিত "কর্তব্যের অপরার্ধঃ রলাঁবাদ সম্পর্কে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হইতে রলাঁ-বারব্যুস বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

তারপর ঃ

(ক) ১৯২২ সালের জানুয়ারী ব্রুসেলসের লা'র লিব্র্ পত্রিকায় প্রকাশিত আঁরি বারব্যুসের নিকট রমাঁা রলাঁর চিঠি।

(খ) ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে 'ক্লার্তে' পত্রিকায় প্রকাশিত বারব্যুসের নিকট লিখিত রলাঁর দ্বিতীয় খোলা চিঠি।

(গ) ১৯২২ সালের মার্চে লা'র লিব্র্ পত্রিকায় প্রকাশিত রমাঁা রলাঁর 'চিন্তার স্বাধীনতার আবেদন বাণীর' প্রত্যুত্তর।

(ঘ) ১৯২২ সালের ৮ই মার্চের লা'তেরনাসিয়নাল ও ২৫শে মার্চের ল্যুমানিতে পত্রিকায় প্রকাশিত মার্সেল মার্তিনের প্রবন্ধাবলী।

(ঙ) "কমিউনিস্ট বন্ধুগণের নিকট রমাঁা রলাঁর চিঠি" (লা'র লিব্র্ এপ্রিল ১৯২২)। (লা'র লিব্র্ ছিল ব্রুসেল্স্ হইতে প্রকাশিত একখানি পত্রিকা। অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত পল কলঁয়া ইহার সম্পাদনা করিতেন। যুদ্ধপরবর্তী প্রথম কয়েকবৎসরে আন্তর্জাতিক আর্ট ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় তাহার সংকলন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।)

বারব্যুসের নিকট লিখিত রমাঁা রলাঁর চিঠিগুলি ফ্রান্সে ও বিদেশের বহু সাময়িকপত্রে, বিশেষত নিউইয়র্কের দি নেশন পত্রিকায় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২), Les Humbles পত্রিকায় (১৯২২ সালের মার্চ সংখ্যা) ও কঁৎ ল্যুসিদির Rassegna Internazionale পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই তর্কযুদ্ধের প্রান্তদেশে আলবের মাতিয়েজ ও রমাঁা রলাঁর মধ্যে একটি ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যায় ঃ

(ক) এ. মাতিয়েজ লিখিত The European Elite and the Terror (ক্লার্তে, ১লা জুন, ১৯২২)।

(খ) রম্যাঁ রলাঁর উত্তর, এবং

(গ) মাতিয়েজের প্রত্যুত্তর (ক্লার্তে, ১লা জুলাই ১৯২২)।

১৩। ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ মনাৎ ও মার্তিনের সহিত আমার যে আলোচনা হয় সেই আলোচনার কথা আমার ডায়েরীতে আমি লিখিয়াছি। ইহাতে কিছু মন্তব্যও আমি লিখিয়াছি যাহার ফলে বারব্যুসের সহিত আমার তখনকার বিতর্ক সুসম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ্য আলোচনা অপেক্ষা আরও স্বাধীনভাবে আমি এই আলোচনায় ইউরোপ সম্পর্কে আমার নৈরাশ্যের কথা স্বীকার করিলাম। এই মনোভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিবার জন্য যখন আমাকে বলা হইল, আমি জবাব দিলাম, "আমার মনের গভীরে যাহা রহিয়াছে প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে নৈতিকভাবে আমি অক্ষম; কারণ জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে উহা সহ্য করা কঠিন হইবে। ইহা আমি নীরব শান্তভাবে বহন করি, কারণ ইতিহাসের বহু বৃহৎ দিগন্তের সহিত আমার পরিচয় আছে। আমার দূরদৃষ্টিতে আমি যাহা দেখি তাহাতে স্বল্পদৃষ্টিতে দেখা দুর্দিনের আশঙ্কার উপশম হয়। কিন্তু জনতা ত' বর্তমান ছাড়া আর কিছু দেখে না; অতএব বর্তমানের মধ্যেই তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এই আশ্বাস যদি কেহ তাহাদের না দেয় তবে তাহারা নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িবে। আমি জানি বিপ্লবের মধ্য দিয়া অবিলম্বে ইউরোপের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের যে দিবাস্বপ্ন তাহারা দেখিতেছে তাহা সফল হইবে না; আমি জানি মুষ্টিমেয় কবলিত সাম্রাজ্যবাদের এই সবে সূচনা। এ-কথা আমি তাহাদের বলিতে পারি না এবং এ-সম্পর্কে মিথ্যাও বলিতে পারি না। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমার বিশ্বাসই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে;

কিন্তু (ইউরোপের) জনতার এই বিশ্বাসের বল নাই। এই বিশ্বাসের বীজ তাহাদের বুকে পুঁতিয়া দেওয়াই আমার কাজ। কিন্তু এখন হইতে ফসল পাকা পর্যন্ত যে কাজ সে দীর্ঘদিনের কাজ।"

আজ যখন এই কথাগুলি আবার পড়ি তখন এ-কথা বলিতে পারি না যে, আমার সেদিনের সে-নৈরাশ্যের কোনো ভিত্তি ছিল না; কারণ ইউরোপের পরবর্তী ঘটনাবলীই তাহার প্রমাণ দিয়াছে। কিন্তু এই নৈরাশ্য কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইবার কারণ হইতে পারে না; পরন্তু ইহাই কর্মক্ষেত্রে থাকিবার কারণ। এই জনতাকে নাড়া দেওয়া দরকার। যে-সামাজিক বিশ্বাস আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সেই বিশ্বাসের বীজ ছড়াইতে হইবে এই জনতার জমি চষিয়া তাহার বুকে। তখন দেহে মনে গভীর অবসাদ লইয়া আমি দিন কাটাইতেছি। আগেই বলিয়াছি, যুদ্ধপরবর্তীকালের ফরাসীদের মধ্যে এই অবসাদ তখন সাধারণভাবেই দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে অতিরিক্ত শক্তিব্যয় ও শান্তির মধ্যে বিপুল আশাভঙ্গের সহজ স্বাভাবিক পরিণতিই এই অবসাদ।

আমার প্রশ্নকারীদ্বয় মনাৎ ও মার্তিনে তখন যে-কোনো উপায়ে বিপ্লবকে বাঁচাইবার জন্য ইস্পাতকঠিন সংকল্প লইয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন; কারণ, বিপ্লবকে বাঁচানো তখন তাহাদের নিকট জীবন-মরণের প্রশ্ন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নৈরাশ্য তাহাদেরও কম দেখা গেল না, সম্ভবত এ-নৈরাশ্য আমার চেয়ে তাহাদের নিকট আরও বেশি ব্যথার বস্তু। আমি লিখিলাম: আজিকার যে ট্রাজেডি, যে ট্রাজেডি তাহাদের মনের উপর জগদ্দল পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছে, রসনাকে বাঁধিয়াছে নানাভাবে, সে ট্রাজেডি আর কিছুই নহে—তাহারা যেন বুঝিতে পারিতেছে রুশবিপ্লবের ধ্বংস প্রায় সুনিশ্চিত। তাহাদের চোখে জেনোয়া সম্মেলন দ্বিতীয় ব্রেস্ট-লিটভস্কের রূপ ধরিয়া আসিতেছে;

ইউরোপের শক্তিগুলি রাশিয়ার উপর আবার যে শোচনীয় সন্ধি চাপাইতে চলিয়াছে তাহা রোধ করিবার শক্তি যেন রাশিয়ার নাই। এই বিপর্যয় যতই কাছে আসিতেছে ততই ইউরোপের সোশিয়ালিস্ট ও এনার্কিস্‌ট পত্রিকাগুলিতে বিপ্লবের উপর আক্রমণ তীব্র হইতেছে। আজ বহু সোশিয়ালিস্ট সাময়িক পত্রিকায় রুশবিপ্লবের বিরুদ্ধে যতটা বিষোদ্গার করা হইতেছে বুর্জোয়া পত্রিকাগুলিতেও ততটা হইতেছে না। প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহা এতই মুখরোচক যে মনাৎ এমন সন্দেহও প্রকাশ করিলেন যে, এই বিপ্লব-বিরোধিতাকে গভর্ণমেণ্ট গোপনভাবে সাহায্য করিতেছে। মনাৎ ও মার্তিনে নিবিড় ঘৃণার সহিত ফ্রান্সের মজুরশ্রেণীর উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, বিপ্লবের জন্য তাহারা কিছু করে নাই, কিছু করিতে চাহেও না; তাহারা সহজেই আত্মবিক্রয় করিয়াছে কিংবা ঘুম পাড়াইতে আসিলেই ভীরুর মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং এই ভীরুতাকে তাহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খোলশ দিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে। আমার বন্ধুরা বলিলেন যে, ফরাসীদের মত যখন কোনো জাতি এতখানি ঘৃণ্য স্বার্থপরতা দেখায় তখন রুশবিপ্লবকে নিন্দা করিবার অধিকার আর তাহাদের থাকে না। সেই অতি-মানবীয় উদ্যম সম্পর্কে বিচারবাণী উচ্চারণ করিবার কোনো অধিকার তাহাদের নাই, অধিকার আছে শুধু নীরব থাকিবার।

আর ইহার সহিত আমি যোগ করিলাম: "আমার সঙ্গীদ্বয়ের বেদনা আমি বুঝি। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা তাহারা অর্জন করিয়াছেন, এ-অভিজ্ঞতা ভীষণ হতাশার অভিজ্ঞতা। বিপ্লবের মত জনসাধারণের মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যই যে বীরত্বের উদ্দীপনা আসে সে-বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য নাই। অবিলম্বে ইহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। কারণ এ-মুহূর্ত একবার হারাইলে সবই যাইবে। তরঙ্গ সরিয়া যাইবে। একদিন আবার এই তরঙ্গ উঠিয়া আসিবে। কিন্তু যে-মানুষ

অবিচলিত প্রত্যয়নিষ্ঠ—সে হাল ছাড়ে না ; তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের জন্য নির্নিমেষ সতর্কতায় অপেক্ষা করিয়া থাকে !" (যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী কয়েক বৎসরের ব্যক্তিগত ডায়েরী, ৩২ খণ্ড)।

১৪। হেনরি ভান ডের ভেল্ডেই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি নীতির দিক হইতে বিপ্লবের নিন্দা না করিয়া প্রকৃতপক্ষে উহাকে বর্জন করেন এবং বলেন, "স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ধ্বংস ও মজুরশ্রেণীর স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদির ফলে রাশিয়ায় সাম্যবাদ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।"

১৫। "আমার নিজের সম্বন্ধে—সহজ, স্বতন্ত্র একটি মানুষের সম্বন্ধে আমি গান গাই,
তবু বলি গণতন্ত্র, জনসাধারণ !" ওয়াল্ট হুইটম্যান্।

১৬। ক্লার্তে পত্রিকায় "দি ইউরোপীয়ান এলিট এণ্ড দি টেরর" নামক প্রবন্ধে আলবের মাতিয়েজ বিনা কারণেই আমাকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন (১লা জুন, ১৯২৪) ; ভাষায়ও খুব সংযম দেখাইলেন না। আমার বিরুদ্ধে তিনি নিক্ষেপ করিলেন ইতিহাস হইতে আহরিত বজ্র ; উত্তর আমাকে দিতে হইল ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে (ক্লার্তে, ১লা জুলাই, ১৯২২)। বিষয়টি ছিল ১৭৯৩ সালের বিপ্লবের সহিত ওয়ার্ড্-সওয়ার্থ, কোলরিজ্, শিলার, ক্লপস্টক প্রমুখ অগ্রগত ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণের বিচ্ছেদ ; কন্‌ভেনশনের নেতাগণ বুদ্ধিজীবিগণের প্রতি-ক্রিয়াকে গণনার মধ্যে না আনিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, সেই ভুল না করিবার জন্য আমি আমার সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বন্ধুগণকে উপদেশ দিয়াছিলাম।
অনেক বেশি সহনশীলতার সুরে আমেদে হ্যনোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার যোদ্ধাগণকে মজুরবাহিনীতে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। (হ্যুমানিতে, ১০ই মার্চ, ১৯২২, "কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার সম্পর্কে")।

এবার তিনি নির্ভুল পথ ধরিলেন। তিনি ইহাও বলিতে পারিতেন —অভিজ্ঞতা হইতে ইহার সত্যতা আজ আমি উপলব্ধি করিয়াছি, যে আদর্শের জন্য মজুরশ্রেণী সংগ্রাম করিতেছে তাহার বাহিরে যে কোনোরূপ 'স্বাধীনতা'ই আলেয়ার আলো। কিন্তু সেদিন তাহার আহ্বানের জবাবে আমি লিখিয়াছিলাম (১০ই মার্চ): "যখনই মজুরশ্রেণী সত্য ও মানবতাকে সম্মান করিয়া চলিবে-তখন তাহার সাথে আছি! যখনই সে উহাদের অসম্মান করিবে তখনই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।"

১৭। বিখ্যাত উদ্যানবিজ্ঞানী মিচুরিনের নামে কোজ্‌লভ শহর ও জেলার নামকরণ হইয়াছে, আর মানবহৃদয়মালঞ্চের সদাপ্রফুল্ল মালাকর ম্যাক্সিম গর্কির নাম পাইয়াছে নিজ্‌নি নভোগোরোদ। ইহার উপর পামিরের উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া ও শহরগুলির কথা ত' ছাড়িয়াই দিলাম; লেনিন, স্টালিন প্রমুখ বিরাট সমাজস্রষ্টা বীরগণের নামে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে।

১৮। ১৯২১ সালের ২০শে ডিসেম্বর গর্কির কাছে আমি বারব্যুসের নিকট লিখিত আমার প্রথম পত্রখানি পাঠাইয়াছিলাম। স্যাঁ ব্লাজিয়াঁ হইতে ১৯২২ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে গর্কি নিম্নলিখিত উত্তর পাঠান:

"বারব্যুসের নিকট লিখিত আপনার পত্রখানি চমৎকার এবং আপনার ও আমার চিন্তার সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে দেখিয়া আমি যে কত খুশি হইলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনার ভাবধারাকে আমি ভালোবাসি ও মূল্যবান বলিয়া মনে করি; গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার নিজের দেশে উহা অবিশ্রাম বলিয়া আসিতেছি।"

২৫শে জানুয়ারী তারিখে তিনি লিখিয়াছেন:

"বারব্যুসের নিকট আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন আমার মতে তাহার মূল বক্তব্য: লক্ষ্য পবিত্র হইলে যে-কোনো উপায়ই পবিত্র—এই

নীতির সমালোচনা! লক্ষ্য কি? এমন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা যাহার মধ্যে মানুষ সৎ, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও ন্যায়বান হইতে পারে। বিপ্লবের সূচনাকাল হইতেই রাশিয়ায় আমার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে আমি সংগ্রামকালে নৈতিক শুচিতা রক্ষার কথা বলিয়া আসিতেছি। লোকে আমাকে জানাইয়াছে, ইহা নির্বুদ্ধিতা, অসম্ভব, এমন কি ক্ষতিকর। যাহারা এই জবাব আমাকে দিয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই নিজেদের অনুসৃত নীতির প্রতি একটা প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু নিজেদের স্বভাবের বিরোধিতা করিয়াও ইচ্ছা করিয়াই হিংসাকে বরণ করিয়াছেন। ইহারা সেই গোঁড়া ধার্মিকদলের লোক যাহারা "অপরের মুক্তির জন্য নিজেরা পাপ করে।"

"হায়! আমি আজ পর্যন্ত দেখিলাম না ইহা কাহাকেও বাঁচাইতে পারিয়াছে, অথবা কাহাকেও ত' টিকিতে দেখিলাম না; বিদ্রোহী বিবেকের দংশনে ও দ্বিধাবিদীর্ণ মনের যন্ত্রণায় দুর্বল বা অবসন্ন হইয়া তাহারা শেষ হইয়া গেল। প্রিয় রলাঁ, বারবুস্যের নিকট লিখিত পত্রে আপনি যে ভাবধারার বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা গোঁড়ামীমুক্ত ও চমৎকার। আপনার জঁ্যা ক্রিস্তফ ও অন্যান্য পুস্তক পড়িয়া রলাঁবাদ সম্পর্কে আমার যে ধারণা হইয়াছে, বারবুস্যের নিকট আপনার পত্রে তাহা পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্মের মতই শক্ত কোনো নৈতিক নিষ্ঠা যদি মজুরশ্রেণীর বিবেককে তাহার জন্মের প্রত্যুষ হইতেই বিদীর্ণ না করে, তবে সত্যকার কোনো সমাজতন্ত্রী নাই বা থাকিতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই ভাবধারা আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি! ইহার জন্য আমাকে যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহা সামান্য নহে। ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও আমি বাধ্য হই। আমরা, যাহাদের ধর্মান্ধতা বা বিশ্বাসের সংকীর্ণতা নাই তাহারা, নিজেদের বিশ্বাসের জন্যই আজ

সংগ্রাম করিতে বাধ্য; ঘৃণা ও কলংক পর্যন্ত বরণ করিয়া আমরা আমাদের বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করিতে বাধ্য! আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছি না, তবে আমার মনে হয় আমরা কিছু করিতে পারিবই। আপনি কি তাই মনে করেন না? আসুন তবে, আর যাহারা আমাদের মত চিন্তা করেন তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করি। যাহারা অন্যভাবে চিন্তা করেন হয় ত' তাহাদের আমরা বুঝাইতে পারিব, যে আত্ম-সমালোচনা আজ আমাদের প্রয়োজন তাহা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য ও প্রয়োজনীয়।"

গর্কির চিঠিগুলির কিছু অংশ তুলিয়া দিলাম মাত্র। চিঠিগুলি তিনি আমাকে রাশিয়ান ভাষায় লেখেন, আর আভরামফ্ ফরাসী ভাষায় উহার অনুবাদ করেন।

১৯। ইউরোপ, এমনকি রাশিয়া সম্পর্কে গর্কির হতাশা ১৯২৩ সালের চিঠিগুলির মধ্যে যতটা ফুটিয়াছে এতটা আর কখনই হয় নাই। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই হতাশার মধ্যে তাহার কাটে। লেনিনের মৃত্যু তাহার সমস্ত মন ও মস্তিষ্ককে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এই শোচনীয় ঘটনার আগে ও পরে লেনিন সম্পর্কে লিখিত তাহার চিঠিগুলিতে দেখা যায় তাহার আবেগ কতখানি তীব্র ছিল। তিনি নিজেই বলিতেন লেনিনকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালোবাসেন। তাহার সহিত তিনি অবিরাম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে ভালোবাসিতেন তথাপি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর লেনিনই জয়ী হইলেন, গর্কি স্বীকার করিলেন তিনিই ছিলেন নির্ভুল।

২০। এবার সত্যই পারি ছাড়িয়া যাইতেছি! এতখানি মানসিক নিঃসঙ্গতা লইয়া যাইতেছি যহা জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই। ফ্রান্সের রাজনীতিতে ও চিন্তাজগতে প্রতিক্রিয়ার শাসন শুরু

হইয়া গিয়াছে। আমি পারি পরিত্যাগ করিতেছি ঠিক জেনোয়া সম্মেলনের সময়, যে-সম্মেলনে একমাত্র ফরাসী প্রতিনিধিরাই ইউরোপে শান্তি আনিবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। জনসাধারণ উদাসীন। জাতি আরেকটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত; পয়ঁ্যাকারের সুবিধা অনুসারে এই যুদ্ধের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। আজ হোক, কাল হোক দ্বিতীয় ওয়াটারলু অনিবার্য। বড়ই বেদনার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, যখন ইহা আসিবে তখন ইহাকে প্রাপ্য হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে! (রবিবার প্রভাত, ৩০শে এপ্রিল। আমার ডায়েরীর ৩২ তম খণ্ডের শেষ কথা)।

২১। ইউরোপে পর্যন্ত আমি প্রেসিডেন্ট ম্যাসারিকের সহিত ব্যক্তিগত-ভাবে পরিচিত হইলাম। ১৯২৪ সালের মে মাসে ইনি আমাকে প্রাগে নিমন্ত্রণ করেন। '১৯ সালের মে মাসে পি-ই-এন ক্লাবের প্রথম সম্মেলনে যোগদানের জন্য সমুদ্রপথে লণ্ডন যাই। সেখানে টমাস হার্ডি, জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি, এইচ. জি. ওয়েলস্‌, বারনার্ড শ', জাংউইল প্রমুখ বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখকগণের সহিত আমার পরিচয় হয়।

২২। ১৯২১ সালের ১লা মে লণ্ডনে পি-ই-এন ক্লাবের যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, সেখানে সম্মেলনের পূর্বাহ্নে বেলজিয়াম দলের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগে জার্মান জাতিকে সম্মেলন হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। আমি সেখানে অন্যান্য জাতির সহিত জার্মানীর সহযোগিতার দাবী জানাই এবং একটি বিবরণীতে বেলজিয়ম দলের মনোভাবের খোলাখুলিভাবে তীব্র নিন্দা করি। বিবরণীটি ১৯২৩ সালের ১৫ই জুন ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দুর্গত জার্মানদের জন্য একটি আবেদন বাহির করি। উহা ইউরোপ ও লিব্‌র্‌ প্রোপো পত্রিকায় ১৯২৪

সালের ১২ই ও ১৫ই জানুয়ারী সংখ্যায় বাহির হয়! পারির বড় কাগজগুলির মধ্যে একমাত্র এ্যর নুভেল-এই উহা প্রকাশিত হয়। এই আবেদনে যে-সাড়া পাই তাহা সত্যই বলিবার মত। একদিন এ-কাহিনী যখন প্রকাশিত হইবে, তখন লোকে অবাক হইয়া শুনিবে যে, স্বাধীন বলিয়া সুখ্যাত বহুলোক কেহবা প্রকাশ্যে, কেহবা পরোক্ষে কেহবা কাপুরুষের মত এই আবেদনে সাড়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন! সেকুর আঁতেরনাসিয়নাল ও জ্যাঁফাঁ-র ফরাসী কমিটিকে ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাদার লিয়ঁ বেরনার ও ফাদার কালামেৎ-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছিল একমাত্র এই কারণে যে, কমিটি আমার আবেদনটি প্রকাশ করিয়াছিল এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত জার্মান শিশুদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল। যে সম্প্রদায় নিজেদের প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টান বলিয়া পরিচয় দেয়, এই একান্ত মানবসেবামূলক আবেদনের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত লজ্জাজনক। (১৯২৪ সালের মার্চ মাসের লুনিভের্সেল পত্রিকায় ডাঃ দ্যুমেসিলে-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। (ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে এ-সম্পর্কে যেসকল অপমানকর চিঠি পাইয়াছিলাম তাহার উল্লেখ এখানে করিলাম না। সেগুলি ফাইলে আছে।)

২৩। রুর-এর বিজয়ীদের আশু উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, যে-নীতি তাহারা অনুসরণ করিতেছেন কিছুকাল পরে তাহার ফল সাংঘাতিক হইবে। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবে দ্বিগুণ ঘৃণা লইয়া এবং সে-যুদ্ধে উভয়েই ধ্বংস হইয়া যাইবে। নির্যাতিতকে যতখানি অনুকম্পা করি ততখানি অনুকম্পা করি নির্যাতনকারীকেও। তাহারা তাহাদের সন্তানসন্ততিগণের জন্য ভীষণ এক ভবিষ্যতের সৃষ্টি করিতেছে। (কঁৎ স্যুসিদি সম্পাদিত রাসেনা ইন্তেরনাৎসিওনাল-এ ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে লিখিত)।

ইহার অনেক পরে বের্নার লকাশকে লিখিয়াছিলাম : "যখন 'শান্তির' (?) সন্ধি ইউরোপের সর্বত্র যুদ্ধের অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, মিলিতদের বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং বিচ্ছিন্নদের সম্মিলিত করিয়া, তখন একনায়কত্বের (dictatorship) অভ্যুদয় যদি হয়, তাহাতে আশ্চর্য হইব না। বিজয়ী ফ্রান্স যে-গাছ নিজের হাতে পুঁতিয়াছে ইহা তাহারই ফল।" (ল্য ক্রি দে প্যেপ্‌ল পত্রিকায় ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত)।

২৪। ১৯২৪ সালের ৬ই মার্চ প্রিমো দে রিভেরার সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত মিগেল দে উনামুনো-র পক্ষ হইতে প্রতিবাদে (১৯২৪ সালের মার্চে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত)। ১৯২৪ সালের ৩০শে নভেম্বর "ব্যাভেরিয়ান দুর্গের রাজনৈতিক বন্দীদিগের পক্ষ হইতে জার্মানীর নিকট আবেদন।"

২৫। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত, ১৫ই জানুয়ারী ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত : "ইউরোপীয় পাঠকের প্রতি নিবেদন।"

"সমসাময়িক ভারতবর্ষের কর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কীয় প্রবন্ধাবলী ; তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড, রামকৃষ্ণের জীবনী ; ২য় খণ্ড, বিবেকানন্দের জীবনী ; ৩য় খণ্ড, সার্বজনীন ভগবদ্‌বাণী ; ১৯৩৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে লিব্রাবি স্তক-এ প্রকাশিত হয়।

২৬। আমার সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকখানি যখন গান্ধীকে পাঠাই তখন এই আশঙ্কা ব্যক্ত করি যে, তাহার চিন্তাধারা আমি সবস্থানে হয় ত' বুঝি নাই ; যদি কোনো ভুল হইয়া থাকে তিনি দেখাইয়া দিলে আমি সংশোধন করিতে চাই। রোগমুক্তির পর যে-স্বাস্থ্যনিবাসে তিনি বিশ্রাম লইতেছিলেন সেখান হইতে গান্ধী লিখিলেন :

আন্ধেরি, ২২শে মার্চ, ১৯২৪

প্রিয় বন্ধু,

আপনার অনুগ্রহপত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনার প্রবন্ধে যদি আপনি এখানে-সেখানে দু'একটা ভুল করিয়া থাকেন তবে তাহাতে কি আসে যায়! আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছি যে, এত কম ভুল আপনি করিলেন কেমন করিয়া এবং কেমন করিয়া এতদূরে, এত ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া আমার ভাবধারার এত নির্ভুল ব্যখ্যা আপনি করিলেন। ইহাতে আবার প্রমাণিত হইল যে, বিভিন্ন দেশে তাহার ঠিকানা হইলেও মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে···

এম. কে. জি

২৭। প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে ইজভেস্তিয়ার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা ডব্লু. জে. পান্স্কি-সল্স্কিকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

সেক্স্পীয়রের 'Coriolanus' নাটকের শেষের সাত লাইন আমি ইজভেস্তিয়ায় তার করিয়া পাঠাইলাম ঃ

I am struck into sorrow...Take him up
Help ; three o' the chiefest soldiers ; I will be one
Beat thou the drum, that it speak mornfully :
Trail your steel pikes ! Though in this city
He hath widowed and unchilded many a one...
Which to this hour bewail the injury,
Yet he shall have a noble memory......

পরে লেনিনের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'লেনিন, শিল্প ও কর্মী' নাম

দিয়া লেনিন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখি ! ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইউরোপ পত্রিকায় উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৮। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে মস্কোর স্টেট একাডেমি অব সায়েন্সেস এণ্ড আর্টস ইউরোপের বিপ্লবী শিল্পের একটি প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন (সাহিত্যিক রচনা, ছবি, নাটক, গান, নাচ, সিনেমা ইত্যাদি)। প্রদর্শনীসমিতির সভাপতি পি. কোগানের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্রে তাহারা পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার আর্টিস্টগণকে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেন।

২৯। স্বাতন্ত্র্যবাদের মরুভূমির মধ্যে মার্ক সংগ্রাম করিতেছিল। কেমন করিয়া ইহা ঘটিল? কাল পর্যন্তও যখন যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছিল তখনও ইহা ছিল স্বাধীন আত্মার মরূদ্যান; তখনও ছিল ঝরনার স্বচ্ছ জল, আর খর্জুরবৃক্ষতলে পরিষ্কার রাত্রি। আজ ঝরনার জল বিষাক্ত ও কর্দমাক্ত, খর্জুরবৃক্ষের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আকাশ ধূসর, বাতাসে আগুনের হল্‌কা। মরুভূমি তাহার লোলজিহ্বা মেলিয়া সব কিছু মুছিয়া খাইয়াছে।

সোজা, স্পষ্ট ভাষায় বলি। ইহাদের আত্মসমর্পণের চিত্রকে ঢাকিবার চেষ্টা করা এই কাপুরুষদের বেশি সম্মান দেখানো কারণ, আত্মসমর্পণ ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন মন এ আর নহে। ইহা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার কি আর বাকী আছে? ইহার পতাকার কিছু ছিন্নঅংশ পকেটে লুকানো রহিয়াছে, ছোটখাট ব্যাপারে তাহা বাহির করিয়া দেখাইতেছে। রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রচালকদের, জনমতের ও সংবাদপত্রের বিরোধিতা করিবার সাহস কাহার আছে? বেষ্টনীর মধ্য হইতে তাহারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া জাহির করিতেছে। চোরদের মত বড় বড় কাব্যের বুলি আওড়াইয়া তাহারা তাহাদের নিজেদের বাগানের কাজ লইয়া আছে। নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে কুণ্ডলী

পাকাইয়া হোরেস আগামী বংশধরদের উদ্দেশে চিৎকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াছেন এ-কথা গর্বের সহিত স্বীকার করিবার মত একটা নৈরাশ্যবাদ তাহার ছিল। কিন্তু অপরসকলে আমাদের এ-কথা বিশ্বাস করিতে বলে যে, তাহারা স্বাধীন, যদিও প্রভুর দেওয়া রুটিতেই তাহারা খুন্নিবৃত্তি করিতেছে। এই দাম্ভিক বুদ্ধিজীবীর দল ও তাহাদের প্রভুদের মধ্যে যেন একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে (প্রভুর পরিবর্তন হয়, দাসত্বের হয় না)। এ-চুক্তি গৃহস্থের সহিত গৃহপালিত পশুর চুক্তি। "যতক্ষণ তুমি আমার কাজ করিবে, যতক্ষণ আমার গোলাবাড়ি পাহারা দিবে, ততক্ষণ তোমার সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু চলিয়া যাইও না, যদি কথা শোন তবে আমি তোমাকে খাওয়াইয়া মোটা করিব।" তাহারা ইহাতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, চলিয়া যাইবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। প্রভু যখন তাহাদের বাড়ির বাহিরে পাঠান তখন সে বিচলিত হয় না, কারণ গলায় তাহাদের কলার রহিয়াছে। কেহ কেহ কলার ফেলিয়া দিয়া কলারমুক্ত গলা সকলকেই দেখাইয়া বেড়ান বটে, কিন্তু কলারের দাগ ত' ঢাকিতে পারেন না।

মার্ক যখন দেখিল যে-প্রভুদের সে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে এবং যে-অগ্রজদের উপর সে নির্ভর করিয়া আসিতেছে তাহাদের মন ও বুদ্ধির চরম আত্মসমর্পণকে তাহারা স্বাধীন নির্বাচনের অজুহাতে ঢাকিতে চাহিতেছেন, তখন তাহার আর লজ্জার অবধি রহিল না। সে দেখিল এই আত্মসমর্পণ করিয়াছে কেহবা স্বেচ্ছায়, কেহবা ভয়ে। অগ্রজদের এই অধঃপতন অনুজদেরও স্পর্শ করিল; অল্পবয়সেই তাহারা বুদ্ধির গণিকাবৃত্তির জন্য শিক্ষিত হইয়া উঠিল। নিলামের সর্বোচ্চ ডাক যাহার তাহার কাছেই তাহারা আত্মবিক্রয় করিল। চিন্তার স্বাধীনতা... কোথায় সে স্বাধীনতা?

মার্ক ভাবিল ইহাদের চেয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থারা ভাল ; যে ছুরি একদিন তাহার বুকে বসিবে সেই ছুরির মতই তাহারা খোলা ও পরিষ্কার।

৩০। ১৯৩৪ সালের অগাস্ট মাসে কার্ল র‍্যাডেক সোবিয়েৎ লেখক কংগ্রেসে "বর্তমান বিশ্বসাহিত্য ও প্রলেটারিয়ান আর্ট" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। (ইণ্টারন্যাসানাল প্রেস করেসপণ্ডেস, ৮৩-৮৪ সংখ্যা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)।

"আমরা কেবল রমঁ্যা রলাঁর নূতন মতবাদ গ্রহণ দেখিলাম না। জগত সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা তাহাকে যেমন অসম্ভব অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল, দেখিলাম তাহার নায়িকাকেও তিনি সেই অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। লা'ম আঁশাতে পুস্তকের প্রথম কয়েক পর্বে কাহিনী ব্যাহত হইয়াছে, কারণ কাহিনীকে কিভাবে অব্যাহত রাখিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। এই লেখকের এখন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইয়াছে ? তাই কাহিনীও তাহার সত্য ঐতিহাসিক রূপ খুঁজিয়া পাইয়াছে। উপন্যাসের শেষ পর্বে নায়িকা তাই সংগ্রামের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

৩১। "ইউরোপের যে-সকল আন্তরিক লেখকগণ সংগ্রামে যোগদান করা সম্পর্কে মন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহাদের জবাব দিয়াছে ইতিহাস। ১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিনের স্কোয়ারে স্কোয়ারে জার্মান ফাশিস্টরা যে-সকল বই পোড়াইয়া বহ্নুৎসব করে সেগুলি কেবল স্টালিন, গর্কি অথবা রেনের মত জার্মান মজুরদের লেখা বই নহে ; সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত মানবপ্রেমিক লেখকদের রচনাও উহাদের মধ্যে ছিল। ইতিহাসের প্রাঙ্গনে আজ যে-সংগ্রাম শুরু হইয়াছে নিরপেক্ষতা সেখানে আর সম্ভব নহে।"

৩২। এই কয়বৎসরে সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে আমার রচনা :

(ক) "মরক্কো যুদ্ধ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে," ১৫ই জুন, ১৯২৫ ;

(খ) "ইন্দোচীনে ছাত্র ও শ্রমিকদের নিকট চিঠি," ১৭ই মে, ১৯২৬ ;
(গ) "যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কর্তৃক নাইকারাগুয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ", ১১ই জানুয়ারী, ১৯২৭। এ. পি. আর. এ (United Print of Mannual and Intellectual Workers of Latin America) কর্তৃক সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় বিতরিত।
(ঘ) "সাক্কো ও ভানৎসেত্তি-র সমর্থন" (১৯২৬ সালের ২৪শে অগাস্ট মাসে লুসিয়ঁা প্রিস-এর নিকট লিখিত চিঠি, ২৮শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের নেশন-এ ও ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)
(ঙ) "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাণী", ১৬ই মে, ১৯৩১।"
৩৩। ইহা ছাড়া পল বঁকুর সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমারই উদ্যোগে শুরু হয় এবং ১৯২৭ সালের ১৫ই এপ্রিল "এই স্বৈরতান্ত্রিক আইন মানিব না" বলিয়া আমার পণ প্রকাশিত হয় (১৫ই মে, ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত)। যদিও ১৯২৭ সালের ৭ই মার্চ ফরাসী পরিষদ কর্তৃক উহা গৃহীত হয় তথাপি এই জনমত জাগরণের ফলে উহা প্রত্যাহৃত হয়।
একই কারণে ও একই সময়ে ইতালীর বিখ্যাত ফাশিস্টবিরোধী নেতা জি. সালভেমিনিকে আমি জানাই যে, ডেমোক্রাটিক ইণ্টারন্যাশনাল লীগ অব ফ্রেণ্ডস অব ইটালিয়ান লিবার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিতে আমি যোগদান করিতে পারিব না ; কারণ 'ফাশিজম্' ও 'কমিউনিজম্' উভয়কেই সমানভাবে বাধা দিবার জন্য একটি 'তৃতীয় আন্দোলন' চালনাই ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। (২৪শে মে, ১৯২৭)। সালভেমিনিকে আমি লিখিলাম ঃ "পূর্ব হইতেই কমিউনিজম্-বিরোধিতার ঘোষণাকে আমি অনুমোদন করিতে পারি না।" যদিও আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না তথাপি তাহাকে জানাইলাম, "কমিউনিজমের মধ্যে আমি একটি নূতন গভীর গণশক্তির সন্ধান পাইতেছি ; ফাশিজমের বিরুদ্ধে অভিযানে ইহাই

হইবে সর্বাধিক শাক্রমান বাহিনীগুলির অন্ততম। অতএব, ইতালীর ফাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ইহার সহযোগিতা প্রত্যাহারকে আমি অত্যন্ত শোচনীয় মনে করি।"

৩৪। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাহিরে যে স্বল্পসংখ্যক বিখ্যাত ফরাসী লেখক এই সংকটমুহূর্তে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি ঘোষণা করিয়াছিলেন—আমি তাহাদের অন্যতম। মস্কোর সংবাদপত্র-গুলিতে আমার চিঠি প্রথম প্রকাশিত হয় পরে ১৯২৭ সালের ৭ই নভেম্বর ল্যুমানিতে পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। ৬ই নভেম্বর ইভরি-র এক প্রকাশ্য জনসভায় কাচিন উহা পাঠ করেন। ইহাতে ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের অনেকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। বিপ্লবী এনার্কিস্ট মঃ ল্যাজারেভিচ্ পারি হইতে লিখিত একখানি চিঠিতে বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আমি ১৬ই নভেম্বর তাহার পত্রের জবাব দিলাম এবং নির্বাসিত ইতালীয় ডেপুটি গিদো মিলিওলির সদ্যপ্রকাশিত দি সোবিয়েৎ ভিলেজ নামক পুস্তকখানিকে প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার অভিযোগের জবাব দিলাম।

"ইউরোপ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্টগুলির সমস্ত অপকৌশলের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জনসাধারণকে আমি রক্ষা করিব। আমি বুঝি না এ ব্যাপারে কেন সকল স্বাধীন ব্যক্তিরা তাহাদের নিজেদের দুঃখ-বেদনাকে চাপিয়া যান না। ইউনাইটেড ফ্রণ্ট! দশবছর আগে যেদিন শিকল ভাঙ্গিয়াছিল, সেদিনের বার্ষিকী উৎসবে যখন আমি যোগ দিই তখন সোবিয়েতের কোন নেতা আর কোন নেতার বিরোধিতা করিতেছেন তাহা আমি ভাবি না। আমি শুধু মনে রাখি, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে, বস্তিয় ভাঙ্গিয়াছে। "এখন তোমাদের কর্তব্য এ-কাজ সুসম্পন্ন করা (আমার নাটক The 14th of July-এর শেষে কামীয় দেলঁ্যা যেমন জনগণের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন), "প্রারম্ভকাল শেষ কর!

এক বাস্তীয়্ ভাঙ্গিয়াছে; আরো বাস্তীয়্ রহিয়াছে; আক্রমণে আগাইয়া যাও।"

৩৫। চার বৎসরে (১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে 'রুশ ভ্রাতাগণের প্রতি' শীর্ষক ভাষণের পর) ফরাসী জনমতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। জনসাধারণের সমক্ষে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রকাশিত হওয়ায় ও মস্কোতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত টেক্‌নিশিয়ানদের বিচারের ফলে ইউরোপের প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর অন্তরে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

এই চাঞ্চল্যকর বিচারের ফলে স্পষ্ট দেখা গেল যে-মজুরশ্রেণী হইতে তাহারা আসিয়াছে তাহারই প্রতি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টমনা কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই আর নিরপেক্ষ থাকা চলে না! ১৯৩১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভকস্ পত্রিকায় আমি লিখিলাম: "এইটুকু আপনাদের বলিতে পারি, আমি আর একা নই; ইউরোপের অনেকেই আমার পক্ষে আসিতেছেন। গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় ইউরোপের বহু সুস্থবিবেকই গভীরভাবে আলোড়িত; আত্মবিক্রীত সংবাদপত্রগুলিতে অবশ্য ইহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আমার মধ্যে এক নূতন ইউরোপের অভ্যুদয়কে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। এই ইউরোপ আপনাদের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।"

৩৬। আমি প্রায়ই বিরোচিত শক্তিমান অবাধ্যতার (disobedience) সমর্থন ও প্রচার করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই ইহা ফলপ্রদ নহে, এমন কি ইউরোপে ইহার একটি গৌরবময় অতীত রহিয়াছে। (১৯০০ সালের ১৪ই জুলাই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' সম্পর্কে চিঠি।) কিন্তু এই মহান অস্বীকৃতির পথ যাহারা গ্রহণ করেন তাহারা ত্যাগ ও দুঃখবরণের দুরূহ কর্তব্যও সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন।

আমি আইনস্টাইন ও ওআর রেসিস্টারস্ ইণ্টারনেশন্যাল হইতে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিলাম। ওআর রেসিস্টারস্ ইণ্টারনেশন্যাল তখন আইনস্টাইনের ঘোষণাবাণীটি গ্রহণ করিয়াছে। কোনোরূপ বিপদের ঝুঁকি না লইয়া কেবলমাত্র সহজ ব্যক্তিগত অস্বীকৃতির দ্বারাই পৃথিবীতে যুদ্ধের বিলোপ ঘটানো চলিতে পারে, তাহাদের এই বিপজ্জনক শিশু-সুলভ আশাবাদ যে কতবড় বিভ্রান্তির তাহা আমি তাহাদের জানাইয়া দিই। (১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী ওআর রেসিস্টারস্ ইণ্টারনেশন্যাল-এর সেক্রেটারী রানহাম্ ব্রাউনের সহিত পত্রবিনিময়।)

৩৭। ইণ্টারনেশন্যাল প্যাসিফিস্ট নামে এউজেন রেলজিস একখানা বই লিখিয়াছেন। ১৯২৯ সালে ফ্রান্সে আঁদ্রে দেলপেশ কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অস্ট্রিয়ার মুনৎসেনবের্গ-এ অনুষ্ঠিত লা'তেরনাসিয়নাল দে রেজিস্তাঁ আলাগের-এর এক সম্মেলনে তিনি যাহা বলেন এই পুস্তকে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত করেন। এই উপলক্ষে প্রেরিত আমার একখানি চিঠি ও একটি বাণী তিনি তাহার পুস্তকে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে তিনি যে ইউরোপীয় তদন্ত পরিচালনা করেন আমি তাহার একখানি দীর্ঘ জবাব দিই; সেটি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জানি না। সমাজসংগ্রাম ও শ্রমজীবী-শ্রেণীকে ছোট করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত মসীকৌলিন্যাভিমানী বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর বাস্তবসংস্পর্শহীন শান্তিবাদের নিকট এই জবাবের গুরুত্ব অন্যপ্রকারের, অস্বস্তিকরও।

৩৮। ১৯৩৮ সালের অগাস্ট মাসে আমস্টার্ডম কংগ্রেসে ৩০,০০০ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ২,০২০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। ঐ ৩০,০০০ প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা ৩০,০০০,০০০। ১৯৩২ সালের ১৫ই অক্টোবর ইউরোপ পত্রিকায় আমি ঐ সম্মেলনের একটি রিপোর্ট দিই।

২৭শে অগাস্ট প্রথম অধিবেশনে পঠিত আমার বাণীর মধ্যে আমি বলি ঃ "আমাদের প্রত্যেকের, প্রত্যেক দলের, নিজেদের অস্ত্র, নিজেদের কৌশল রহিয়াছে। সকল আন্তরিক ত্যাগ ও আকাঙ্খাকে আসুন আমরা একত্রিত করি। লক্ষ্য যদি এক হয় তবে সাধারণ কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই বহু স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কাজ চলিতে পারে। মজুরবাহিনী যে শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালাইতেছে, বিবেকের নির্দেশে আদেশ অমান্য করাও সেই শত্রুর দুর্গপ্রাকারেই আঘাত করা হয়। ব্যক্তিগত শক্তির আনুসঙ্গিক প্রয়োগ গণসংগ্রামকে ব্যাহত করে না, শক্তিশালী করে। যে-বাহিনীর রণাঙ্গন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া, সাধারণভাবে সমস্ত রণাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক বিভিন্ন ফ্রন্টেরই কর্মের স্বাধীনতা রহিয়াছে।"

যদিও অস্থায়ী আমস্টার্ডম ইশ্‌তেহারে (যাহা রচনায় আমার কোনো হাত ছিল না) বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধিতার উপর আমি যতটা দাবী করিয়াছিলাম ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। (যদিও আমি শ্রদ্ধার সহিত ইহার উল্লেখ করিয়াছিলাম) আমি দ্বিগুণভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলাম (১৯৩২ সালের ১০ই ডিসেম্বর, বারব্যুসের নিকট লিখিত পত্র) এবং ১৯৩২ সালের শেষভাগে ইশ্‌তেহার প্রণয়ন হইবার সময় যে আলোচনা হয় তাহাতে শ্রমিকবিপ্লব ও বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধিতা এই দু'এর সহযোগিতাকে আমি নীতি হিসাবে গ্রহণ করাইতে সক্ষম হই।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য গঠিত ইণ্টারনেশন্যাল ব্যুরো অব ওআর্লড্ কমিটি-র পারি-তে যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় (১৯২৩ সালের ২১-২৩ ডিসেম্বর) তাহাতে "Declaration on the Participation of the Groups for Individual Action for Amsterdum Movement" প্রকাশিত হয়। ফরাসী, জার্মান ও

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি দায়িত্ববলে সভ্যদের লইয়া গঠিত (বারবুস, কাচিন, ভিলি মুনৎসেনবের্গ, শ্ভের্নিক, এইচ স্টাসোভা প্রভৃতি) এই ব্যুরো "আবার স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিতেছে সমস্ত দলের উপরে ও বাহিরে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে সংকল্পবদ্ধ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ও ব্যক্তিকে সম্মিলিত করাই ইহার লক্ষ্য। আমস্টর্ডম্ ইশ্তেহারের স্থানবিশেষ লইয়া যে অমূলক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইহা ঘোষণা করিতেছে যে, বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধীদের মত ব্যক্তিগত সংগ্রামে বিশ্বাসী দলেরও স্থান আমাদের মধ্যে আছে, যদি তাহারা বিশ্বসম্মেলন হইতে যে প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ বিনাশর্তে সহযোগিতা করিতে সম্মত হন।"

বিবেকবাদী, অহিংসাবাদী লীগ অব ফাইটার ফর পীস-এর সভ্যদের মধ্যে (এইসময় আমি ছিলাম ইহার সভাপতি) আমি পূর্বোক্ত নীতি অনুযায়ী আন্দোলন চালাইতে লাগিলাম। (International Bureau of the Amsterdum Committe কর্তৃক নির্দিষ্ট সহযোগিতা সাধনোদ্দেশ্যে আবেদন ও পত্রাবলী দ্রষ্টব্য): ১০ই জুন, ১৯৩২, "শান্তির জন্য সংগ্রামকারিগণের নিকট আবেদন";

১২ই জুলাই, ১৯৩২, "ভিক্টর মেরিকের নিকট লিখিত পত্র";

৩১শে জুলাই ১৯৩২, International Anti-militarist Bureau-র সেক্রেটারী আলবের দ্য জঁ-এর প্রেরিত প্রতিবাদ। আমস্টার্ডম কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি চেষ্টা করিয়াছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, International League of Women for Peace and Liberty-র সেক্রেটারী কামীয় দ্রেভেকে লিখিত চিঠি;" ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৩, শ্রমিক জনগণের সহিত বিবেকবাদী ও নীরব প্রতিরোধীদের মিলিতভাবে সংগ্রাম চালাইবার জন্য রেনে শিকেলের নিকট পত্র;

সর্বোপরি ' International League of the Fighters for Peace-এর National Easter Congress-এর নিকট আবেদন (১৫ই মার্চ, ১৯৩৩) এবং এই আবেদনের সহিত মন্তব্য জুড়িয়া কংগ্রেসের সেক্রেটারী এ. বোসের নিকট লিখিত পত্র (১৮ই মার্চ, ১৯৩৩) জর্জ পিয়শকে লিখিত চিঠি (১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৩);

১২ই জুলাই ১৯৩৩, লণ্ডনের 'No More War' আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক রেজিন্যাল্ডস্ এ. রেনল্ডস্‌এর নিকট লিখিত পত্র, ইত্যাদি।

এই সকল রচনার মধ্যে এমন একটি আলোচনা চোখে পড়িবে যাহাতে হিংসা ও অহিংসা এই দুই রণপদ্ধতি সম্মিলিত করিয়া 'তৃতীয় যুদ্ধের' জন্য প্রস্তুত হওয়া, এই আলোচনা যতটা বাস্তবক্ষেত্রের ব্যাপার ততটা তত্ত্বমূলক নহে। আমার 'শান্তির জন্য যোদ্ধাদলের' বন্ধুগণ কেবলমাত্র দুই ধরনের যুদ্ধকেই জানিতেন: এক ধরনের যুদ্ধ যাহা জনসাধারণ তাহাতে প্রভুশ্রেণীর স্বার্থে যোগ দেয়; আরেক ধরনের যুদ্ধ যে-যুদ্ধে প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অবতীর্ণ হয় বা হইয়াছে। আমি দেখাইলাম আরেকটি 'তৃতীয় যুদ্ধ' রহিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় তাহার মত সাংঘাতিক যুদ্ধ আর হইতে পারে না: এই যুদ্ধ জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রভুশ্রেণীর যুদ্ধ। জার্মানীতে, ইতালীতে এবং (আজ স্পেনেও এই যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে।) ব্যাঙ্ক ও শিল্পপতিগণের অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া ফাশিজম্ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই এই যুদ্ধ চলিতেছে। আক্রমণের উদ্যোগ আর বিপ্লবের হাতে নাই। প্রকৃত বিপদ কোথায় শত্রু তাহা বুঝিতে পারিয়া অগ্রবর্তী ঘাঁটি আগলাইয়া চলিতেছে। বিপ্লবকে তাহারা প্রারম্ভেই বিনাশ করিতে চায়। (১৯৩৩ সালের ১৫ই মার্চ)

৩৯। সংগ্রামের প্রথম দিকে হিটলারী শাসন আমার সহিত কিছুটা

সংযত ব্যবহার দেখাইল। ভের্সাই সন্ধির অবিচারের বিরুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর পক্ষ আমি চিরদিনই সমর্থন করিয়া আসিতেছিলাম। এই সংযত ব্যবহার হয় ত' স্মরণ করিয়াই তাহারা আশা করিয়াছিল, জাতিগত প্রভুত্বের যে পাশবিক স্বৈরশাসন জার্মানীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছিল তাহার সমর্থনে তাহারা আমার জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিকে কাজে লাগাইতে পারিবে। এমন কি যেদিন 'হিটলারী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সরকারী সাহায্য সমিতি' স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়া হাজার হাজার আবেদনপত্র বিতরণ করিয়াছে, সেদিনও জার্মানীতে তাহারা এই ব্যাপার না জানিবার ভান করিয়াছে। তাহারা যেন আমায় পথভ্রান্ত বন্ধু হিসাবেই দেখিতেছে এইরূপ ভান করিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে জানিয়া অভিমত ব্যক্ত করিবার জন্য তাহারা আমার নিকট আবেদন জানাইল। এমন কি তাহারা আমাকে স্বপক্ষে টানিবার চেষ্টা করিল। ১৯৩৩ সালের ১৯শে এপ্রিল জেনেভাতে জার্মান কন্সাল আমাকে জানাইলেন কলা ও বিজ্ঞানের জন্য গ্যয়টে-পদক আমাকে দিবার জন্য রাইখের প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবুর্গ নাকি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। উত্তরে আমি জানাইলাম যে যদিও এই সম্মান প্রদর্শনের আন্তরিকতাকে আমি উপলব্ধি করি তথাপি ইহা আমি প্রত্যাখ্যান না করিয়া পারি না (২০শে এপ্রিল)।

আজ জার্মানীতে যাহা চলিয়াছে এবং যে-ভাবে স্বাধীনতা দলিত হইতেছে গভর্নমেণ্ট-বিরোধী দলগুলির উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, ইহুদীদের উপর যে কলংককর পাশবিক ব্যবহার করা হইতেছে তাহার ফলে সমগ্র জগতের সাথে আমার মনেও তীব্র ঘৃণা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নীতি মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ। যে গভর্নমেণ্ট আদর্শে ও কর্মসূচীতে এই নীতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে তাহার নিকট হইতে সম্মান গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

কিন্তু আমার এই প্রত্যাহার সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে দেওয়া হইল না। একটিও কথা না বলিয়া ইহাকে ঢাকিয়া ফেলা হইল। প্রাগ ও কোপেনহেগেন হইতে প্রকাশিত জার্মান সাময়িক পত্রিকাগুলি মারফত আমার প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি জার্মানীতে পৌঁছানো যখন ঠেকানো গেল না তখন সরকারী সংবাদপত্রগুলি এ-সম্পর্কে মুখ খুলিতে বাধ্য হইল। প্রথম প্রথম কিছুটা সংযম রহিল, যেন অনেকটা বেদনার সঙ্গেই। কোয়েলনিসে ৎসাইতুং পত্রিকায় ৯ই মে তারিখে আমাকে সর্বপ্রথম তিরস্কার করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার ভাষা যথেষ্ট ভদ্র ও সংযত ছিল।

১৯৩৩ সালের জুন মাসে ফাশিস্ট-বিরোধী আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি উহার সভাপতি নির্বাচিত হই। ইহার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত জার্মান সংবাদপত্রগুলি আমাকে শত্রু বলিয়া প্রচার করিল না। কোয়েলনিসে ৎসাইতং পত্রিকা আমার জবাব যথাযথভাবেই প্রকাশ করিল এবং জবাবে যাহা লিখিল তাহার মধ্যেও উগ্রতা ছিল না। যতই এই বিতর্ক দীর্ঘ হইতে লাগিল ততই বহু জার্মান লেখক এই বিতর্কে যোগ দিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রুডল্‌ফ্ জি. বিল্ডিং। আমার জ্যাঁ ক্রিস্তফের জার্মান প্রকাশক এই সমস্তগুলিকে সংকলিত করিয়া একখানি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। আমার প্রকাশক ছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের একজন পাকা ব্যবসায়ী ও ঝানু বুর্জোয়া। আমি এই পুস্তিকার কোনো জবাব দিলাম না। আমার আর একজন জার্মান প্রকাশকও (তাহার কার্যও নিশ্চয়ই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল) নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার চেষ্টা ছিল আমার প্রতিবাদ যাহাতে আদর্শগত আলোচনার নিরাপদ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। লাইপজিগ বিচারের মিটমাটের শেষ আশাটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।